আমার ভারত অমর ভারত

স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক ঃ কলকাতা ৭০০০২৯

প্রকাশক

স্বামী সর্বভূতানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০২৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭০

মুদ্রণ
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রাঃ লিঃ
কলকাতা ৭০০ ০০৯

পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী স্মরণে

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী ... ... ক

ভূমিকাঃ
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ... ... ত

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর বাণীঃ
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ... ... ম

আমার ভারত অমর ভারত ১

ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শ; বিশ্ব সভ্যতায় ভারতের অবদান; ভারতীয় জীবনে ধর্মের স্থান; অমর ভারত আমার ভারত; 'হে ভারত, ভুলিও না'

অবনতির কারণ ৯

জাতীয় মহাপাপ—জনসাধারণকে অবহেলা; জনসাধারণকে বঞ্চনা—ইতিহাস থেকে সাক্ষ্য; ধর্মের নামে সাধারণকে শোষণ; সর্বনাশের মূলে পৌরোহিত্য; অধঃপতনের আর এক কারণ—শিক্ষার সুযোগ স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে আবদ্ধ রাখা; মানুষকে শেখানো হয়েছে—তারা কিছুই নয়; অকর্মণ্যতা এবং নীচতা; অবনতির আর এক কারণ—অপর জাতির সঙ্গে না মেশা; সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব; আমরা দুর্বল; মধ্যরেখার দুর্দশায় আমরা; দ্বিতীয় মহাপাপ—নারীশক্তিকে অবহেলা

পুনরুত্থানের উপায় ১৬

কোন কিছু ভেঙো না; শক্তির উৎস: জনসাধারণ; হে ভারতের শ্রমজীবী; জনসাধারণের উন্নতি চাই; জনসাধারণের দুর্দশার জন্য ধর্মের কোন দোষ নেই; অতীতকে জানা চাই; চাই দেশীয়

মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ; ধর্মে আঘাত নয় ; শুধুই কি ধর্ম ? তা নয় ; নারীজাগরণ চাই ; শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ; আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা ; বিদেশের সঙ্গে আদান-প্রদান চাই ; নতুন ভারত গড়ে উঠবে ভারতীয় ধারাতেই ; চাই একদল মহান দেশপ্রেমিক ; দেশ গড়বার পথিকৃৎদের প্রতি ; মূল রহস্য ত্যাগ ও সেবা ; চাই শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস ; চাই আরও কিছু ; শূদ্র-জাগরণ হবেই ; নতুন ভারত ; এবাব কেন্দ্র ভারতবর্ষ

শিক্ষা ৪২

মানুষের নিজের ভেতরেই পূর্ণজ্ঞান ; শিক্ষা বলতে কি বোঝায় ; শিক্ষকেব কর্তব্য ; শিক্ষক ও ছাত্রের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা চাই ; শিক্ষা ও ধর্ম ; ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীব একটি পরিকল্পনা ; নেতিমূলক নয়—ইতিমূলক শিক্ষা ; দুর্বলতার শিক্ষা নয় ; আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা ; প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ; জনসাধারণের দুরবস্থার প্রতিকার সম্ভব শিক্ষাব মাধ্যমে ; গণশিক্ষা ; স্ত্রী-শিক্ষা ; চলিত ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে

নারীশক্তি ও তার জাগরণ ৫৬

ভারতীয় নারীর আদর্শ ; মেয়েদের অবমাননা করার ফলে জাতিব অধঃপতন ; পুরুষ ও স্ত্রীলোকে কোন তফাত থাকা উচিত নয় ; নাবীজাতিকে মর্যাদা দিতে হবে ; মেয়েদের সমস্যাব সমাধান হতে পারে শিক্ষার মাধ্যমে ; স্ত্রী-শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে ধর্ম ; সীতা : ভারতীয় নারী-আদর্শের মূর্ত রূপ ; আধুনিক নারীর আদর্শ : শ্রীমা সারদাদেবী ; স্ত্রী-মঠ স্থাপনার বিষয়ে স্বামীজীর পরিকল্পনা ; নারীদের ব্যাপারে পুরুষদের খবরদারি চলবে না ; নারীকর্মীদের প্রতি

প্রকৃত ধর্ম ৬৭

ধর্মের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ; বিভিন্ন ধর্মপথ ; জ্ঞানযোগ ; রাজযোগ ; ভক্তিযোগ ; কর্মযোগ ; ধর্ম-সমন্বয় ; ধার্মিকের লক্ষণ ; ব্যবহারিক ধর্ম : জীবই শিব

চাই আত্মবিশ্বাস ৯৭

জাতীয় সংহতি ১০২
কেন সংহতি চাই; পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে স্বামীজী; হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রশ্নে; ভারতবর্ষের বাহ্যিক রূপের বিভিন্নতা এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার উপায়

আলোর দিশারি যাঁরা ১০৯
দু-রকম শাস্ত্র: শ্রুতি এবং স্মৃতি; ঋষি কারা; শ্রুতি এবং ধর্মাচার্যগণ; মহান আচার্যবৃন্দ; রামচন্দ্র ও সীতা; শ্রীকৃষ্ণ; বুদ্ধ; শঙ্করাচার্য; রামানুজ; চৈতন্যদেব; শ্রীরামকৃষ্ণ

জ্বালাময়ী বাণী ১৩৪

স্বামীজী সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী ১৪৬
লিও টলস্টয়; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শ্রীঅরবিন্দ; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়; বালগঙ্গাধর তিলক; বিপিনচন্দ্র পাল; মহাত্মা গান্ধী; জওহরলাল নেহরু; সুভাষচন্দ্র বসু; বিনোবা ভাবে; রোমাঁ রোলাঁ; উইল ডুরান্ট; সি. রাজাগোপালাচারী; সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন; ই. পি. চেলিশেভ; হুয়াং জিন চুয়ান; রমেশচন্দ্র মজুমদার; এ. এল. ব্যাসম; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মনীষীদের পরিচয় ১৮৯

স্বামীজীর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ১৯৭

আকর-তালিকা ২৩৩

স্বামী বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী

উনিশ শতকে ভারতবর্ষে নবজাগরণের যে অভূতপূর্ব তরঙ্গ উঠেছিল তার শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ। অনেক মনীষীই স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক ভারতবর্ষের স্রষ্টা বলেছেন। বস্তুত ভারতবর্ষের নবজাগরণের প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্বামীজী বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী লিখেছেনঃ 'আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে যে-কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবেন—স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী! ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক,—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।'

মুঘল আমলে স্বামীজীর পূর্বপুরুষদের বাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার ডেরেটোনা গ্রামে। ব্রিটিশ আমলের একেবারে প্রথমদিকে সেই পরিবারের রামনিধি দত্ত কলকাতায় গড় গোবিন্দপুরে উঠে আসেন। পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দুর্গ তৈরীর জন্য জমি দখল করলে দত্ত-পরিবার চলে আসেন উত্তর কলকাতার শিমুলিয়া বা শিমলা অঞ্চলে। পরবর্তীকালে এই পরিবারের বংশধর রামমোহন দত্ত নিজের জন্য ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়ীটি তৈরী করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাপ্রসাদ কুড়ি-বাইশ বছরে সংসার-ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র বিশ্বনাথ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এটর্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ কাজে নিযুক্ত হন। বিশ্বনাথের বিবাহ হয় শিমলার নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে। এঁদেরই ষষ্ঠ সন্তান নরেন্দ্রনাথ, পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ।

বিশ্বনাথ দত্ত সাতটি ভাষায় দক্ষ ছিলেন; ইতিহাস ও সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। খাদ্য-পোশাক-আদবকায়দায় তিনি হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির

অনুরাগী, আর কর্মক্ষেত্রে অনুসরণ করতেন ইংরেজদের। সে-যুগে তাঁর মাসিক আয় ছিল প্রচুর, নিজে রাজকীয়ভাবে থাকতেন এবং বহু আত্মীয় ও দরিদ্রকে প্রতিপালন করতেন। সন্তানদের শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত হতেন না, তাঁর অবর্তমানে ছেলেমেয়েদের কি হবে তা নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন না। তিনি বলতেন যে সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তারা নিজেরাই জীবনে দাঁড়াতে পারবে। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি ছেলেমেয়েদের স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহিত করতেন, বিশেষ কোন ধর্মের কথা না বলে বিভিন্ন ধর্মের মূলকথা শোনাতেন, খেলা ও ব্যায়ামে উৎসাহ দিতেন, কবিতা-আবৃত্তি ও গান শেখাতেন। দেশভ্রমণ ছিল তাঁর অন্যতম নেশা। পত্নী ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিনী নারী। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠত আভিজাত্যের পরিচয়। তাঁর হৃদয়ও ছিল খুব দরাজ। গরীবদুঃখীরা কখনও তাঁর কাছ থেকে খালি হাতে ফিরত না। সংসারের সব কাজ দেখেও নিয়মিত পূজা শাস্ত্রপাঠ সেলাইয়ের কাজ এবং প্রতিবেশীদের সুখদুঃখের খবর নেওয়া তাঁর দৈনন্দিন কাজ ছিল। নরেন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের কাছেই প্রথম ইংরেজী শেখা শুরু করেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি (১২৬৯ বঙ্গাব্দ, ২৯ পৌষ) পৌষ-সংক্রান্তির দিন সূর্যোদয়ের ছ-মিনিট আগে নরেন্দ্রনাথের জন্ম। কাশীর বীরেশ্বর শিবের অনুগ্রহে পুত্রের জন্ম এই বিশ্বাসে ভুবনেশ্বরী তাঁর নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর। এই নামটি পরে 'বিলে' ডাকনামে দাঁড়ায়। মা-বাবার কাছে শিক্ষালাভ বালক নরেন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বিলের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যেত সেগুলি হলঃ অপূর্ব মেধা, হৃদয়বত্তা, তেজস্বিতা, সাহস, বেপরোয়া স্বাধীনচেতা মনোভাব, বন্ধুপ্রীতি আর খেলা-ধূলার প্রতি আকর্ষণ। আবার এরই সঙ্গে বালকের মধ্যে দেখা যেত অপূর্ব আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা। কখনও একা, কখনও বন্ধুদের নিয়ে 'ধ্যান-ধ্যান' খেলতেন, পুজো করতেন রাম-সীতা আর শিবের, সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই ছুটে যেতেন তাঁদের কাছে।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি গুণ তরুণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। স্কুলের বিতর্ক ও আলোচনা সভায় তিনি মধ্যমণি, খেলাধূলাতে পরিচালক-নেতা, বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে গানবাজনা শিখে রাগ-

প্রধান ও ভজনে রীতিমতো প্রথম শ্রেণীর গায়ক, নাটকে কুশলী অভিনেতা, আবার বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার ফলে তরুণ বয়সেই যথেষ্ট চিন্তাশীল। মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে প্রায়ই যেতেন বক্তৃতা শুনতে, সাহিত্য ও দর্শনের তত্ত্ব নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতেন। ব্রাহ্ম-সমাজের নাটক ও প্রার্থনার গানে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান। এরই সঙ্গে লাঠিখেলা, অসিচালনা, ঘোড়ায় চড়া, নৌকা বাওয়া সাঁতার, কুস্তি, আর জিম-ন্যাসটিক্সে তাঁর ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। একবার একটি প্রতিযোগিতায় তিনি বক্সিং-এ চ্যাম্পিয়ান হয়ে একটি রুপোর প্রজাপতি পুরস্কার পান। বন্ধুবান্ধব ও অসহায়দের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি ও সমবেদনা, তাদের বিপদে তিনি এগিয়ে যান, সে বিপদ যে-কোন ধরনেরই হোক। অন্যদিকে সন্ন্যাসজীবনের প্রতি আকর্ষণ ক্রম-বর্ধমান। শয়নকালে জ্যোতিদর্শন ছিল তাঁর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা।

নরেন্দ্রনাথ যখন মেট্রোপলিটান স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে (বর্তমানের অষ্টম শ্রেণী) পড়েন—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে—তখন বিশ্বনাথ দত্তকে কার্যোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে যেতে হয়। পরিবারের সকলেই তাঁর সঙ্গে যান। সেখানে কোন ভাল স্কুল ছিল না বলে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার কাছে বাড়ীতেই পড়াশুনা করতেন। রায়পুরে দেড় বছর থাকার পর সকলে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। পুরান স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে এসে ভর্তি হলেন নরেন্দ্রনাথ এবং সে বছরই (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। প্রথম বছরের শেষে ম্যালেরিয়া রোগে বহুদিন শয্যাশায়ী থাকায় তিনি ডিসকলেজিয়েট হয়ে পড়েন। তখন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) ভর্তি হয়ে এক বছর বাদে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এফ-এ পাস করেন। দুই বছর বাদে এই কলেজ থেকেই তিনি বি-এ পাস করেন। কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি এত বেশী পড়াশুনা করতে থাকেন যে, তাঁর অগাধ জ্ঞান ও বিচারশক্তিতে ছাত্র শিক্ষক সকলে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি পর্যন্ত মন্তব্য করেছিলেনঃ 'নরেন্দ্রনাথ সত্যিই একটি জিনিয়াস। আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু এর মতো বুদ্ধি আর বহুমুখী প্রতিভা কোথাও দেখিনি, এমনকি জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলির দর্শনের ছাত্রদের মধ্যেও নয়।'[১] নরেন্দ্রনাথের পড়ার বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। গিবন ও গ্রীনের ইতিহাস বই থেকে শুরু করে জেভোন্সের ডিডাকটিভ লজিক, কান্ট-স্পেন্সার-মিলের দর্শনের পাশাপাশি গডফ্রের অ্যাস্ট্রোনমি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথেমেটিক্স —বিভিন্ন বিষয়ে তখন থেকেই তাঁর গভীর আগ্রহ এবং অগাধ পড়াশুনা। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের একটি মতবাদের সমালোচনা করে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন এবং স্পেন্সার তার উত্তরে নরেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট প্রশংসা করে লিখেছিলেন যে, বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে তিনি এই সমালোচনা অনুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্তন করবেন।

কৈশোরের শেষাবস্থা থেকে তাঁর মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার জোয়ার উঠেছিল তার পরিতৃপ্তির জন্য তরুণ নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। ব্রাহ্ম-সমাজের ও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সভায় যাওয়া, পাশ্চাত্যদর্শন তন্নতন্ন করে পড়া এবং ধ্যানে দীর্ঘ সময় কাটানো ইত্যাদিতে নরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত থাকতেন। সত্যের সন্ধানে তাঁর সমগ্র সত্তা অধীর। স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ, হিউমের সংশয়বাদ, মিলের 'থ্রি এসেজ অন রিলিজিয়ন' তাঁর প্রশ্নকে করে তুলেছে তীক্ষ্ণ, শেলী ও হেগেলের বিশ্বপ্রজ্ঞা আলো দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ চাইছেন প্রত্যক্ষ দর্শন—অনুমানের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন প্রত্যক্ষের উপরে। ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা যদি সত্যবস্তু, তবে তার বাস্তব রূপ কি—এই প্রশ্নেই তাঁর সমগ্র মন উদ্বেলিত।

এমন সময় দেখা হল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে, কলকাতায় সুরেন মিত্রের বাড়ীতে। তারিখটা সম্ভবত ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর।[২] দ্বিতীয় দর্শন দক্ষিণেশ্বরে জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে, রবিবার (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ)।[৩] দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথকে দেখামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝতে পেরেছিলেন, এই যুবক নর-ঋষির অবতার, মানুষের কল্যাণার্থে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। সেদিন নরেন্দ্রনাথ সরাসরি প্রশ্ন করলেন তাঁকে: 'আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?' উত্তর এল: 'হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখতে পাই; তোমায় যেমন দেখছি তার চেয়েও স্পষ্টভাবে তাঁকে দেখি। তুমি যদি দেখতে চাও, তোমাকে দেখাতেও পারি।' নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হলেন। এ-ধরনের প্রশ্ন এর আগেও তিনি অনেককে করেছেন, কিন্তু এই প্রথম দেখলেন এমন একজন মানুষ, যিনি ঈশ্বরকে

দেখেছেন। শুধু দেখেননি, অন্যকে দেখানোর সামর্থ্য রাখেন। যে প্রত্যক্ষ দর্শনকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তারই মুখোমুখি হতে হল তাঁকে। দক্ষিণেশ্বরে এর পরবর্তী সাক্ষাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে পৌঁছে দিলেন সমাধির স্তরে। এই অভিজ্ঞতা নরেন্দ্রনাথের মনে এক বিরাট প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হল—যিনি স্পর্শমাত্রেই প্রবল দৃঢ়মনা লোকের উপরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তাঁর শক্তি তো অসাধারণ! ঈশ্বরের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথ এতদিন যুক্তি-অনুমানের উপর নির্ভর করছিলেন, আর এই সহজ সরল মানুষটি প্রত্যক্ষের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। কিন্তু সহজে তাঁকে মেনে নেননি নরেন্দ্রনাথ। বারে বারে পরীক্ষা করলেন তাঁর ত্যাগ, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এলেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্যিই অসাধারণ মানুষ। প্রায় ছ-বছর তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর শিক্ষায় নানারকম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হল নরেন্দ্রনাথের; ব্রহ্মকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, উপলব্ধি করলেন। ব্রহ্মের সাকার-নিরাকার তত্ত্ব, জ্ঞান-ভক্তি-কর্মযোগের পথের সত্যতায় হলেন নিঃসন্দেহ। এর মধ্যে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি বাবার মৃত্যু হওয়ায় নরেন্দ্রনাথের জীবনে এক সাময়িক বিপর্যয় দেখা দিল। একদিকে বিশ্বনাথ দত্ত কোন অর্থসঞ্চয় করে যেতে পারেননি, অন্যদিকে আত্মীয়স্বজনেরা ঘরবাড়ী দখলের জন্য মিথ্যা মামলা শুরু করেছেন। নরেন্দ্রনাথ মা ও ভাইবোনদের নিয়ে তাঁর দিদিমার বাড়ীতে উঠে গেলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি মামলায় জয়-লাভ করেন। এ-সময়ে তিনি বহু জায়গায় চাকরির চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এই দুর্দিনে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে গিয়ে অর্থের জন্য প্রার্থনা জানাতে বলেন। নরেন্দ্রনাথ তিনবার চেষ্টা করেও মা-কালীর কাছে টাকা-পয়সা চাইতে পারলেন না, পরিবর্তে প্রার্থনা করলেন জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য। এটি সম্ভবত ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরের কোন এক রাত্রির ঘটনা।[৬] এর কিছু পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভক্তেরা তাঁকে কাশীপুরের এক ভাড়াবাড়ীতে নিয়ে আসেন। এই বাড়ীর একতলায় ডানদিকের ঘরে সন্ধ্যার পরে নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের শেষ সপ্তাহে।

নরেন্দ্রনাথকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে ভাবী লোকশিক্ষক হিসাবেও তৈরী করে যাচ্ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ছোটবেলা

থেকেই সন্ন্যাসজীবনে আকৃষ্ট ছিলেন—ব্রহ্মানন্দে বুঁদ হয়ে থাকবেন এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে চালালেন নতুন পথে। নরেন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন যে, তিনি চান শুকদেবের মতো নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে তখন ঠাকুরই তাঁকে কঠোর তিরস্কার করে বলেন যে, শুধু নিজের মুক্তি হলেই হবে না, জগতের দুঃখমোচনের জন্য নরেন্দ্রনাথকে একটি বিশাল বটগাছের মতো হতে হবে। আর একদিন ঠাকুর একটি কাগজে লিখে দিয়েছিলেনঃ 'নরেন শিক্ষে দিবে'। এতে নরেন্দ্রনাথ আপত্তি জানালে তিনি বলেনঃ 'তোর হাড় করবে'। সন্ন্যাসিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঠাকুরই তাঁকে নির্দেশ দিয়ে যান।[৭] আর একদিন বৈষ্ণবধর্ম সম্বধে আলোচনা করতে গিয়ে ঠাকুর যখন বলেন, 'জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা', তখন সেই কথা শুনে মুগ্ধ নরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেনঃ 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম...ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব...।' এ থেকেই বোঝা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ছিল সূত্র, আর স্বামীজী তারই ভাষ্য।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ কয়েকজন গুরুভাইকে নিয়ে বরানগরের একটি পুরান ভাঙা বাড়ীতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে চরম দারিদ্রের মধ্যে তাঁর তীব্র জপধ্যান, ভজন ও পড়াশুনায় সারাদিন কাটত। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর দশজন গুরুভাই বিরজাহোম করে সন্ন্যাস নেন। নরেন্দ্রনাথের নাম হয় স্বামী বিবিদিষানন্দ। বরানগর মঠ থেকে তিনি পরিব্রাজক হিসাবে বেরিয়ে পড়েন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। কাশী-অযোধ্যা-লক্ষ্ণৌ-আগ্রা-বৃন্দাবন-হৃষীকেশ ঘুরে সে-বছরের শেষের দিকে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ভ্রমণে তিনি এলাহাবাদ, গাজীপুর, কাশী হয়ে তিন মাসের মধ্যেই ফিরে আসেন। সে-বছরের ৩ আগস্ট তিনি যে-ভ্রমণে বের হন, সেটিই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক ও দীর্ঘকালব্যাপী। ভাগলপুর-বৈদ্যনাথ-গাজীপুর-কাশী-অযোধ্যা-নৈনীতাল-আলমোড়া-মীরাট-দিল্লী ইত্যাদি হয়ে রাজপুতানায় যান এবং সেখান থেকে পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারতে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়ান। এই দীর্ঘ ভ্রমণে স্বামীজী সর্বস্তরের মানুষের সংস্পর্শে আসেন। ফলে, একদিকে তিনি

যেমন ভারতীয় জনজীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, অন্যদিকে আপামর জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন তাঁর উদ্দীপ্ত বাণীর সাহায্যে। বহু রাজা ও রানীর সঙ্গে এসময় তাঁর পরিচয় ঘটে এবং স্বামীজী তাঁদের যথার্থ জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে নির্দেশ দেন। বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সমাজসংস্কারকও তাঁর সঙ্গে মিলিত হন; স্বামীজীও তাঁদের কাছে তুলে ধরেন শাস্ত্র ও ধর্মের যথার্থ মর্মবাণী এবং দেশের উন্নতির সঠিক পথ। স্বামীজীর চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সকলেই মুগ্ধ হন এবং অনেকে তাঁকে আসন্ন বিশ্বধর্মমহাসভায় যোগ দিতে আমেরিকায় যাবার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। তাঁর মধ্যে যে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে এবং এই শক্তির সাহায্যে তিনি যে জগতের কল্যাণ করতে সমর্থ, একথা প্রথম বলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবদ্দশাতে। অন্যদের মধ্যে গাজীপুরের জেলা-জজ মিঃ পেনিংটন-ই প্রথম স্বামীজীকে এই উদ্দেশ্যে ব্রিটেনে যেতে বলেন।[৬] স্বামীজী প্রথমে এ নিয়ে মাথা ঘামাননি। পরে মাদ্রাজের জনগণের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং দৈবনির্দেশে (সূক্ষ্মদেহে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং কামারপুকুর থেকে শ্রীশ্রীমা স্বামীজীকে নির্দেশ ও অনুমতি দিয়েছিলেন) তিনি আমেরিকায় যাওয়া স্থির করেন।

তিনি তাঁর পরিব্রাজক-জীবন কাটাচ্ছিলেন বিভিন্ন ছদ্মনামের আড়ালে, কারণ একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোই ছিল তাঁর ইচ্ছা। দিল্লীতে 'বিবিদিষানন্দ', রাজপুতানা ও পশ্চিম ভারতে 'বিবেকানন্দ' এবং দক্ষিণ ভারতে 'সচ্চিদানন্দ' নামে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ নামটি খেতড়িরাজের দেওয়া নয়, কারণ রাজার সঙ্গে পরিচয় হবার দেড় বছর আগেই স্বামীজীকে এ নামটি ব্যবহার করতে দেখা যায়।[৭] রাজার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এক মাস আগেও তিনি এ নামটি ব্যবহার করেছিলেন।[৮]

ভারতের সাধারণ মানুষেরা চাঁদা দিয়ে অর্থসংগ্রহ করে স্বামীজীকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন।[৯] স্বামীজী বলেছিলেন: 'যদি এটা মায়ের ইচ্ছা হয় যে আমায় (আমেরিকায়) যেতে হবে, তাহলে আমি সাধারণ মানুষের অর্থেই যাব। কারণ ভারতের সাধারণ মানুষের জন্যই আমি পাশ্চাত্যদেশে যাচ্ছি- সাধারণ এবং গরীব মানুষদের জন্যে।'[১০] তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে তারিখে বোম্বাই থেকে জাহাজে যাত্রা করে বংকুবরে পেঁছান ২৫ জুলাই,

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এবং সেখান থেকে ট্রেনে করে উইনিপেগ হয়ে চিকাগোয় পেঁছান ৩০ জুলাই সন্ধ্যায়। সেখান থেকে তিনি অন্যান্য জায়গাতে যান এবং বিভিন্ন অধ্যাপক ও পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট আসন্ন ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য স্বামীজীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ ব্যারোজকে এক চিঠিতে লেখেন ঃ 'আমাদের সকল অধ্যাপককে সম্মিলিত করলে যা হবে, এই সন্ন্যাসী তার চেয়েও বেশী পণ্ডিত।' ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মমহাসভা শুরু হলে স্বামীজী তাতে ছয়টি বক্তৃতা এবং সংলগ্ন বিজ্ঞানশাখায় চারটি বক্তৃতা দেন। রাতারাতি তিনি বিখ্যাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় বক্তা হয়ে ওঠেন তাঁর উদার ও যুক্তিবিচারমূলক ধর্মমতের জন্য। রাস্তায় তাঁর ফটো টাঙিয়ে দেয় চিকাগোর জনসাধারণ। আমেরিকার পত্রিকাগুলি তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে থাকে। কয়েকটি পত্রপত্রিকা থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি সংকলিত।

'এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তির ১৫ মিনিটের বক্তৃতার জন্য হাজার হাজার মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে।'—[নর্দাম্পটন ডেইলি হেরাল্ড; ১১-৪-১৮৯৪]। 'অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মানুষ; প্রভূত গভীর দর্শন এবং উৎকৃষ্ট ধর্ম তাঁর; প্যাগান হলেও খ্রীষ্টানরা তাঁর অনেক শিক্ষা অনুসরণ করতে পারেন; তাঁর মত আকাশের মতোই বিশাল।'—[উইসকনসিন স্টেট জার্নাল; ২১-১১-৯৩]। 'ধর্মমহাসভার মহৎ মূল্য এইখানে—উপস্থিত মানুষেরা একটি মানুষকে জানবার সুযোগ পেয়েছিল। একটি লোকই ওখানে ছিলেন-- আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আমি জানি না। কিন্তু খ্রীষ্টানের মতোই তাঁর চিন্তা, কর্ম এবং কথা। তোমরা বলো, তিনি খ্রীষ্টান নন। ভালই। তোমরা বলো, তিনি বৌদ্ধ। আরো ভালো। যদি তোমরা তাঁর থেকে উচ্চতর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে তাঁর থেকে আরো বড় হতে চেষ্টা করো না কেন?'—[রাশিয়ার প্রতিনিধি প্রিন্স উলকনস্কির উক্তি ঃ সেন্ট লুইস রিপাবলিক; ৩১-১০-৯৪]। 'বিখ্যাত এই প্রাচ্যদেশীয় মানুষটিকে উদার করতালিতে অভিনন্দিত করা হয়। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা শোনা হয়। মানুষটির পরম সুন্দর শারীরিক ব্যক্তিত্ব, অতি সুগঠিত, ভারসাম্যযুক্ত ব্রোঞ্জ-মূর্তির আকার। ...তাঁর সমগ্র বক্তৃতা এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নয় কিন্তু তার মধ্যে ছিল ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য উচ্চাঙ্গের আবেদন এবং অনবদ্য এক

বিশ্বাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বাণীময় সমর্থন। বিশেষতঃ সুন্দর ছিল তাঁর ভাষণের সমাপ্তির অংশ যেখানে তিনি বললেন, আমি খ্রীষ্টকে গ্রহণে সর্বদাই প্রস্তুত কিন্তু তোমাদেরও উচিত কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে গ্রহণ করা।'—[মেমফিস্ কমার্শিয়াল; ১৭-১-৯৪]। 'বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী-রূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছিলেন; কোনো চিরকুট হাতে না রেখেও নিখুঁত ইংরেজীতে ভাষণ দিয়েছিলেন। এবং অনেক শ্রোতা এই মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর মহনীয় উচ্চারণের একটি কথাও যদি কেউ না বুঝতে পারে, তবু সে জানবে, সে শুনছে গরীয়ান সঙ্গীত।'—[ডেট্রইট ফ্রি প্রেস]। 'যদি ব্রাহ্মণ-সাধু বিবেকানন্দকে...আরও এক সপ্তাহ ধরে রাখা যায়, তাহলে ড্রেট্রইটের বৃহত্তম হলঘরেও লোক আঁটবে না, তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য এতই উৎকণ্ঠা। মাথায় তুলে নাচানাচির বস্তু হয়ে উঠেছেন তিনি। গত সন্ধ্যায় ইউনিটারিয়ান চার্চে প্রতিটি আসন ভর্তি হয়ে গিয়েছিল এবং বহু লোক সারাটা বক্তৃতার সময়ে দাঁড়িয়ে শুনেছিল।'—[ডেট্রইট জার্নাল ২১-২-৯৪]। 'বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক, ধর্মবেত্তা, লেখক, বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি এই সন্ধ্যায় সিটি হলে বক্তৃতা করবেন, তিনি ইতিমধ্যেই যেসব ভদ্রলোক এম স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে গতকাল বিকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মোহিত করে ফেলেছেন। এই শান্ত মর্যাদাময় সন্ন্যাসীর বহুমুখী মনীষা, সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা এবং বহুদর্শী উদার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিত্বের অদ্ভুত বৈদ্যুতিক আকর্ষণ; তার দ্বারা এই বহু-প্রশংসিত প্রাচীন পৃথিবীর আগন্তুক এমন এক ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করেছেন, যাঁকে আমাদের এই বীরপূজক নূতন পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে জানতে পারাও একটি উদার শিক্ষা।'—[নর্দাম্পটন ডেইলি হেরাল্ড, ১৪-৪-৯৪]। 'যথার্থই বিরাট পুরুষ, সরল, ঐকান্তিক, মহান এবং আমাদের পণ্ডিতদের তুলনায় অতুলনীয়ভাবে বিদ্বান। ধর্মমহাসভায় যাতে তিনি আমন্ত্রণ পান সেজন্য প্রদত্ত তাঁর পরিচয়পত্রে হারভার্ডের এক অধ্যাপক লিখে-ছিলেন শোনা যায়—"আমাদের সকলের পাণ্ডিত্য জড়ো করলে যা হবে, তার থেকেও এঁর পাণ্ডিত্য বেশী।"'—[লীন সিটি আইটেম; ১৩-৪-৯৪]।

আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেতে থাকেন এবং অধিকাংশ স্থানেই কারও না কারও বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৮৯৩-এর শেষভাগে পূর্ব এবং মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দেবার পর

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ডেট্রইট যান। সেখান থেকে নিউইয়র্ক-চিকাগো-গ্রীনএকার-ব্রুকলিন হয়ে পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসে আবার নিউইয়র্কে ফিরে আসেন। ১৮৯৫-এর ১৮ জুন থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত স্বামীজী তাঁর বারো জন শিষ্যশিষ্যাকে নিয়ে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে কাটালেন শ্রীমতী ডাচারের বাড়ীতে। ধর্মসাধনা হাতে-নাতে শেখানো এবং নিজের বিশ্রামের জন্য স্বামীজী সেখানে গিয়েছিলেন। এর পরে যান ইউরোপে--২৪ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে এবং ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত লণ্ডনে থেকে ৬ ডিসেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্কে ফিরে আসেন। বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল আবার ইউরোপে রওনা হন। লণ্ডনে প্রায় তিন মাস থেকে পরে যান ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড-ইতালী-জার্মানী-হল্যান্ড। ১৭ সেপ্টেম্বর লণ্ডনে ফিরে এসে বেদান্তপ্রচার শুরু করেন। লণ্ডনে তিন মাস থেকে ১৬ ডিসেম্বর ভারতের পথে রওনা হয়ে যান। ট্রেনে করে নেপলস পর্যন্ত এসেছিলেন পথে মিলান-পিসা-রোম দেখে। নেপলস থেকে তাঁর জাহাজ ছাড়ে ৩০ ডিসেম্বর।

ইংলণ্ডে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে একটি চিঠিতে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেনঃ 'ভারতে কেউ কেউ মনে করেন, ইংলণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি, তা তাঁর সুহৃদ ও ভক্তবৃন্দের অতিরঞ্জিত বর্ণনা মাত্র। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম সর্বত্রই তিনি এক সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে গিয়েছেন। ইংলণ্ডের অনেক জায়গায় আমি এমন বহু লোকের সান্নিধ্যে এসেছি যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করেন। সত্য বটে, আমি তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত নই এবং তাঁর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আমার মতভেদ আছে, তথাপি আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, বিবেকানন্দের প্রভাবগুণে এখানে অনেকের চোখ খুলেছে এবং হৃদয় প্রসারিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষার ফলেই এখানকার অধিকাংশ লোক আজকাল বিশ্বাস করে যে, প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রগুলোর মধ্যে বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি নিহিত আছে। শুধু যে এই ভাবটি তিনি জাগিয়েছেন তা নয়, ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে তিনি সফলতালাভ করেছেন। মিঃ হাউইস (Mr Haweis) -এর লেখা "বিবেকানন্দবাদ" ও "দি ডেড পালপিট' নামক প্রবন্ধ হতে আমি যে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম, তা হতে সকলে স্পষ্ট বুঝেছেন যে, বিবেকানন্দের ভাব-

ধারা প্রচারের ফলেই শত শত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। বাস্তবিক, এদেশে তাঁর কাজের গভীরতা ও ব্যাপকতা নীচের ঘটনাটি হতে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

'কাল সন্ধ্যায় লণ্ডনের দক্ষিণপ্রান্তে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পথের নিশানা হারিয়ে ফেলায় রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে কোন্‌দিকে যাব ভাবছিলাম, এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা একটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে আসলেন—মনে হল আমাকে পথ দেখাবার জন্য এসেছেন। তিনি আমাকে বললেন, "মশায়, নিশ্চয় পথ খুঁজে পাচ্ছেন না? আমি সাহায্য করতে পারি কি?" তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "কাগজে দেখেছি আপনি লণ্ডনে আসছেন। আপনাকে প্রথম দেখামাত্রই আমি আমার ছেলেকে বলছিলাম, 'ঐ দেখ—স্বামী বিবেকানন্দ'।"- তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরবার জন্য খুব দ্রুত চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, তাঁকে বলবার সময় পাইনি যে, আমি স্বামী বিবেকানন্দ নই। বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে না জেনেই তাঁর প্রতি স্ত্রীলোকটির এরূপ শ্রদ্ধার ভাব দেখে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। এই মধুর ঘটনাটিতে আমি খুবই তৃপ্তিলাভ করলাম এবং যার দৌলতে এ সম্মানলাভ হল সেই গেরুয়া পাগড়ীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। এই ঘটনা ছাড়াও এখানে আমি অনেক শিক্ষিত ইংরেজকে দেখেছি যাঁরা ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং ভারতের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলো আগ্রহের সঙ্গে শোনেন।'

স্বামীজীর পাশ্চাত্যভ্রমণের উদ্দেশ্য হিসাবে কেউ কেউ বলেন 'ভারতের মর্যাদা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা', কেউ বা বলেন 'জনকল্যাণকর কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, যেমন ভারতে পরিব্রাজক-অবস্থায় তেমনি পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারের সময়েও স্বামীজী কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনার বশবর্তী হয়ে চলেননি। তিনি যেন কোন এক দৈবী ইচ্ছার ভূমিকা পালন করে গেছেন সেখানে। প্রতি ক্ষেত্রে, সর্ব অবস্থায় তিনি বপন করে গেছেন অধ্যাত্ম-বীজ, আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে তিনি চলেছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক ভাবে, এত সহজভাবে যে, মনে হয় তিনি যেন এ-বিষয়ে সচেতনই ছিলেন না। সম্মানের ঊর্ধ্বশিখরে উঠেছেন তিনি, খ্রীষ্টান পাদরীদের ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে, আবার অজস্র ভক্ত তাদের সর্বকিছু

ঢেলে দিয়েছে তাঁর পায়ে—কিন্তু তিনি নিরাসক্তের মতো গ্রহণ করেছেন সবকিছুকে। মাঝে মাঝে ঝলসে উঠেছেন দুষ্কৃতের বিরুদ্ধে, কৌতুকে ফেটে পড়েছেন কতবার, ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে স্তম্ভিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের; কিন্তু এ সবই তাঁর কাছে খেলা ছাড়া কিছু ছিল না। তাঁর পাশ্চাত্যভ্রমণের দিকে তাকালে স্পষ্টই বোঝা যায়, 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মা-কালী' অথবা ঠাকুর তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর অজান্তেই।

১৮৯৭-এর ১৫ জানুয়ারি স্বামীজী কলম্বো এসে পৌঁছালেন। পাশ্চাত্যে তাঁর অভাবনীয় সাফল্য ভারতীয়দের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ বাড়িয়ে দিয়েছিল, তারই পরিণামে স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করছিল ঐতিহাসিক অভিনন্দন। সমগ্র দেশই তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। কলম্বো থেকে যে অভিনন্দনের শুরু হল তার রেশ চলল রামনাদ, মাদ্রাজ হয়ে কলকাতার পথে সর্বত্র। পাশ্চাত্যে অবিরাম বক্তৃতায় ও ভ্রমণে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। জাতির এই কৃতজ্ঞতার প্রতিদান ও বক্তৃতায় স্বামীজীর শরীর আরও ভেঙে পড়ল। ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় পৌঁছানোর পর থেকে সমগ্র জাতির 'স্নেহের অত্যাচার' ক্রমশই বেড়ে উঠল। সমগ্র কলকাতাই তখন পাগল ! অভিনন্দনের পর অভিনন্দনসভার আমন্ত্রণ তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অনেকখানি সময় কেড়ে নিল। এসব কাজের মধ্যে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদিষ্ট পথে সঙ্ঘকে একটি ভিত্তির উপরে দাঁড় করানোর কাজ শুরু করলেন। শশী মহারাজকে (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মাদ্রাজে পাঠালেন সেখানকার ভক্তদের আকুল আবেদনে। মাদ্রাজে সঙ্ঘের এক শাখাকেন্দ্র গড়ে উঠল। সারগাছিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ)। অন্যান্য গুরুভাইদেরও নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ও কালী মহারাজের (স্বামী অভেদানন্দ) উপর যথাক্রমে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কার্যভার অর্পণ করলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক আসায় এর পরেই তিনি আলমোড়া-বেরিলী-আম্বালা-অমৃতসর-শ্রীনগর-রাওয়ালপিণ্ডি-লাহোর-দেরাদুন-আলোয়ার-খেতড়ি ইত্যাদি ঘুরে ১৫ জানুয়ারি (১৮৯৮) কলকাতায় ফিরে এলেন। শরীর ক্রমশ অসুস্থ হতে থাকায় বিশ্রামের জন্য দার্জিলিঙে গিয়ে একমাস থাকেন এবং পরে আবার আলমোড়া-কাশ্মীর-অমরনাথ-ক্ষীরভবানী হয়ে ১৮ অক্টোবর

কলকাতায় ফিরে আসেন। ঐ বছরের ৯ ডিসেম্বর বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। পাশ্চাত্যদেশ থেকে ফিরে আসার পরে স্বামীজীর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য ছিল এই মঠকে সঙ্ঘের প্রধান কর্মকেন্দ্ররূপে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা এবং সঙ্ঘের কর্মধারাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা যাতে তা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শের বাহক ও ধারক হয়ে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' বহু শতাব্দী ধরে কাজ করে যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী-শিষ্যদের এ শিক্ষাও তিনি দিতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-মুষায় দ্রুত হয়ে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন জাহাজে করে দ্বিতীয়বারের জন্য পাশ্চাত্যদেশগুলির উদ্দেশে রওনা হন। দুই সপ্তাহ ইংলণ্ডে থেকে আমেরিকায় যান এবং বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দেন। এক বছর সেখানে থেকে ৩ আগস্ট (১৯০০) প্যারিসে এসে পৌঁছান। ৭ সেপ্টেম্বর সোরবোন-এ প্যারিস-কংগ্রেসের অধিবেশনে (ধর্মেতিহাস-সম্মেলন) বক্তৃতা দেন। এরপর ভিয়েনা-কনস্টান্টিনোপল-এথেন্স-মিশর হয়ে ৯ ডিসেম্বর বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। আমেরিকায় এই সময়ে ৯০টিরও বেশী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তবে এবারের পাশ্চাত্যভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐসব দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাজকর্ম কিরকম চলছে তা দেখা এবং তার ভিত্তি সুদৃঢ় করা।

দেশে ফিরেই তিনি কয়েকদিনের মধ্যে মায়াবতীর পথে রওনা হয়ে যান। ২৫ জানুয়ারি (১৯০১) বেলুড় মঠে ফিরে এসে ১৯ মার্চ ঢাকা যান এবং সেখান থেকে চন্দ্রনাথ-কামাখ্যা-শিলং হয়ে মে মাসে ফিরে আসেন। কোন জায়গাতেই তিনি বক্তৃতার অনুরোধ এড়াতে পারেননি। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বুদ্ধগয়া এবং ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় একমাস কাশী গিয়ে থাকেন। জীবনের শেষ দুটি বছর তিনি ক্রমশই কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মহাসমাধির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সঙ্ঘের কাজকর্ম তুলে দিয়েছিলেন গুরুভাইদের হাতে, নিজে শুধু তরুণ শ্রোতা ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে নানান উদ্দীপনাময় কথা বলে তাদের অনুপ্রাণিত করতেন। গুরুভাই কিংবা শিষ্যেরা তাঁর পরামর্শ চাইলে তিনি তাঁদের নিজেদের বুদ্ধিমতো কাজ করতে বলতেন, কারণ তিনি চাইতেন তাঁরা যাতে তাঁর অবর্তমানে স্বীয় বিচারবুদ্ধির সাহায্যে কাজ করতে পারেন।

১৯০২, ৪ জুলাই, শুক্রবার, রাত ৯টা ১০ মিনিটে স্বামীজী বেলুড় মঠে নিজের ঘরে মহাসমাধি লাভ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন।

স্বামীজীর জীবনের সমস্ত ঘটনার কথা জানা এখনও সম্ভব হয়নি; তাঁর রচনা ও বক্তৃতার অনেক কিছু এখনও অনাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত। আনন্দের বিষয়, অনেকেই আজ বিবেকানন্দ-গবেষণায় রত। আশা করা যায়, তাঁদের সমবেত ও একক প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতে স্বামীজী-সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য জানা যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারত এবং পৃথিবীকে উত্তোলনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর যে ভূমিকা, তাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে, স্বামীজী শুধু ভারতের নন, সমগ্র জগতের। নিপীড়িত মানবাত্মার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। তাই শুধু আধ্যাত্মিক মুক্তিই তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়, জীবনের যত সমস্যা মানুষকে বিব্রত করে, সব সমস্যার উপরই তিনি আলোকপাত করেছেন। জীবনকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখেননি, সামগ্রিকভাবে দেখেছেন। মানুষকে তিনি দেবতারূপে জ্ঞান করেছেন, তাই মানুষের কোন দিকটাই তাঁর কাছে অবহেলার মনে হয়নি। স্বামীজীর মৌলিকতা চমকপ্রদ। তাঁর চিন্তা যেমন ব্যাপক, তেমনই গভীর।

ভূমিকা

আমাদের মাতৃভূমি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। বহু বৎসরের পরাধীনতার পরে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি সবেমাত্র কয়েক বৎসর। এখন জাতিগঠনের জন্য সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর সমবেত প্রয়াস প্রয়োজন। কিন্তু সেই কাজে অগ্রসর হতে হলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিল্পী যখন ছবি আঁকতে বসেন তখন তাঁর সেই ছবি উৎকৃষ্ট হতে পারে যদি তাঁর মনে আঁকার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকে। তেমনি কোনো ইঞ্জিনীয়ার বাড়ী তৈরী শুরু করার আগে অবশ্যই সংবাদ সংগ্রহ করে নেবেন—বাড়ীটি কিসের বাড়ী? বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সরকারী অফিস, নাকি বসতবাটী? তার-পরেই তো তিনি নক্সা তৈরী করে বাড়ী তৈরী করতে অগ্রসর হবেন। সুতরাং জাতিগঠনের কাজে হাত দেবার আগে আমাদের মনের মধ্যে ভাবী ভারতের পরিষ্কার ছবি এঁকে নিতে হবে।

ভারতবর্ষকে আমরা কোন্ আকারে গড়তে চাই? বিরাট সামরিক শক্তির দেশ রূপে? কিন্তু সেটা আদর্শ হতে পারে না। কোনো সামরিক জাতিই বেশীদিন টিকে থাকে না। ধনসম্পদ নিশ্চয়ই আমাদের চাই জনগণের দারিদ্র দূর করার জন্য। কিন্তু যদি মনে করি, নিছক সম্পদে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তাহলে ভুল করব। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সম্পদের সীমা নেই কিন্তু তারা শান্তি পাচ্ছে না। সে-দেশের ছেলেমেয়েরা সবরকম ভোগ্যদ্রব্য পাবার পরেও হতাশ হয়ে ঘুরছে—একেবারে উদ্দেশ্যহারা তাদের জীবন। সামরিক শক্তি আমাদের থাকবে স্বাধীনতাকে বজায় রাখার জন্য—প্রতিবেশীর রাজ্য অধিকারের জন্য নয়। আমরা সম্পদ অর্জন করব জনগণের অন্ন-সমস্যার সমাধানের জন্য। কিন্তু সম্পদ অর্জন করাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করব না। কি হবে শক্তি বা সম্পদ নিয়ে যদি তা মনের শান্তি দিতে না পারে?

তাই প্রয়োজন, ভারতের অতীত ইতিহাসের অনুশীলন। তা করব এইটি জানবার জন্য যে, প্রাচীন ভারত কিভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, আবার সেই-সঙ্গে শান্তির পথও দেখিয়েছে। তারপর কিভাবে সেই উন্নত অবস্থা থেকে তার পতন এল? ভাবী ভারতকে গঠন করতে হলে আমাদের গ্রহণ করতে হবে সেইসব আদর্শকে যা আমাদের বড় করেছিল, এবং বর্জন করতে হবে সেইসকল কারণকে, যা তার পতন ঘটিয়েছিল। যোগ করতে হবে তার সঙ্গে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান-শিক্ষাকে।

'বিজ্ঞান' কথাটি সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে। এখন তো আমরা বিজ্ঞানের নামে উঠি বসি। বিজ্ঞানের নামে অতীতকে তুচ্ছ করা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অতীতকে অগ্রাহ্য করা, অতীতে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী ছিল তা না-জানা কি বৈজ্ঞানিকতা? গত তিন হাজার বছর কিভাবে আমরা বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও টিকে আছি, তার কোনো সন্ধান না নিয়ে অন্ধের মতো পাশ্চাত্যভাবের পিছনে ছোটা কি বৈজ্ঞানিকতা—যে-পাশ্চাত্যভাব এখনও কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি? পাশ্চাত্যদেশে জীবনসমস্যা কিভাবে পুঞ্জীভূত হয়েছে, তা কি জানার প্রয়োজন নেই? ঈশ্বর আমাদের মানুষ করেছেন, যুক্তি-বিচারের ক্ষমতা দিয়েছেন, আমরা কেন যাচাই করে নেব না? কেন কেবল কলুর বলদের মতো ঘুরপাক খাব—এমনকি বিজ্ঞানের নামেও?

বর্তমানে আমরা চারদিকে দেখছি অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। সমাজের সর্বস্তরে সততার অভাব, চোরাকারবার, কালো টাকা। এইসবে যেন সমাজ পরিপূর্ণ। যেদিকে তাকাই সেইদিকেই হতাশা ও অবক্ষয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে বা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই করুণ চিত্র। দেখি যে, ঐহিক কোনো-কোনো দিকে উন্নতি হলেও নৈতিকক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে ভীষণভাবে। এই বিরুদ্ধ পরিমণ্ডলীর মধ্যে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মানুষের পক্ষে বসবাস করা কঠিন হয়ে উঠছে। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই সভ্যতার সংকট।

সভ্যতার এই সংকটের মূল কারণ—অধ্যাত্ম-ভাবকে অবহেলা করে কেবল জড়বাদী ভাবধারার অনুসরণ। এই জড়বাদই পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জীবনাদর্শ। সেখান থেকে ঐ ভাবের প্লাবন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, ভারতবর্ষ রেহাই পায়নি। তা প্রবেশ করেছে আমাদের জীবনের সর্বত্র, বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে।

যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আমাদের দেশের দুরবস্থা কেন? মানুষ নেই

কেন? তার উত্তরে বলব, আমাদের মূলে গণ্ডগোল। যে-শিক্ষা আমরা পাই, তাতে কোনোরকম মানুষ তৈরী হতে পারে না। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে, কাঁটার ঝোপ থেকে কি আঙুর পাওয়া যায়? কিংবা ছোট ফুলের চারা থেকে ডুমুর? আমাদের দেশে এসে ইংরেজরা আমাদের ঘাড়ে ইউরোপীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল। আমরা এখনও, স্বাধীনতার পরেও, মোটামুটি তারই অনুসরণ করে চলেছি। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে উঠেছে—তার সঙ্গে তো আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ইতিহাসের যোগ নেই। আমরা যদি জাতীয় জীবনধারার মতো করে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ঢেলে সাজাতে না পারি, যদি বৃটিশ পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ করে যাই, তাহলে অবস্থা এক রকমই থাকবে।

যুগযুগান্তর ধরে এই জাতি চেয়েছে চরম সত্যের উপলব্ধি। আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্যমুখী ছিল। একেই বলা হয়েছে, পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা। কিন্তু তাই বলে অপরাবিদ্যা বা ঐহিক শিক্ষাকে অবহেলা করা হয়নি। সেজন্য ভারতবর্ষ অপরাবিদ্যাতেও শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। আমাদের চাই সামঞ্জস্য—পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে। এদের মধ্যে বিভেদই শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যা এনেছে। স্বামীজী বলেছেন, পূর্বে আমাদের দেশে যেসব জ্ঞানের শাখা ছিল সেসব শেখাতে হবে। তার সঙ্গে ইংরেজী। ইংরেজী ভাষায় আমরা জগতের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞানও দরকার, আর প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেকনলজি, যার দ্বারা শিল্প গড়ে উঠবে। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে পরাবিদ্যাকে যোগ করতেই হবে যদি মানুষ হতে চাই। পরাবিদ্যার ভিত্তি চরিত্রে। চরিত্র গঠন না হলে কোন কিছুই হয় না। বক্তৃতা দিলে বা পার্লামেন্টে আইন পাস করালে চরিত্র তৈরী হয় না। তারজন্য চাই বিশুদ্ধ ধর্ম ও নীতিশিক্ষা। সেই শিক্ষাই পরিশীলিত করবে শিক্ষার্থীর মন ও বুদ্ধি, চিত্তকে করবে দৃঢ়, অন্তরকে করবে নির্মল। মনই আসল, মনের সাহায্যেই তো মানুষ জ্ঞান আহরণ করে থাকে। সেই মন দোষদুষ্ট হলে তার সাহায্যে সত্যকার জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। একবার এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এলেন আমাদের চেনা একটি কলেজে ল্যাবরেটরি দেখতে। তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ দিয়ে ঝাপসা দেখলেন। তখন লেন্সটি খুলে রুমাল দিয়ে তা মুছে যখন সেটি আবার যন্ত্রে

বসিয়ে দিলেন তখন সব পরিষ্কার। এখন, মন নামক যে-অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমরা দেখি, তাকে যদি যত্নে না রাখি যদি পরিষ্কার না করি, কিভাবে তার দ্বারা জ্ঞানের বস্তু 'দর্শন' করব ?

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা থেকে ভারতে এলেন, তখন দক্ষিণদেশে একটি জায়গায় কতকগুলি লোক তাঁকে বলেন, স্বামীজী, আপনি রাজনীতিতে আসুন, দেশকে স্বাধীন করুন, তবে আপনার কথা শুনব! স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা তোমাদের কালই দিতে পারি, তোমরা কি তাকে রাখতে পারবে ? তোমাদের মধ্যে মানুষ কোথায় ? আগে মানুষ তৈরী কর, তারপর স্বাধীনতার কথা ভাব।

স্বামীজী কতখানি ঠিক কথা বলেছিলেন আজ তা বুঝতে পারছি। আমাদের দেশের দুর্দশা কেন ? মানুষ নেই বলে। ভ্রান্ত শিক্ষানীতি ও জীবন-নীতিই মানুষ তৈরী হতে দিচ্ছে না। এখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে সমাবর্তন-সভা হয়, তাতে অনেক কথাই থাকে—থাকে না শুধু জীবনাদর্শের কথা। আগেকার দিনের সমাবর্তন-সভা, যার কথা উপ-নিষদে পাই, তার রূপ কত পৃথক। তখন আচার্য শিষ্যকে বাড়ী যাবার আগে বলছেনঃ সত্যং বদ, ধর্মং চর। সত্য কথা বলো, ধর্ম অনুষ্ঠান করো, নিন্দনীয় কাজ করো না, সৎ আচরণ করো। তাঁরা বলতেন, তুমি মানুষ হও। বিদ্যালয় ছেড়ে যাচ্ছ বলে শিক্ষা ছেড়ো না, অধ্যয়ন তোমাকে করতেই হবে। তাঁরা আরও বলতেন, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব। এইসব উপদেশ তাঁরা দিতেন। স্বামীজী এর সঙ্গে আরও দুটি কথা যোগ করে দিয়েছেন, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'।

আজকাল যারা লেখাপড়ায় ভাল, তারা সবাই বিদেশে যেতে চায়। বিদেশে যাওয়া ভাল, কিন্তু সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়া—সেটা কি-রকম কথা ? কেন বিদেশে থেকে যাবে ? যে-ভারতবর্ষ তাদের জন্ম দিল, মানুষ করল, তাকে ভুলে যাবে শুধু বেশী টাকা-পয়সা পাবে বলে ? এদেশের বিরুদ্ধে তাদের অনেক কিছু বলার আছে জানি। তারা বলবে, এখানে বৃথা ঘুরে মরি, কেউ আমাদের দাম দেয় না, দুশো টাকার চাকরি পেতেও কত হাঙ্গামা, কিন্তু আমেরিকায় হাজার-হাজার ডলারের চাকরি মেলে। সবই ঠিক, আমাদের দেশে প্রতিভা বা কর্মদক্ষতার মূল্য দেওয়া হয় না, তাও ঠিক—তবু আমরা ভারত-

বর্ষকে ছাড়ব না, এ দেশকে ভুলব না। এইতো সেদিন কাগজে পড়লাম, বিজ্ঞানের কি-একটা পুরস্কার পেলেন ১২-১৩ জন ভারতীয়। তাঁরা কিন্তু এখন আমেরিকার নাগরিক। তাহলে দাঁড়াল কি, ভারতবর্ষ তাঁদের মানুষ করল, তার কাছে তাঁরা কত দান নিলেন অথচ দেবার বেলায় দিলেন অন্য দেশকে সম্মান। এটা ভাববার কথা।

ছাত্ররা অবশ্যই পড়াশোনা নিয়ে থাকবে। কিন্তু তাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, তারা ভারতবাসী। তারা শুধু বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, বাইরের লোকের সঙ্গে যোগ থাকবে না, তা নয়। তারা যেখানে আছে তার আশপাশের বস্তি বা গ্রামের মধ্যে গেলে দেখবে, কিভাবে সেখানে মানুষ বাস করে, কি তাদের দুরবস্থা। তখন তাদের স্বামীজীর কথা মনে পড়বে। ঐসব লোককে মানুষ না করে, যদি মুষ্টিমেয় লোক কেবল নিজেরাই লেখাপড়া শেখে, তাতে দেশের কোন লাভ নেই। যদি দেশকে জাগাতে হয়, সকলকেই শিক্ষা দিতে হবে। ঐসব সাধারণ মানুষকে এমনভাবে কাজকর্ম শেখাতে হবে যাতে তারা উপার্জন করতে শেখে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ছাত্ররা শিক্ষা শেষ হবার পরে অন্তত দুবছর যদি দেশের কাজের জন্য দেয়, যারা গরীব-দুঃখী, লেখাপড়া জানে না, তাদের মানুষ করবার জন্য চেষ্টা করে, তাহলে এই সমস্ত লোকের আশীর্বাদে তাদের জীবনেও সাফল্য আসবে এবং দেশেরও শীঘ্র উন্নতি হবে।

এবার নারীদের উদ্দেশ্য করে দু-একটা কথা বলতে চাই। যদি আমাদের একটি মহান জাতির মর্যাদা লাভ করতে হয়, তাহলে নৈতিক ও সামাজিক গ্লানি ও দুর্বলতা অবশ্যই দূর করতে হবে। এ-বিষয়ে বোধহয় নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশী দায়িত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ। অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা, অনাথ-দের সমস্যা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি ও অসাম্যের বিরুদ্ধে নারীরা নিজেদের সংগঠিত করতে পারেন। তিনশ-চারশ অনাথের বৃহৎ আশ্রমের জন্য চেষ্টা না করে নারীরা একটি বা দুটি সন্তানের দায়িত্ব নেবার জন্য পিতা-মাতা খুঁজে বার করতে পারেন না-কি? অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি আছেন যাঁদের সন্তান নেই। তাঁদের প্রত্যেকে একটি বা দুটি সন্তানের যত্ন, ভরণ-পোষণের ও শিক্ষা-দানের দায়িত্ব নিতে পারেন না-কি? এই ব্যবস্থা অনাথাশ্রমের চেয়ে শ্রেয়, কারণ অনাথাশ্রমে শিশুরা পারিবারিক যত্ন, পিতামাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। সন্তান-হীন স্বামী-স্ত্রী এই স্নেহ দিয়ে মানুষ করতে পারেন একটি-দুটি অনাথ

শিশুকে। এইভাবে একটি বিরাট মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে।

প্রকৃত ভারতবর্ষ গ্রামেই বর্তমান। স্বামীজীও সেকথাই বলেছেনঃ Remember that the nation lives in the cottage. দেশের উপজাতি ও অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নয়ন করতে না পারলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে এদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান করতে হবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ দারিদ্র। আজ একমুঠো খাবার জুটলে আগামীকাল জোটে না। এই পেটের জ্বালার সঙ্গে রয়েছে অন্য সমস্যাও—যেমন স্বাস্থ্য সমস্যা, দূষিত পরিবেশ, দূষিত জলের সমস্যাও। তাই আজ অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যাকে জাতীয় ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবেই।

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে প্রত্যেকের কর্তব্য—ভাগ্যহত, অনুন্নত ও উপজাতি মানবগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করা। প্রত্যেকের কর্তব্য, তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা। প্রত্যেকের কর্তব্য, সমাজজীবনে আদর্শ ও নীতিবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, যাতে করে সমগ্র জাতির সর্বনাশের মূলে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ বর্তমানে যে জঘন্য স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছে—তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়।

অনুন্নত মানুষদের মধ্যে গিয়ে যেমন তাদের অন্নবস্ত্রের জন্য চেষ্টা করতে হবে, তেমনি তাদের নোংরা পরিবেশ সম্বন্ধেও সচেতন করে তুলতে হবে। চলচ্চিত্রের সাহায্যে একাজ হতে পারে। তাদের স্বাস্থ্যমূলক, উন্নয়ন ও সংস্কৃতিমূলক চিত্র দেখানো প্রয়োজন। তাদের সব রকমে সাহায্য করতে হবে। অপরকে সাহায্য করলে নিজে সুখী হওয়া যায়। আমরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করে যে-সুখ পাই, তার থেকে অনেক বেশী সুখ মিলবে যদি দেখি —আমার সাহায্য পেয়ে কেউ সুখী হয়েছে।

ভারতবর্ষের যুবকদের উপর স্বামীজীর ছিল অনেক আশা। তিনি বলতেনঃ এরাই আমার 'Idea'গুলো 'Work-out' করবে। তাঁর সমস্ত চিন্তারাশি তিনি যুবকদের উপরই ন্যস্ত করে গেছেন। তাই যুবকদের কর্তব্য নিজেদের স্বামীজীর উত্তরাধিকারী জেনে জাতিগঠন ও দেশগঠনের কাজে এগিয়ে আসা। তাদের উচিত স্বামীজীকে নিরাশ না করা। তবে প্রথমে দরকার যুবকদের ব্যক্তিচরিত্র গঠন। স্বামীজী সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন চরিত্রগঠনের উপর।

কিন্তু বর্তমান কালে যুবকদের মধ্যে একটি প্রবণতা দেখা যায়, তারা নিজেদের জাতীয় আদর্শগুলিকে অকেজো বলে অবজ্ঞা করে বিদেশ থেকে আমদানি করা নূতন আদর্শের প্রতি ছুটে চলেছে। এটা অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচায়ক। এর পিছনে রয়েছে আমাদের মহান জাতির ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে যুবকদের অজ্ঞতা। কেউ অস্বীকার করবে না যে, ঐ সকল নূতন নূতন আদর্শ অন্যান্য দেশে সামাজিক কল্যাণ সাধন করেছে; কিন্তু সেগুলো হয়তো আমাদের পক্ষে কল্যাণকর নাও হতে পারে। কারণ সেসব চিন্তা-ভাবনা হয়তো এই দেশের অনুকূল সামাজিক পরিবেশে বিকশিত হয়ে উঠবে না। আমাদের কাছে আম যতই সুস্বাদু হোক না কেন, সেই আমগাছ হিমালয়ের সুউচ্চ স্থানে জন্মানো যাবে না। এদেশের জাতীয় জীবনের মুখ্য লক্ষ্য আধ্যাত্মিক আদর্শ। এই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি আছে এবং এখানকার সামাজিক পরিবেশের অনুকূল চিন্তা-ভাবনাই কেবল এই ভারতবর্ষের জমিতে শিকড় বিস্তার করতে পারবে। আমাদের কর্তব্য তাই স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' পাঠ করে তাঁর ধ্যান-ধারণার সাথে সুপরিচিত হয়ে বিদেশী চিন্তা-ভাবনার সাথে স্বামীজীর চিন্তাগুলোর তুলনা করে এ-দেশের ভবিষ্যৎ পুন-র্গঠনের যথার্থ পথ নির্ধারণ করা।

স্বামীজীর হৃদয়ে ছিল গভীর ভালোবাসা। তিনি জগতের সকল মানুষকে, বিশেষত সকল জাতির দরিদ্র ও পদদলিত মানুষকে ভালোবাসতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট; তা যেখানেই হোক না কেন তাঁকে বিচলিত করতো। তিনি বলতেনঃ যাঁর হৃদয় যতো বড়, তাঁর দুঃখ-কষ্ট ততই তীব্র। এই প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা উল্লেখ করা খুবই যুক্তিযুক্ত হবে—একদিন রাত দুটোর সময় স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। তিনি তাঁর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় পায়চারি করছেন। অবাক হয়ে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি স্বামীজী! আপনার ঘুম হচ্ছে না?' স্বামীজী তার উত্তরে বললেন, 'দেখ পেসন, আমি বেশ ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগলো আর আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হয় কোন জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং অনেক লোক তাতে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে।' বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এতে আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, কোথায় কি একটা দুর্ঘটনা হল আর স্বামীজীর এখানে ঘুম ভেঙে গেল—এটা কি সম্ভব! এরকম

চিন্তা করে মনে মনে তিনি একটু হাসলেন। কিন্তু আশ্চর্য! পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখা গেল, ঠিক সেই সময় ফিজির কাছে কোন একটি দ্বীপে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতে হাজার হাজার লোক মারা গেছে, অসংখ্য মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে। খবরটি পড়েই তিনি অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, সিস্‌মোগ্রাফের (পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কম্পন পরিমাপ যন্ত্র) চেয়েও স্বামীজীর nervous system, more responsive to human miseries (মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল)।

স্বামীজী বিদেশ যাবার আগে হরি মহারাজকে (স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলেছিলেনঃ হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে!

যুবকদের স্বামীজীর এই হৃদয়বত্তা, এই পরদুঃখকাতরতার ভাব প্রথমে আয়ত্ত করতে হবে। তারপর দেশের দুর্দশা নিরসনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—'An ounce of practice is more than a ton of talks.' এক টন কথার চেয়ে এক আউন্স কাজ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শুধু স্বামীজীর উপদেশ পড়ে জীবনী পড়ে কি হবে, যদি আমরা তাঁর আদেশ অনুযায়ী একটুও কাজ না করি? স্বামীজীর কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে। যার যেমন সামর্থ্য সেই অনুযায়ী। কোন্ কাজ স্বামীজীর কাজ? যে-কোন ভাল কাজ, যে-কোন সৎপ্রচেষ্টাই স্বামীজীর কাজ। শিক্ষিত যুবকরা প্রত্যেকেই স্বামীজীর আদর্শে অনেক কিছুই করতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলছি, তারা তাদের আশেপাশে অনুন্নত মানুষ যারা রয়েছে, তাদের একটু লেখাপড়া শেখাতে পারে, তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখাতে পারে, দুটো ভাল কথা বলে বা ধর্ম-উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

বড় বড় সঙ্ঘ-সংস্থা ছাড়া যে এ-কাজ হবে না, এটা ঠিক নয়। আসল হচ্ছে কাজ করবার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা থাকলে, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকলে যুবকরা কেউই অপরের জন্য কিছু না করে থাকতে পারবে না। আর যতই তারা স্বামীজীর কাজ করবে ততই তাদের ভিতর থেকে শক্তি খুলে যাবে। নিজেদের সামর্থ্য দেখে তারা তখন নিজেরাই অবাক হয়ে যাবে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একটি যুবক একাই জঙ্গলে উপজাতিদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেছিল। সেসময় তার সঙ্গে কেউ ছিল না। আজকে দেখছি বহু লোক—সরকারী লোক, বেসরকারী লোক—তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে, ক্রমেই বিরাট আকার ধারণ করছে। আসলে স্বার্থশূন্যতাই শক্তি। যখনই আমি স্বার্থপর, তখনই আমি একা, তখনই আমি দুর্বল। লোকে যদি বুঝতে পারে এই লোকটি সত্যিই নিঃস্বার্থ, তখন সবাই তার পেছনে এসে দাঁড়াবে। তাই নিঃস্বার্থ হতে হবে। আর চাই পবিত্রতা, অধ্যবসায় আর আত্মবিশ্বাস। এগুলি থাকলে আমাদের যুবসমাজের উপর স্বামীজীর আশীর্বাদ বর্ষিত হবে। তাঁর আশীর্বাদে তারা অসাধ্যসাধন করতে পারবে। তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত বাস্তব হয়ে উঠবে।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর বাণী

স্বামীজীর কথাগুলি মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে হচ্ছে সেসব কথা যা শুধু ভারতবর্ষের জন্য। বিশেষত সে-যুগের ভারতবর্ষের জন্য। অর্থাৎ সে-যুগের ভারতবর্ষে যেসব প্রধান প্রধান জাতীয় ও সামাজিক সমস্যা সেগুলির সমাধানের জন্য। পরানুকরণপ্রিয়তা, হীনম্মন্যতা, কুসংস্কার, ধর্মের নামে গোঁড়ামি, নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার, অস্পৃশ্যতা স্ত্রীজাতির অনাদর এবং যারা শ্রমজীবী ও প্রকৃত ধনোৎপাদনকারী তাদের প্রতি অবজ্ঞা—এগুলিই ছিল সে-যুগের ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা। স্বামীজী জ্বলন্ত ভাষায় এসবের সমাধানের পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। আর বস্তুত তাঁরই নির্দেশিত পথে আজকাল এগুলির সমাধানও হচ্ছে। স্বামীজীর নির্দেশিত পথ হচ্ছে শিক্ষা। তিনি বলতেন শিক্ষার বিস্তার হোক, তাহলে আপনা-আপনি এসব সমস্যার সমাধান হবে। জোর করে এসব সমস্যার সমাধান করা যায় না। শুধু আইন করেও না। তিনি বলতেন, অজ্ঞতায় জাতির মন আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট হয়ে আছে। শিক্ষা দিয়ে তাকে সজীব করে গতিশীল করে তুলতে হবে। সুখের বিষয়, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতির মনের এই পরিবর্তন ঘটছে, তার সঙ্গে সঙ্গে এসব সমস্যার সমাধানও ক্রমে হতে চলেছে। জোর করার প্রয়োজন হচ্ছে না। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা ফিরে পাচ্ছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষ অগ্রণীর ভূমিকাও নিচ্ছে। তবু যতটা শিক্ষার বিস্তার হবার কথা তা হয়নি বা যে-শিক্ষাকে স্বামীজী 'মানুষ গড়া'র শিক্ষা বলতেন সে-শিক্ষারও প্রবর্তন দেশে ঘটেনি। মানুষই দেশের সম্পদ। সৎ, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী মানুষই প্রকৃত মানুষ। আমাদের শিক্ষা পুস্তকী শিক্ষা, কার্যকরী শিক্ষা নয়। আমরা স্বপ্নবিলাসী, বাকপটু, কিন্তু

ঠুঁটো জগন্নাথ। স্বামীজী ভারতের আদর্শপরায়ণতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের কর্ম-কুশলতার যোগসাধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। এককথায় শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হোক এই চেয়েছিলেন। মানুষের মন উঁচু সুরে বাঁধা থাকবে, কিন্তু কাজেকর্মে নিপুণ হবে। স্বামীজীর মতে ভারতের জাতীয় আদর্শ হচ্ছে—ত্যাগ ও সেবা। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করবে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জীবনযাপন করতে। ব্যক্তিগত সুখের জন্য জীবন নয়। সমষ্টির কল্যাণেই ব্যষ্টির কল্যাণ। 'জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত' কথার অর্থ হচ্ছে জন্ম থেকেই সমষ্টির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গীকরণ।

মানুষই স্বামীজীর কাছে ভগবান। মানুষের মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। ঈশ্বরবুদ্ধিতে মানুষের সেবাই তাঁর কাছে ধর্ম। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। মন্দিরেও আছেন। কিন্তু মন্দিরে যে-বিগ্রহ আছেন, তিনি 'অচল', তিনি নড়েন-চড়েন না, কথা বলেন না। কিন্তু আর্ত মানুষ কথা বলে, দুঃখ জানায়, তার দুঃখ দূর করে দিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মন্দিরের বিগ্রহ যেমন ঈশ্বরের বিগ্রহ, মানুষও তেমন ঈশ্বরের বিগ্রহ। পার্থক্য এই যে একজন অবাক, আর একজন সবাক। স্বামীজী এই সবাক, সচল ঈশ্বর-বিগ্রহের দুঃখ-বেদনায় অশ্রু বিসর্জন করতেন। তাঁর সব-কিছু উদ্যম এই সচল বিগ্রহকে কেন্দ্র করে। এই বিগ্রহের দুঃখ দূর করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

স্বামীজী ভারতপ্রেমী ছিলেন, কিন্তু তা এইজন্যে নয় যে ভারত তাঁর জন্মভূমি ছিল। ভারত তাঁর কাছে পুণ্যভূমি, কারণ ভারত ঋষির দেশ, সেই-সব মানুষের দেশ, যাঁরা সত্যের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারতেন। স্বামীজী ভারতকেই 'সত্য' বলে সম্বোধন করেছিলেন। বলেছিলেন ভারতের মৃত্যু হলে সত্যের মৃত্যু ঘটবে, ধর্ম লোপ পাবে, সমস্ত উচ্চ চিন্তা মুছে যাবে। শুধু ভারতের জন্যে ভারতের বেঁচে থাকার দরকার নয়, বিশ্বের জন্যে ভারতের বেঁচে থাকার দরকার। ভারত সমস্ত পৃথিবীর ধর্মগুরু।

স্বামীজীর আর যেসব কথা, তা কিন্তু সকল দেশের ও সকল যুগের জন্য। ভারত তাঁর কাছে বহুভাবে ঋণী, ভারতের জাতীয়তার তিনিই ছিলেন প্রধান উন্মেষক। কিন্তু এ তাঁর গৌণ পরিচয়, তাঁর আসল পরিচয় তিনি মানববন্ধু। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, দেশ-কালের ঊর্ধ্বে তাঁর দৃষ্টি। দেশপ্রেম

তাঁকে সংকীর্ণ করেনি। সব দেশই তাঁর আপনার দেশ, সব মানুষই তাঁর আপনার জন। তাই অনেক কথাই তিনি বলে গেছেন যা সকল দেশের সকল জাতির জন্য, যা সকল যুগের মানুষের কাজে লাগতে পারে। তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হয় পাশ্চাত্যদেশে—আমেরিকায়। তখনও আমেরিকা ইংলণ্ডের হাত থেকে পাশ্চাত্যজগতের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে পারেনি কিন্তু তার সূচনা দেখা গিয়েছিল। আমেরিকার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তার ধন-সম্পদ, বাণিজ্য-বুদ্ধি, উদ্ভাবনীশক্তি ও যন্ত্রশিল্প, তার কর্মকুশলতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং নারীজাতির প্রতি ব্যবহার স্বামীজীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আমেরিকার পর তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি দেশও দেখেন। ক্রমে সমগ্র পাশ্চাত্যজাতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ইউরোপ ও আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যেমন, তেমনই দরিদ্র বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গেও তাঁর পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছিল। পাশ্চাত্যসমাজের সর্বস্তরেই তাঁর যাতায়াত ছিল, সর্বত্রই তিনি ছিলেন অতি মাননীয় অতিথি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পাশ্চাত্য-জাতির অভ্যুদয় সুনিশ্চিত। তারা পুরুষকারের সাহায্যে সমৃদ্ধি ও সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় একদিন উঠবেই। তাদের এই কর্মোৎসাহ ও শ্রমশীলতা তাঁকে মুগ্ধ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, হীনম্মন্যতা, সবকিছুতে অলস ও শিথিল ভাব তাঁকে ব্যথিত করে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষও যেন পাশ্চাত্যদেশের কর্মকুশলতা অর্জন করতে চেষ্টা করে। তার রজঃশক্তি ভারত-বর্ষে আসুক, ভারতবর্ষের জীবনস্রোত আরও কর্মমুখর হোক, গতিশীল হোক। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীময় এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এ আলোড়নের ফলে শূদ্রজাতির অর্থাৎ যারা শ্রমজীবী, তাদের অভ্যুত্থান হবে এ তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। রাশিয়া এবং চীন এর কেন্দ্র হবে একথাও বলেছিলেন। ভারতেও শিল্পবিপ্লব ঘটুক, ভারতেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থান হোক এ তিনি চেয়েছিলেন। এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ভারত রূপ নেবে এই তাঁর বিশ্বাস ছিল। এই নতুন ভারতকে আহ্বান করে তাঁর অমর ভাষায় তিনি বলেছিলেন—'...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক

কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'

শূদ্র-জাগরণ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভারতও গড়ে উঠবে এ স্বামীজী নিশ্চিত জানতেন। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর পতন অনিবার্য, এ-কথাও তিনি বলেছিলেন। শূদ্র অর্থাৎ যারা শুধু কায়িক পরিশ্রম করে, অর্থাৎ মেহনতি মানুষ—সমাজতন্ত্রের ভাষায় 'প্রলেতারিয়েত'—নিপীড়িত গণমানুষ। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণত্বের অর্থ সংস্কৃতিবান হওয়া; মন, বুদ্ধি ও হৃদয়ের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হওয়া। 'শূদ্র' সে-ই, কায়িক শক্তির সঙ্গে সেবাভাব যার থাকবে কিন্তু বুদ্ধি ও কৃষ্টির দিক দিয়ে যে নিকৃষ্ট। শূদ্র-জাগরণ হোক এ স্বামীজী চেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু এ তিনি কখনও চাননি যে শূদ্র-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষের কৃষ্টি শূদ্রত্বে নেমে যাবে। বরং তিনি চেয়েছিলেন এবং এ ঁর আশা ছিল যে সমস্ত জাতি ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হবে। শুধু নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডারের মালিক হয়ে থাকবে, আর অগণিত নরনারী বঞ্চিতের হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে এ স্বামীজী সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন, এ জ্ঞানভাণ্ডার সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাক, সবাইকে সুযোগ দেওয়া হোক, অধিকার দেওয়া হোক এ জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করার। এ জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করে সবাই ব্রাহ্মণ হয়ে যাক, ব্রাহ্মণোচিত জীবনযাপন করতে চেষ্টা করুক—এই ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। অসাধারণ শক্তির আধার শূদ্রজাতি, সেই শক্তি জাগ্রত হোক, সমগ্র জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হোক—এই তাঁর কামনা। এই শক্তি শিক্ষার গুণে শুদ্ধ ও সংস্কৃত হয়ে সমাজদেহের সকল অঙ্গে বিচ্ছুরিত হোক, আর সমস্ত জাতির চরিত্রে ব্রাহ্মণের গুণগুলি প্রতিফলিত হোক—এই হবে সমস্ত জাতির প্রধান জীবনলক্ষ্য। ব্রাহ্মণের জ্ঞানপিপাসা, অনাড়ম্বর জীবন, নিরভিমানতা, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি গুণ—মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সব জাতির পক্ষেই এই গুণগুলি কাম্য, বিশেষত ভারতবাসীর পক্ষে। কারণ ভারতবর্ষেই এই ব্রাহ্মণ-চরিত্রের কল্পনা। শুধু কল্পনা নয়, বাস্তবে রূপায়ণও হয়েছিল ভারতবর্ষে।

নতুন ভারতে ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং শূদ্রের কর্মশক্তি ও সেবার সুষম সমন্বয়ে এক নতুন গণ-উত্থান ঘটুক—স্বামীজীর প্রচারিত কর্মসূচীর এই দিকটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রক্তাক্ত সংঘর্ষের মাধ্যমে ব্রাহ্মণকে শূদ্রত্বে

নামিয়ে দিয়ে নয়, শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করে আগামী দিনের বিপ্লব আসুক। বিপ্লব মানে পরিবর্তন, রূপান্তর; সেই রূপান্তর হোক সুস্থ, সুন্দর, গঠনমূলক পথে। স্বামীজী বলতেন, 'লেভেলিং আপ, লেভেলিং ডাউন নয়।' পাছে নিছক শূদ্র-শক্তির জাগরণের ফলে ভারত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাই স্বামীজী বলেছিলেন, 'হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে...।' কিন্তু শুধু ভারতকে সতর্ক করে স্বামীজী নিরস্ত হননি। তিনি বলেছিলেন, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' অর্থাৎ ভারত দেখাবে কি করে শূদ্র-শক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণ-শক্তির যোগসাধন করা যায়। কিভাবে বেদান্তের সঙ্গে সমাজবাদকে সমন্বিত করা যায়।

পাশ্চাত্যদেশে তিনি শূদ্র-শক্তির জাগরণে ধন-সমৃদ্ধি, ভোগসম্পদের প্রাচুর্য দেখেছেন। কিন্তু সেখানে জীবন লক্ষ্যহীন; ইন্দ্রিয়সুখের ঊর্ধ্বে কোন লক্ষ্য নেই। শুধু ইন্দ্রিয়সুখ নিয়ে সভ্যতা বাঁচতে পারে না—ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয়। তাই তিনি পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতা ও প্রাণচাঞ্চল্য দেখে খুশি হলেও তাদের ভোগ-সর্বস্ব জীবনপ্রণালী দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন তোমরা আগ্নেয়-গিরির মুখে দাঁড়িয়ে আছ। যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সেই বিস্ফোরণ পর পর দুটি মহাযুদ্ধে ঘটে গেছে। পাশ্চাত্যের মানুষের চূড়ান্ত স্বার্থসর্বস্বতা, লোভ, ইন্দ্রিয়পরতা প্রভৃতি দেখে স্বামীজী উনবিংশ শতকের শেষ পাদে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেনঃ তারা যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তারা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসবে। স্বামীজীর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি যে মিথ্যা ছিল না তার প্রমাণ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এতেই শেষ নয়। আরও বিস্ফোরণের আশঙ্কা বিদ্যমান। কারণ পাশ্চাত্যের জীবনদর্শন বদলায়নি, এখনও ভোগসর্বস্বতায় সীমাবদ্ধ। সেখানে কোন আদর্শ নেই; সেখানে আছে শুধু ভোগ আর ভোগ। ভোগ হোক কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের মানও যেন বেড়ে যায়। তিনি বলতেন মানুষের মধ্যে যে-'দেবতা' ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগাতে হবে, দেবত্বে মানুষকে টেনে তুলতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষা, ধনসম্পদ, সমাজ-জীবন, ধর্ম-কর্ম সবকিছুর একমাত্র লক্ষ্য—এই দেবত্বের বিকাশ। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, বেদান্তের

মধ্যে, ভারতের কৃষ্টির মধ্যে, ভারতের চিন্তার মধ্যে এই দেবত্বের বিকাশ কিভাবে হতে পারে তার নির্দেশ দেওয়া আছে। দেওয়া আছে সেই মন্ত্র যাতে ইহ-পরত্রের মিলন ঘটানো যায়, স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে সেতুবন্ধন করা যায়। তাই ভারত তাঁর এত প্রিয় ছিল এবং তাই তিনি বলতেন, একমাত্র ভারতের চিন্তাই বর্তমান জগৎকে বাঁচাতে পারে। মানুষের মধ্যেই ভগবান, সেই ভগবানকে নিজের মধ্যে এবং অপরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা অর্থাৎ মানবসত্তাকে ভাগবতসত্তাতে পরিণত করা, ভগবানের যত গুণ, যত বিভূতি, তা আয়ত্ত করা—এ এক অভিনব কল্পনা! কিন্তু ভারতের কাছে এ কল্পনা নয়, এ বাস্তব। ভারতের ঋষিরা যে শুধু এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়, জীবনে তাঁরা এ-আদর্শ পালন করে গেছেন। ভারত বহু দুর্দিনেও এ-আদর্শকে ভোলেনি, পাছে তার সুদিনে ভুলে যায়, তাই স্বামীজীর সতর্কবাণীঃ দেবত্বের বিকাশই জীবনের লক্ষ্য। আত্মসুখ নয়, সকলের সুখ। আমি আমার জন্য বাঁচব না, আমি আমার প্রতিবেশীর জন্য বাঁচব, সমাজের জন্য বাঁচব, দেশের জন্য বাঁচব। একটা জাতির মধ্যে, একটা দেশের মধ্যে এরকম মানুষের সংখ্যা যত বেশী হয়—নিঃস্বার্থ মানুষ, প্রেমিক মানুষ, আবার সৎ মানুষ, কর্মঠ মানুষ, সাহসী মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষ—সেই জাতি, সেই দেশ অগ্রগতির পথে তত এগিয়ে যায়। এ অগ্রগতি সম্ভব হবে যখন মানুষ নিজের মধ্যে পূর্ণতাকে প্রকাশ করতে যত্নবান হবে। পূর্ণতার সাধনা—অর্থাৎ পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা। এই সাধনারই আর এক নাম ধর্ম। এই বাণীই দিয়েছেন স্বামীজী আজকের জগতে। এই বাণীই বর্তমান জগতের উদ্দেশে স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ বাণী।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

আমার ভারত অমর ভারত

ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজীর গভীরতম আবেগের কেন্দ্র...ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হত তাঁর বুকের মধ্যে, প্রধ্বনিত হত তাঁর ধমনীতে; ভারতবর্ষ ছিল তাঁর দিবাস্বপ্ন, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর নিশীথের দুঃস্বপ্ন। শুধু তাই নয়। তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ—রক্তে মাংসে গড়া ভারতপ্রতিমা। ভারতের আধ্যাত্মিকতা, তার পবিত্রতা, তার প্রজ্ঞা, তার স্বপ্ন এবং তার ভবিষ্যৎ—সব কিছুর তিনি ছিলেন প্রতীকপুরুষ।

ভগিনী নিবেদিতা

আমার ভারত অমর ভারত

ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শ

যদি এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে, যাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যেতে পারে, যদি এমন কোন স্থান থাকে....যেখানে মানুষের ভেতর ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে হয়েছে, যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে, তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সে আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।[১]

রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নয়—কখনও ছিলও না। ...আর কখনও তা হবেও না।[২]

কিন্তু আমরা জানি, ভারতবাসী কখনও ধনসম্পদের চেষ্টা করেনি। পৃথিবীর যে-কোন জাতির চেয়ে বিপুলতর অর্থসম্পদের অধিকারী হয়েও ভারতবাসী কোনদিন অর্থের জন্য লালায়িত হয়নি। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে এক শক্তিমান জাতি ছিল, কিন্তু তার কখনও ক্ষমতার লোভ ছিল না। অন্য জাতিকে জয় করার জন্য ভারতবাসী কখনও বাইরে যায়নি। নিজেদের সীমার মধ্যেই তারা সন্তুষ্ট ছিল, বাইরের সাথে বিবাদ করেনি। ভারতীয় জাতি কখনও সাম্রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেনি। পরাক্রম ও সম্পদ এ-জাতির আদর্শ ছিল না।[৩]

প্রাচীন উপনিষদের যুগ থেকে আমরা পৃথিবীর সামনে স্পর্ধার সঙ্গে এই আদর্শ প্রচার করেছিঃ 'ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'—সন্তান বা ধনের দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্বলাভ হতে পারে। জাতির পর জাতি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছে এবং বাসনার জগতে থেকে তারা জগৎ-রহস্য সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সকলেই ব্যর্থ হয়েছে, প্রাচীন জাতিগুলি ক্ষমতা ও অর্থগৃধ্নুতার ফলে জাত অসাধুতা ও দুর্দশার চাপে বিলুপ্ত হয়েছে—নতুন জাতিগুলি পতনোন্মুখ। শান্তি না যুদ্ধ, সহনশীলতা

না অসহিষ্ণুতা, সততা না খলতা, বুদ্ধিবল না বাহুবল, আধ্যাত্মিকতা না ঐহিকতা—শেষ পর্যন্ত কোন্‌টি জয়ী হবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বাকি। বহু যুগ আগেই আমরা এ-সমস্যার সমাধান করেছি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে সেই সমাধান অবলম্বন করেই চলেছি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে রাখতে চাই। আমাদের সমাধান—ত্যাগ ও অপার্থিবতা।

সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—এইটিই ভারতীয় জীবনসাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সংগীতের মূলসুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি এবং ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হয়নি।[৪]

প্রাচ্যের নারীদের প্রতীচ্যের আদর্শে বিচার করা ঠিক নয়। পাশ্চাত্যে নারী পত্নী, প্রাচ্যে তিনি জননী। হিন্দুরা মাতৃভাবের পূজারী। সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত গর্ভধারিণী জননীর সামনে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সম্মান দেখাতে হয়। ভারতে পবিত্রতার স্থান খুব উঁচুতে।[৫]

ভারতে পরিবারের কেন্দ্র হলেন মা। তিনিই আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ। আমরা ভগবানকে বিশ্বজননী বলি, আর গর্ভধারিণী জননী হলেন সেই বিশ্ব-জননীরই প্রতিনিধি। একজন মহিলা ঋষিই প্রথম ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। বেদের একটি প্রধান সূক্তে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ হয়েছে।...যে-জাতক ঈশ্বর-আরাধনার ভিতর দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, সেই হল আর্য; আর অনার্য সে-ই, যার জন্ম ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মাধ্যমে।...

ভারতবর্ষে শুচিতার ধারণা এত গভীর যে, আমরা এমনকি বিবাহকে পর্যন্ত ব্যভিচার বলি—যদি তা ধর্মসাধনায় পরিণত না হয়।...পবিত্রতা, এই পবিত্রতাই হল ভারতীয় জাতির জীবন-রহস্য।[৬]

সংস্কৃত ভাষায় দুটি প্রাচীন মহাকাব্য আছে।...ঐ দুটিতে প্রাচীন ভারত-বাসীর আচার, ব্যবহার, সভ্যতা, তৎকালীন সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। দুটির মধ্যে আবার রামায়ণ বেশী প্রাচীন। রামায়ণকে রামের জীবন-চরিত বলা যায়।...রাম ও সীতা ভারতবাসীর আদর্শ। ভারতের ছেলেমেয়েরা, বিশেষত মেয়েমাত্রেই সীতার পূজা করে থাকে। ভারতীয় নারীর চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা—পরম শুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মতো হওয়া।[৭]

ভারতের সর্ব-সাধারণের বড় আদরের জিনিস মহাভারত। হোমারের কাব্য গ্রীকদের উপর যে-রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল, মহাভারতও ভারতবাসীর উপর সেই প্রভাব বিস্তার করেছে।...ধর্মভীরু অথচ দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে একদিকে ধর্ম ও ন্যায়, অন্যদিকে পুত্রবাৎসল্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব; পিতামহ ভীষ্মের মহৎ চরিত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের মহান ধর্মভাব, অপর চার পাণ্ডবের উন্নত চরিত্র—যাতে একদিকে মহাশৌর্যবীর্যের সঙ্গে অন্যদিকে সব অবস্থায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি অগাধ ভক্তি ও অপূর্ব আজ্ঞাবহতার সমাবেশ: মানবীয় অনুভূতির পরাকাষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় চরিত্র; এবং বিভিন্ন নারীচরিত্র—তপস্বিনী রানী গান্ধারী, পাণ্ডবদের স্নেহময়ী জননী কুন্তী, সদা ভক্তিপরায়ণা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি দ্রৌপদী—পুরুষ-চরিত্রের তুলনায় যাঁরা কোন অংশে কম উজ্জ্বল নয়—মহাভারতের এইসব এবং অন্যান্য শত শত চরিত্র এবং রামায়ণের চরিত্রগুলি গত হাজার বছর যাবৎ হিন্দুদের লালিত জাতীয় সম্পত্তি, তাদের ভাবধারা ও চরিত্রনীতির ভিত্তি। বাস্তবিক, এই রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন আর্যদের জীবনচরিত এবং জ্ঞানরাশির সুবৃহৎ বিশ্বকোষ। সভ্যতার যে-আদর্শ এতে চিত্রিত হয়েছে, তা লাভ করবার জন্য সমগ্র মানবজাতিকে এখন বহুদিন চেষ্টা করতে হবে।[৮]

এইসব চরিত্র আলোচনা করবার সময় আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন, পাশ্চাত্যের আদর্শ থেকে ভারতীয় আদর্শ কত পৃথক।...পাশ্চাত্যদেশের বক্তব্য, 'কর্ম কর, কর্ম করে তোমার শক্তি দেখাও।' ভারতের বক্তব্য, 'দুঃখকষ্ট সহ্য করে তোমার শক্তি দেখাও।' মানুষ কত বেশী জিনিসের অধিকারী হতে পারে, পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ করেছে; মানুষ কত অল্প নিয়ে থাকতে পারে ভারত এই সমস্যা পূরণ করেছে।[৯]

বিশ্ব সভ্যতায় ভারতের অবদান

আমাদের মাতৃভূমির প্রতি জগতের ঋণ অপরিসীম।[১০]

যখন আমি আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তখন সমগ্র পৃথিবীতে এমন আর একটা দেশ দেখতে পাই না, যে-দেশ মানব-মনের

উন্নতির জন্য এত কাজ করেছে। এই কারণেই আমি আমার জাতিকে কোনরকম নিন্দা করি না বা গালাগাল করি না। আমি বলি: যা করেছ, বেশ হয়েছে; আরও ভাল করবার চেষ্টা কর।[১১]

(খ্রীষ্ট) ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয়নি, তার অন্তত তিনশ বছর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও একই কথা। প্রাচীন ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন চিকিৎসকের দল। স্যার উইলিয়ম হান্টারের মতে নানান রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশী। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়গৌরব-স্বরূপ মিশ্রগণিত—সবগুলোরই জন্ম ভারতবর্ষে। বর্তমান সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর-স্বরূপ সংখ্যাদশকও ভারতমনীষারই সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (decimal) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যন্ত অন্য যে-কোন জাতির চেয়ে অনেক উপরে আছি। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারও একথা স্বীকার করেছেন। সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়েছে প্রধান সাতটা স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী।...ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা এখন সর্বসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষার ভিত্তি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক অন্য যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমান। জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলেছেন যে, এতে 'স্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত'। 'ঈসপস ফেবলস' নামে প্রসিদ্ধ গল্পমালা ভারতেরই দান—কারণ, ঈসপ তাঁর বই-এর উপাদান নিয়েছিলেন একটা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে। 'অ্যারাবিয়ান নাইটস' নামক বিখ্যাত কথাসাহিত্য, এমনকি 'সিনডারেলা ও বরবটির ডাঁটা' গল্পেরও উৎপত্তি ভারতেই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলো ও লাল রং উৎপাদন করে; এবং সবরকম অলঙ্কার তৈরীতেও বিশেষ দক্ষতা দেখায়। চিনি ভারতেই প্রথম তৈরী হয়েছিল। ইংরেজী 'সুগার' কথাটি সংস্কৃত শর্করা থেকে তৈরী। সবশেষে বলা যেতে পারে দাবা, তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়।

বস্তুত, সব দিক দিয়ে ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে

বুভুক্ষু ইউরোপীয়রা ভাগ্যের খোঁজে ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হতে থাকে এবং পরোক্ষভাবে এই ঘটনাই পরে আমেরিকা আবিষ্কারের কারণ হয়।[১২]

ভারতের ইতিহাসে কেউ এমন একটি যুগ দেখিয়ে দিন দেখি, যে-যুগে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিচালিত করবার মতো মহাপুরুষের অভাব ছিল? কিন্তু ভারতের কার্যপ্রণালী আধ্যাত্মিক—সেকাজ রণবাদ্য বা সেনাবাহিনীর অভিযানের দ্বারা হতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের মতো সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়েছে অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়ে তুলেছে।[১৩]

ভারতীয় জীবনে ধর্মের স্থান

আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র—একমাত্র ধর্ম। অন্যে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্য-বলে অগাধ ধনরাশি উপার্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও তার প্রচার, বাহ্যিক স্বাধীনতা-লাভের অপূর্ব সুখের কথা বলুক। হিন্দু এসব বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। তার সঙ্গে ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা বলুন ..অন্যান্য দেশের তথাকথিত অনেক দার্শনিকের চেয়ে আমাদের দেশের সামান্য কৃষকের পর্যন্ত এসব তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বেশী জ্ঞান আছে। ..

এখনও আমাদের জগৎকে শেখাবার কিছু আছে। এইজন্যই শত শত বছরের অত্যাচার এবং প্রায় হাজার বছরের বৈদেশিক শাসনের পীড়া সত্ত্বেও এই জাতি এখনও জীবিত আছে। এই জাতি এখনও জীবিত, কারণ এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করেনি।[১৪]

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে অনেক ঘুরেছি, জগতের সম্বন্ধে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। দেখলাম—সব জাতিরই এক-একটা প্রধান আদর্শ আছে, সেটিই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তি, কারও বা সামাজিক উন্নতি, কারও বা মানসিক উন্নতি-বিধান, কারও বা অন্য কিছু। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির ক্ষেত্রে ধর্ম, একমাত্র ধর্মই হল তার জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড; আমাদের জীবন-প্রাসাদের মূলভিত্তি এই ধর্মের উপরেই স্থাপিত।[১৫]

রোমের কথা মনে করুন। রোমের জাতীয় লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্তার। যে-মুহূর্তে এই সাম্রাজ্যবাদে বাধা পড়ল, অমনি রোম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধ্বংস হল। গ্রীসের আদর্শ ছিল বুদ্ধিবৃত্তি। যে-মুহূর্তে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিল, গ্রীসও অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। ঠিক এই অবস্থাই বর্তমান কালের স্পেন ও অন্যান্য নতুন দেশগুলোর হয়েছে। প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটা জীবনলক্ষ্য থাকে। যতক্ষণ এই লক্ষ্যটার উপর কোনও আঘাত না আসে ততক্ষণ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জাতি বেঁচে থাকে; কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শটা ধ্বংস হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাতিরই মৃত্যু ঘটে।

ভারতে সেই প্রাণশক্তি আজও অব্যাহত। এই শক্তি ভারতবাসী কখনও ত্যাগ করেনি। ভারতীয়দের সবরকম কুসংস্কার সত্ত্বেও এই প্রাণশক্তি আজও জাতির জীবনে একইভাবে বইছে। অতি ভয়ানক ঘৃণ্য কুসংস্কারে ভারতবর্ষ পূর্ণ। তাতে কিছুই আসে যায় না। জাতির জীবনপ্রবাহ ও জীবনের উদ্দেশ্য আজও তেমনিই আছে।...

ভারতবর্ষের আদর্শ—ভগবান, একমাত্র ভগবান। যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করেও ভগবানকে ধরে থাকবে, ততদিন তার আশা আছে।[১৬]

হিন্দুরা ধর্মের ভাবে খায়-দায়, ধর্মের ভাবে ঘুমোয়, ধর্মের ভাবে চলাফেরা করে, ধর্মের ভাবে বিয়ে করে, ধর্মের ভাবে দস্যুবৃত্তি করে। ...এ-জাতির লক্ষ্য ও প্রাণশক্তি—ধর্ম। এই ধর্মের উপর হাত পড়েনি বলেই জাতি এখনও বেঁচে আছে।[১৭]

সংগীতে যেমন একটা প্রধান সুর থাকে—অন্যান্য সুরগুলো তার অধীন, তারই অনুগত হলে তবে সংগীতে 'লয়' ঠিক হয়ে থাকে, এখানেও তা-ই করতে হবে। এমন জাতি থাকতে পারে, যার মূলমন্ত্র রাজনৈতিক প্রাধান্য; ধর্ম এবং অন্যান্য সব বিষয় নিশ্চয়ই তাদের এই মূল উদ্দেশ্যের নীচে স্থান গ্রহণ করবে। কিন্তু এই আর একটি জাতি, যার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম ও বৈরাগ্য; যার একমাত্র মূলমন্ত্র—এ জগৎ অসার, দুদিনের ভ্রমমাত্র।[১৮]

অমর ভারত আমার ভারত

বিদেশে আসবার আগেও আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম। কিন্তু এখন (বিদেশ থেকে ফেরবার সময়) মনে হচ্ছে, ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে

পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার কাছে পবিত্র। ভারত আমার পুণ্যভূমি; আমার তীর্থস্থান।[১৯]

আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনে থাকি। একসময় আমিও তা বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়িয়ে, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে, সর্বোপরি সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে অন্য দেশের অতিরঞ্জিত চিত্রগুলির বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করে সবিনয়ে স্বীকার করছি, আমার ভুল হয়েছিল।

হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয়নি। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, কত শক্তির দণ্ড হস্তান্তরিত হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করেছে। উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত বিশাল জনসমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটে চলেছে। জাতীয় জীবনস্রোত কখনও মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখনও প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হয়েছে। শত-শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সামনে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে দণ্ডায়মান। সে শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণেই তা আবার দ্বিগুণ তেজে ভাস্বর। আর তারই মাঝখানে আমার দেশ-জননী রানীর মতো পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করবার ব্রত নিয়ে মহিমময় ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর। স্বর্গ বা মর্তের কোন শক্তিরই সাধ্য নেই এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে।[২০]

হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমার বন্ধুগণ, আমার সন্তানগণ, আমাদের এই জাতীয় অর্ণবপোত বহু শতাব্দী যাবৎ লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবনসমুদ্রের অপর পারে অমৃতধামে বহন করে নিয়ে গেছে।...আজ হয়তো তোমাদের নিজের দোষেই সেই জাহাজে দু-একটা ছিদ্র হয়েছে, সেই জাহাজ হয়তো একটু খারাপও হয়ে গেছে। তাই বলে তোমরা কি এখন তার নিন্দা করবে? জগতের সমস্ত জিনিসের চেয়েও যে-জিনিস আমাদের অধিক কাজে এসেছে, এখন কি তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় জাহাজে—আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হয়ে থাকে তথাপি আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমাদেরই তো ঐ ছিদ্র বন্ধ করতে হবে। এসো সানন্দে, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমরা এই কাজ সম্পন্ন করি। আর যদি আমরা তা না পারি, এসো আমরা মরবার জন্য প্রস্তুত হই। আমরা আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে ঐ ছিদ্র বন্ধ করব; কিন্তু কখনই এর নিন্দা করব না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটাও কর্কশ কথা বোলো না। আমি একে ভালবাসি

এর অতীত মহত্ত্বের জন্য। আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি—কারণ তোমরা দেবতাদের বংশধর, মহামহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের সন্তান। কি করে আমি তোমাদের গালি দেব, অভিশাপ দেব? না, কখনই না। তোমাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ হোক।

হে আমার সন্তানগণ, আমার সমগ্র পরিকল্পনাটি আমি তোমাদের কাছে ব্যক্ত করতে এসেছি। যদি তোমরা আমার কথা শোন, আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। যদি না শোন, এমনকি আমাকে যদি ভারতভূমি থেকে পদাঘাত করে বের করে দাও, তবুও আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসব। ফিরে এসে বলবঃ আমরা সকলে ডুবতে বসেছি। সেইজন্যই আমি তোমাদের মধ্যে এসেছি। আর যদি আমাদের ডুবতেই হয়, আমরা সকলে একসঙ্গেই যেন ডুবি। কিন্তু কারও প্রতি কোন কটূক্তি কোন অভিশাপ যেন আমাদের মুখ থেকে বর্ষিত না হয়।[২১]

'হে ভারত, ভুলিও না'

হে ভারত, ভুলিও না--তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল--ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'[২২]

অবনতির কারণ

জাতীয় মহাপাপ—জনসাধারণকে অবহেলা

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তা-ই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।[১]

ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।[২]

ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপীদের সাহায্য করবার কোন বন্ধু নেই। তারা যতই চেষ্টা করুক, তাদের উঠবার উপায় নেই। তারা দিন দিন ডুবে যাচ্ছে। নিষ্ঠুর নৃশংস সমাজ তাদের উপর ক্রমাগত যে-আঘাত করছে, তার বেদনা তারা বিলক্ষণ অনুভব করছে, কিন্তু তারা জানে না—কোথা থেকে ঐ আঘাত আসছে।[৩]

ভারতের সমস্ত দুর্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য। ..পুরোহিত-শক্তি ও পরাধীনতা তাদের শত শত শতাব্দী ধরে নিষ্পেষিত করেছে, অবশেষে তারা ভুলে গেছে যে, তারাও মানুষ।[৪]

জনসাধারণকে বঞ্চনা—ইতিহাস থেকে সাক্ষ্য

শত শত শতাব্দী ধরে প্রাচীন ভারত তার প্রধান দুই জাতির—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করবার যুদ্ধক্ষেত্র ছিল।

একদিকে পুরোহিতরা সাধারণ প্রজাদের উপর রাজাদের অবৈধ সামাজিক অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই প্রজাদেরকে ক্ষত্রিয়রা তাদের 'ন্যায়সঙ্গত খাদ্য' বলে ঘোষণা করতেন। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়রাই ছিলেন ভারতবর্ষে একমাত্র শক্তিসম্পন্ন জাতি, যাঁরা পুরোহিতদের আধ্যাত্মিক অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষকে বেঁধে রাখবার নিত্যনতুন ক্রম-বর্ধমান ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিছু পরিমাণে সফল হয়েছিলেন।

উভয় জাতির এই সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল অতি প্রাচীনকালেই। সমস্ত শ্রুতির ভিতরেই তা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। সাময়িকভাবে এই বিরোধ কমে

এসেছিল, যখন ক্ষত্রিয়দের এবং জ্ঞানকাণ্ডের নেতা শ্রীকৃষ্ণ সামঞ্জস্যের পথ দেখিয়ে দিলেন। তার ফল গীতার শিক্ষা—যার মধ্যে মূর্ত ধর্ম, দর্শন ও উদারতার সারবস্তু।...

সাধারণ দরিদ্র মূর্খ প্রজার উপর প্রভুত্ব করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দুই জাতির মধ্যেই ছিল, সুতরাং বিরোধ আবার প্রবলভাবে জেগে উঠল। আমরা সেই সময়কার যে সামান্য সাহিত্য পাই, তা সেই প্রাচীন প্রবল বিরোধের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র, কিন্তু অবশেষে ক্ষত্রিয়ের জয় হল, জ্ঞানের জয় হল, স্বাধীনতার জয় হল। আর কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য রইল না। এর অধিকাংশই চিরকালের জন্য চলে গেল।

এই উত্থানের নাম বৌদ্ধ সংস্কার। এই উত্থান ধর্মের দিক দিয়ে কর্মকাণ্ড থেকে মুক্তি সূচনা করছে, আর রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের দ্বারা পুরোহিত-প্রাধান্যের বিনাশ নির্দেশ করছে।

বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যে দুই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা দুজনেই—কৃষ্ণ ও বুদ্ধ দুজনেই—ক্ষত্রিয় ছিলেন। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই দুই দেব-মানবই স্ত্রী-পুরুষ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্যই জ্ঞানের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।

অদ্ভুত নৈতিক বল সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন মত ধ্বংস করতেই বেশী আগ্রহী ছিল। এর অধিকাংশ শক্তিই কেবলমাত্র নেতিমূলক প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হওয়ায় বৌদ্ধধর্মকে তার জন্মভূমি থেকে প্রায় অবলুপ্ত হতে হল। যেটুকু অবশিষ্ট রইল, তা-ও পূর্ণ হয়ে উঠল এমন সব কুসংস্কার এবং ক্রিয়াকাণ্ডে, যা বৌদ্ধধর্ম যেসব কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড দমনে সচেষ্ট হয়েছিল, তার চেয়েও শতগুণে বীভৎস।...

এইভাবে, নরশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধদেব যে জীবন-প্রবাহকে গতিশীল করে-ছিলেন, তা-ও পূতিগন্ধময় বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হল। ভারতবর্ষকে এরপর কয়েক শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হল, যতদিন না ভগবান শঙ্করের আবির্ভাব হল; এবং তাঁর কিছু পরে পরেই এলেন রামানুজ ও মধ্বাচার্য।..

এর ফলে ভারতে আবার বেদের অভ্যুদয় হল—বেদান্তের পুনরুত্থান হল। এরকম বেদান্তের চর্চা আর কখনও হয়নি; গৃহস্থেরা পর্যন্ত আরণ্যক পাঠ করতে লাগলেন।

বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে ক্ষত্রিয়েরাই প্রকৃত নেতা ছিলেন এবং দলে দলে তাঁরাই বৌদ্ধ হয়েছিলেন। সংস্কার ও ধর্মান্তরকরণের উৎসাহে লোকপ্রচলিত ভাষাগুলির চর্চাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। এবং অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ই বৈদিক সাহিত্য এবং সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সংস্পর্শশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই দাক্ষিণাত্য থেকে (বৈদিক সাহিত্য এবং সংস্কৃত ভাষা নির্ভর) এই যে সংস্কার-তরঙ্গ উঠল, তাতে কিছু পরিমাণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদেরই শুধু উপকার হল। ভারতের অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য তা আগের চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর বন্ধনের সৃষ্টি করল।

ক্ষত্রিয়রাই চিরকাল ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ। সুতরাং তাঁরাই বিজ্ঞান এবং স্বাধীনতারও পরিপোষক। দেশকে কুসংস্কারমুক্ত করবার জন্য বারবার তাঁদের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। এবং ভারত-ইতিহাসে চিরকাল এই ক্ষত্রিয়শক্তিই পুরোহিতকুলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণকে রক্ষা করবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। যখন এই ক্ষত্রিয়দের অধিকাংশই অজ্ঞতায় নিমগ্ন হল এবং অপর অংশ মধ্য এশিয়ার বর্বর জাতিগুলির সঙ্গে রক্ত-সম্পর্ক স্থাপন করে ভারতবর্ষে পুরোহিত-প্রাধান্য স্থাপনে তরবারি প্রয়োগ করল, তখনই দেশে পাপের মাত্রা পূর্ণ হল এবং ভারতভূমি একেবারেই ডুবে গেল। ভারতবর্ষ কখনই উঠবে না—যদি না ক্ষত্রিয়শক্তি জেগে উঠে নিজেকে মুক্ত করে এবং অবশিষ্ট জাতির পায়ের বেড়ি ভাঙতে সচেষ্ট হয়।[৫]

এই জাতি ডুবছে। লক্ষ লক্ষ লোকের অভিশাপ আমাদের মাথায় রয়েছে লক্ষ লক্ষ লোক—যাদের আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলেছি, কিন্তু প্রাণপণে ঘৃণা করেছি, যাদের বিরুদ্ধে আমরা 'লোকাচারের' মতবাদ আবিষ্কার করেছি, যাদের আমরা মুখে বলেছি—সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু তা কাজে পরিণত করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি।[৬]

ধর্মের নামে সাধারণকে শোষণ

হিন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না।[৭]

সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পারো? তোমরা তাদের ছোঁও না, 'দূর দূর' কর। আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু-ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।[৮]

সর্বনাশের মূল পৌরোহিত্য

পৌরোহিত্যই ভারতের সর্বনাশের মূল। নিজের ভাইকে নীচে নামিয়ে কেউ কি নিজে অধঃপতন এড়িয়ে থাকতে পারে?...(আমাদের) পূর্বপুরুষদের আবিষ্কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য এই যে, বিশ্বজগৎ এক। কোন মানুষ নিজের কিছু-মাত্র অনিষ্ট না করে কি অন্যের অনিষ্ট করতে পারে? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অত্যাচার-সমষ্টি চক্রবৃদ্ধিহারে তাদেরই উপর ফিরে এসেছে, এই হাজার বছরের দাসত্ব ও অপমানে তারা অনিবার্য কর্মফলই ভোগ করছে।[৯]

অধঃপতনের আর এক কারণ—শিক্ষার সুযোগ স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে আবদ্ধ রাখা

ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা।[১০]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্যদেশে জাতীয়তাবোধ আছে, আর আমাদের তা নেই। অর্থাৎ শিক্ষা ও সভ্যতা এখানে (পাশ্চাত্যে) সর্বজনীন—জনসাধারণে অনুপ্রবিষ্ট। ভারতবর্ষে আর আমেরিকায় উচ্চবর্ণের মানুষের অবস্থা একই রকম, কিন্তু দুদেশের নীচুতলার মানুষের মধ্যে বিরাট

ফারাক। ইংরেজের পক্ষে ভারত জয় করা এত সহজ হয়েছিল কেন? কারণ, তারা একটি সংঘবদ্ধ জাতি ছিল, আর আমরা তা ছিলাম না। কোন মহৎ মানুষের মৃত্যু হলে, আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করতে হয় আর একজন মহৎ মানুষের জন্য; কিন্তু পাশ্চাত্যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান পূর্ণ হয়ে যায়। দেশে মহৎ মানুষের নিদারুণ সংকট দেখা দিয়েছে।...কারণ, পাশ্চাত্যে মহৎ মানুষের আবির্ভাবের ক্ষেত্র ব্যাপক, বিস্তৃত; আমাদের দেশে তা অতি সংকীর্ণ। ত্রিশ কোটি (বর্তমানে প্রায় সত্তর কোটি) অধিবাসীর দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে কৃতীপুরুষদের উদ্ভবক্ষেত্র সংকীর্ণ—তুলনায়, পাশ্চাত্যের তিন, চার কিংবা ছয় কোটি মানুষের দেশগুলিতে সেই ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। এর কারণ, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।. আমাদের জাতীয় জীবনের এটি একটি বিরাট ত্রুটি এবং এই ত্রুটি দূর করতেই হবে।[১১]

মানুষকে শেখানো হয়েছে—তারা কিছুই নয়

শত শত শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তার হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো হয়েছে, তাদেরকে শেখানো হয়েছে—তারা কিছুই নয়। সর্বত্র সাধারণ মানুষকে চিরকাল বলা হয়েছে—তোমরা মানুষ নও। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাদেরকে এইভাবে ভয় দেখানো হয়েছে: ক্রমশ তারা সত্যি সত্যিই পশুস্তরে নেমে গেছে। তাদেরকে কখনও আত্মতত্ত্ব শুনতে দেওয়া হয়নি।[১২]

অকর্মণ্যতা এবং নীচতা

নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু কিছু করিতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়—এই দোষেই আমাদের জাতের সর্বনাশ হইয়াছে। হৃদয়হীনতা উদ্যমহীনতা সকল দুঃখের কারণ। অতএব ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিবে। কার মধ্যে কি আছে, কে জানে প্রভু বিনা। সকলকে Opportunity (সুযোগ) দাও। পরে প্রভুর ইচ্ছা। সকলের উপর সমান প্রীতি বড়ই কঠিন; কিন্তু তা না হলে মুক্তি হবে না।[১৩]

অবনতির আর এক কারণ—অপর জাতির সঙ্গে না মেশা

আমার মতে আমাদের জাতীয় অবনতির মূল কারণ—অপর জাতির সঙ্গে না মেশা। সেটিই ঐ অবনতির একমাত্র কারণ। পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমরা কখনই পরস্পরের ভাব তুলনামূলকভাবে আলোচনা করবার সুযোগ পাইনি। আমরা চিরকাল কূপমন্ডূক হয়েই থেকেছি।

কোন ব্যক্তি, কোন জাতিই অপরকে ঘৃণা করলে জীবিত থাকতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কার করল ও অপর জাতির সঙ্গে সর্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সূত্রপাত হল।[১৯]

অপরকে ঘৃণা করতে থাকলে কেউই নিজে অবনত না হয়ে থাকতে পারে না।...এর অনিবার্য ফল এই হল যে, যে-জাতি প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, সেই জাতিই এখন সব জাতির মধ্যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২১]

সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব

তোমাদের জাতির মধ্যে Organization শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করতে একেবারেই নারাজ। Organization-এর প্রথম আবশ্যক...Obedience।[২২]

আমরা দুর্বল

আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হোক, অন্যান্য জাতির সঙ্গে তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিরা যতই বড় হোন, আমি তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় বলছি আমরা দুর্বল, অত্যন্ত দুর্বল। প্রথমত আমাদের শারীরিক দুর্বলতা। এই শারীরিক দুর্বলতা আমাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কাজ করতে পারি না; একসঙ্গে মিলিত হতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিন জন মিলিত হতে

পারি না; আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করে থাকি, ঈর্ষা করে থাকি।...আমরা তোতাপাখির মতো অনেক কথা বলি, কিন্তু কখনো সেগুলি করি না। মুখে বলা অথচ কাজে না করা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কি এর কারণ? শারীরিক দুর্বলতা। দুর্বল-মস্তিষ্ক কিছু করতে পারে না, আমাদের সবল-মস্তিষ্ক হতে হবে।[১৭]

মধ্যরেখার দুর্দশায় আমরা

এখন একে দারিদ্র, তার ওপর আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হয়ে যাচ্ছি। জাতীয় যে গুণগুলি ছিল, তা-ও যাচ্ছে—পাশ্চাত্যদেশেরও কিছুই পাচ্ছি না। চলা-বসা কথাবার্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারও সামর্থ্য নেই। পূজা-পাঠ প্রভৃতি যা-কিছু ছিল, তা তো আমরা বানের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি, অথচ কালের উপযোগী একটা নূতন রকমের কিছু এখনও হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, আমরা এই মধ্যরেখার দুর্দশায় এখন পড়ে।[১৮]

দ্বিতীয় মহাপাপ—নারীশক্তিকে অবহেলা

ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি জাতি' করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা।[১৯]

শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা (পাশ্চাত্যের লোকেরা) তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।[২০]

আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির (নারীজাতির) অবমাননা সেখানে বলে।[২১]

পুনরুত্থানের উপায়

কোন কিছু ভেঙো না

কিছু নষ্ট কোরো না। ধ্বংসবাদী সংস্কারকরা জগতের কোন উপকারই করতে পারে না। কোন কিছু একেবারে ভেঙো না, একেবারে ধূলিসাৎ কোরো না, বরং গঠন কর। যদি পার সাহায্য কর; যদি না পার, হাত গুটিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, এবং যেমন চলছে চলতে দাও। যদি সাহায্য করতে না পার, অনিষ্ট কোরো না।...যে যেখানে আছে, তাকে সেখান থেকে উপরে তুলবার চেষ্টা কর।...তুমি আমি কি করতে পারি? তুমি কি মনে কর, তুমি একটা শিশুকেও কিছু শেখাতে পার- পার না। শিশু নিজেই শিক্ষা লাভ করে।[২]

শক্তির উৎস : জনসাধারণ

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।[৩]

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব।[৩]

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য।[৪]

হে ভারতের শ্রমজীবী!

হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজেন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে একথা।...তোমাদের পিতৃ-পুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্য-জাতির যা কিছু উন্নতি তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।[৫]

জনসাধারণের উন্নতি চাই

আমাদের কাজের এই মূল কথাটা সবসময় মনে রেখো—ধর্মে একটুও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। মনে রাখবে—দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন।...জাতির ভাগ্য নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাদের তুলতে পার? তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করে কি তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে পার?[৬]

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই হল আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ ভালভাবে শিক্ষিত হচ্ছে, ভালভাবে খেতে

পাচ্ছে, অভিজাত লোকেরা যতদিন না তাদের ভালভাবে যত্ন নিচ্ছে ততদিন যতই রাজনৈতিক আন্দোলন করা হোক না কেন, কিছুতেই কিছু হবে না। তারা আমাদের শিক্ষার জন্য (রাজকর-হিসেবে) পয়সা দিচ্ছে, আমাদের ধর্ম-লাভের জন্য (শারীরিক পরিশ্রমে) মন্দির তৈরী করে দিচ্ছে। কিন্তু এইসবের বিনিময়ে তারা চিরকাল লাথিই খেয়ে এসেছে। তারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ক্রীতদাস হয়ে আছে। ভারতকে যদি পুনরুদ্ধার করতে হয়, আমাদের অবশ্যই তাদের জন্য কাজ করতে হবে।[৭]

আমাদের mission হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভুষোরা ভালবাসা দেখে ভিজবে।...'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে)- সকল বিষয়েই এই সত্য।. ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে।.. চাষাভুষো মৃতপ্রায়, এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক—এই মাত্র। তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক, দেখুক এবং করুক।[৮]

জনসাধারণের দুর্দশার জন্য ধর্মের কোন দোষ নেই

ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের পতিতদের কি ভাবি? তাদের কোন উপায় নেই, পালানোর কোন রাস্তা নেই, উঠবার কোন উপায় নেই। ভারতের দরিদ্র ভারতের পতিত, ভারতের পাপীদের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নেই। তারা দিন দিন ডুবে যাচ্ছে।.. চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিছুদিন থেকে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন জগতের মহত্তম এই ধর্মের বিনাশসাধনই উন্নতির একমাত্র উপায়। শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি এর রহস্য আবিষ্কার করেছি। ধর্মের কোন দোষ নেই। তোমাদের ধর্ম তো শেখাচ্ছেই জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমারই আত্মার বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই দুরবস্থার কারণ এই তত্ত্বকে কাজে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।...সমাজের এই অবস্থাকে দূর করতে হবে ধর্মকে নষ্ট করে নয়—হিন্দুধর্মের মহান

শিক্ষাকে অনুসরণ করে, এবং তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি যে বৌদ্ধধর্ম, তার অদ্ভুত সহানুভূতির ভাবকে যুক্ত করে।[৯]

উন্নতির জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা। তোমাদের পূর্বপুরুষরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তাই ধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হয়েছে। কিন্তু তাঁরা দেহকে যতরকম বন্ধনের মধ্যে ফেললেন, কাজে কাজেই সমাজের বিকাশ হল না। পাশ্চাত্যদেশে ঠিক এর বিপরীত—সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা, ধর্মে কিছু-মাত্র নেই। (এর ফলে সেখানে ধর্ম অপরিণত, কিন্তু সমাজ উন্নত।) এখন প্রাচ্য-দেশে সমাজের চরণ থেকে বন্ধন-শৃঙ্খল ভেঙে পড়ছে—প্রতীচ্যে ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হচ্ছে। .পাশ্চাত্য এতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতিও সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়ে করতে চায়, আর প্রাচ্য সামান্য সামাজিক শক্তিও আধ্যাত্মিকতার ভিতর দিয়ে লাভ করতে চায়। ..আধুনিক সংস্কারকরা প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করে সংস্কারের আর কোন উপায় দেখতে পান না। তাঁরা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিফল হয়েছেন। এর কারণ কি? কারণ, তাঁদের মধ্যে খুব অল্প-সংখ্যক লোকই তাঁদের নিজের ধর্ম ভালভাবে পড়েছেন বা আলোচনা করেছেন। আর তাঁদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রসূতি'কে বুঝবার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়ে যাননি। আমি দাবি করছি যে, হিন্দু-সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই এবং ধর্মের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তা নয়। বরং ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে যেভাবে কাজে লাগানো উচিত ছিল, তা হয়নি বলেই সমাজের এই অবস্থা। আমি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এর প্রত্যেকটি কথা প্রমাণ করতে প্রস্তুত। আমি এই শিক্ষাই দিয়ে থাকি এবং এইটি কাজে পরিণত করবার জন্য আমাদের সারা জীবন চেষ্টা করে যেতে হবে।[১০]

অতীতকে জানা চাই

অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার, অতীতের দিকে তাকাও, পেছনে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণভরে আকণ্ঠ তার জল পান কর, তারপর সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হও, এবং

ভারত প্রাচীনকালে যত উঁচু গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল, তাকে তার চেয়েও আরও উঁচু উজ্জ্বল মহৎ ও মহিমান্বিত করবার চেষ্টা কর।

আমাদের পূর্বপুরুষরা মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদের প্রথমে তা জানতে হবে। আমাদের প্রথমে জানতে হবে, আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন্ রক্ত আমাদের ধমনীতে বইছে। তারপর...আগে যা ছিল তার চেয়েও মহৎ নতুন ভারত গঠন করতে হবে।[১১]

যারা অনবরত অতীতের দিকে তাকায়, আজকাল প্রত্যেকেই তাদের নিন্দা করে থাকে। বলা হয়, এত বেশী অতীতের দিকে তাকানোই ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের মূল। আমি কিন্তু এর বিপরীতটাই সত্য বলে মনে করি। যতদিন তারা অতীতকে ভুলে ছিল, তারা যেন হতবুদ্ধি অবস্থায় ছিল। যেই তারা অতীতের দিকে তাকাতে শুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে নবজীবনের উন্মেষ দেখা যাচ্ছে। অতীতের ছাঁচেই ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে হবে। এই অতীতই ভবিষ্যতে পরিণত হবে। তাই হিন্দুরা তাদের অতীত যত বেশী পর্যালোচনা করবে, ভবিষ্যৎ ততই গৌরবময় হয়ে উঠবে; এবং যে-কেউ এই অতীত গৌরবকে মানুষের কাছে তুলে ধরবে, সে-ই দেশের পরম উপকার করবে। আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতিগুলো খারাপ ছিল বলে যে ভারতের অবনতি হয়েছে তা নয়; এই অবনতির কারণ, ঐ রীতিনীতিগুলোর যে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হওয়া উচিত ছিল, তা হতে দেওয়া হয়নি।[১২]

প্রথমেই আমাদেরকে এই কাজে মন দিতে হবেঃ আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে নিহিত অপূর্ব সত্যগুলি ঐসব গ্রন্থ থেকে, মঠ থেকে, অরণ্য থেকে, সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার থেকে মুক্ত করে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিতে হবে—যেন ঐসব শাস্ত্রনিহিত সত্য আগুনের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, হিমালয় থেকে কুমারিকা, সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সারা দেশে ছুটতে থাকে।[১৩]

চাই দেশীয় মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেইসব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছেন, তাঁদের—লোকের কাছে ideal-রূপে খাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি।...গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা

চালা, শক্তিপূজা চালা।.. এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থ-গন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।[১৫]

ধর্মে আঘাত নয়

আমাদের কাজের মূল কথাটা সব সময় মনে রেখো—ধর্মে একটুও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। মনে রাখবে—দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন।...জাতির ভাগ্য নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাদের তুলতে পার? তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করে কি তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হতে পার? এইটিই করতে হবে, এবং আমরাই তা করব।[১৬]

আমি দৃঢ়ভাবে বলছি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করবার কোন দরকার নেই। ধর্মের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তা নয়, বরং ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে যেভাবে কাজে লাগানো উচিত, তা হয়নি বলেই সমাজের এই অবস্থা।[১৭]

ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি রয়েছে ধর্মে। যতদিন পর্যন্ত হিন্দুজাতি তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মহান উত্তরাধিকার বিস্মৃত না হয়, ততদিন জগতের কোন শক্তি তাদের ধ্বংস করতে পারবে না।[১৮]

যদি রক্ত সতেজ ও পরিষ্কার থাকে, তাহলে মানুষের শরীরে কোন রোগ-জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের রক্ত। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি এই রক্ত বিশুদ্ধ থাকে, তবে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য যে-কোন ধরনের বাহ্যিক ত্রুটি—এমনকি দেশের দারিদ্র পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে।[১৯]

তোমরা যদি ধর্মকে কেন্দ্র না করে ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি না করে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে তার জায়গায় বসাও, তবে তোমরা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। এরকম যাতে না হয়, সেইজন্য তোমাদেরকে সব কাজ করতে হবে ধর্মের মধ্য দিয়ে—যা তোমাদের প্রাণশক্তি।...

এই পৃথিবীতে মানুষ যেমন নিজের নিজের পথ বেছে নেয়, প্রত্যেক জাতিও সেইরকম। আমরা শত শত যুগ আগে নিজেদের পথ বেছে নিয়েছি, এখন আমাদের সেই অনুযায়ীই চলতে হবে। আর আমাদের পছন্দ এমন

কিছু খারাপ হয়নি। জড়ের বদলে চৈতন্য, মানুষের বদলে ভগবানের চিন্তাকে কি তোমরা খুব খারাপ বলে মনে কর? পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস, ইহলোকের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, প্রবল ত্যাগশক্তি এবং ঈশ্বরে ও অবিনাশী আত্মায় দৃঢ়-বিশ্বাস তোমাদের মধ্যে রয়েছে। কই, এই ভাব ত্যাগ কর তো দেখি! পারবে না। তোমরা জড়বাদী হয়ে কিছুদিন জড়বাদের কথা বলে আমাকে ভুল বুঝাবার চেষ্টা করতে পার, কিন্তু আমি জানি, তোমাদের প্রকৃতি কি। যখনই তোমাদেরকে ধর্ম সম্বন্ধে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেব, অমনি তোমরা পরম আস্তিক হবে। স্বভাব বদলাবে কিভাবে? তোমরা যে ধর্মগতপ্রাণ।

এইজন্য ভারতে যে-কোন সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হোক, প্রথমত ধর্মের উন্নতি প্রয়োজন। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিকভাবে প্লাবিত কর।[১৯]

হিন্দু যেন কখনও তার ধর্ম ত্যাগ না করে। তবে ধর্মকে তার নির্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখতে হবে, আর সমাজকে উন্নতির স্বাধীনতা দিতে হবে। ভারতের সব সংস্কারকই এই মহা ভুল করেছেন যে, পৌরোহিত্যের সবরকম অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁরা ধর্মকেই দায়ী করেছেন এবং ধর্মের অবিনশ্বর দুর্গকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করেছেন। ফল কি হয়েছে? ব্যর্থতা! বুদ্ধ থেকে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভুল করেছিলেন যে, জাতিভেদ একটা ধর্মবিধান; সুতরাং তাঁরা ধর্ম ও জাতি দুটিকেই একসঙ্গে ভাঙতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন।[২০]

ভালই হোক, আর মন্দই হোক—হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মের আদর্শ ভারতবর্ষে বয়ে চলেছে; ভালই হোক আর মন্দই হোক—শত শত শতাব্দী ধরে ভারতের পরিবেশ ধর্মের মহান আদর্শে পূর্ণ হয়ে রয়েছে; ভালই হোক আর মন্দই হোক—ধর্মের এইসব আদর্শের মধ্যেই আমরা বড় হয়ে উঠেছি; এখন ঐ ধর্মভাব আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে—আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্ত-বিন্দুর সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে, আমাদের প্রকৃতিগত হয়ে গেছে, আমাদের জীবনী-শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার বছর ধরে যে মহানদী নিজস্ব খাত রচনা করেছে, তাকে না বুজিয়ে, মহাশক্তি প্রয়োগ না করে তোমরা কি সেই ধর্ম পরিত্যাগ করতে পার? তোমরা কি গঙ্গাকে তার উৎস হিমালয়ে ঠেলে নিয়ে গিয়ে আবার তাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে চাও? তাও যদি সম্ভব হয়, তবু

এই দেশের পক্ষে তার বিশেষত্বসূচক ধর্মজীবন ত্যাগ করে রাজনীতি অথবা অন্য কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। স্বল্পতম বাধার পথেই তোমরা কাজ করতে পার, ধর্মই ভারতের পক্ষে সেই স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।[২১]

আমি অবশ্য একথা বলছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নেই। আমি একথা বলছি না যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নেই; আমার এইটুকু বক্তব্য—আর আমার ইচ্ছা, তোমরা এটা ভুলো না যে, ঐগুলি গৌণ, ধর্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথমে চায় ধর্ম, তারপর অন্যান্য জিনিস।[২২]

ভারতে সমাজসংস্কার প্রচার করতে হলে দেখাতে হবে, সেই নতুন সামাজিক প্রথার সাহায্যে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করবার কি বিশেষ সাহায্য হবে। রাজনীতি প্রচার করতে হলেও দেখাতে হবে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা—আধ্যাত্মিক উন্নতি তার দ্বারা কত বেশী পরিমাণে সাধিত হবে।[২৩]

শুধুই কি ধর্ম? তা নয়

প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর ধর্ম।[২৪]

বর্তমান হিন্দুসমাজ তৈরী শুধু আধ্যাত্মিক মানুষদের জন্য। অন্য সবাইকেই এই সমাজ নির্দয়ভাবে মেরে ফেলে। তা হবে কেন? যারা সাংসারিক অসার বিষয় একটু আধটু ভোগ করতে চায়, তারা কোথায় যাবে? আমাদের ধর্ম যেমন উত্তম মধ্যম অধম সব রকম অধিকারীকেই গ্রহণ করে থাকে, আমাদের সমাজেরও উচিত উচ্চ-নীচ-ভাবাপন্ন সকলকে গ্রহণ করা। এর উপায়—প্রথমে আমাদেরকে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে হবে, পরে সামাজিক বিষয়ে তাকে লাগাতে হবে। ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই কাজ করতে হবে।[২৫]

আমাদের যে-সব ভাই এখনও উচ্চতম সত্যের অধিকারী হয়নি, তাদের পক্ষে হয়তো এক ধরনের জড়বাদ কল্যাণের কারণ হতে পারে—অবশ্য তাকে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করে নিতে হবে। সব দেশে সব সমাজেই একটা ভীষণ ভুল চলে আসছে, এবং বিশেষ দুঃখের ব্যাপার এই যে, ভারতবর্ষে এই ভুল আগে কখনও হয়নি, কিছুদিন যাবৎ সেখানেও এই ভুল প্রবেশ

করেছে। ভুলটি এইঃ অধিকারী-বিচার না করে সকলের জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা। বস্তুত, সকলের পথ এক নয়। তুমি যে সাধনপ্রণালী অবলম্বন করেছ, আমার সেই একই প্রণালী নাও হতে পারে।[২৬]

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তা-ই নয়—প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাতে গরীব লোকের জন্য নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়। অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন একথা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাতে হবে, গরীবদের খাওয়াতে হবে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে আর পৌরোহিত্যের পাপ দূর করতে হবে।...পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাতে না থাকে, তা করতে হবে। প্রত্যেক লোক যাতে আরও ভাল করে খেতে পায় এবং উন্নতি করবার আরও সুবিধা পায়, তা করতে হবে।.. এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনতে হবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হতে শিক্ষা দিয়ে ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়ে। প্রাচীন ধর্ম থেকে এই পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অনাচার ছেঁটে ফেল—দেখবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা বুঝতে পারছ তো? ভারতের ধর্ম নিয়ে সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করতে পার? আমার বিশ্বাস, এইটি কাজে পরিণত করা খুব সম্ভব; আর এ হবেই হবে।[২৭]

ভাবগতিক দেখে মনে হয় যে, সোস্যালিজম বা অন্য কোন ধরনের গণ-শাসন ব্যবস্থা, তার নাম যা-ই হোক না কেন, শিগ্গিরই চালু হবে। লোকে নিশ্চয়ই তাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চাইবে। তারা চাইবে—যাতে তাদের কাজ আগের চেয়ে কমে যায়, যাতে তারা ভাল খেতে পায়, এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু যদি এদেশের সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা ধর্মের উপর, মানুষের সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা যে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি?[২৮]

নারীজাগরণ চাই

মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।[২৯]

মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ —সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন্‌কালে পারবেও না।[৩০]

শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সংকুচিত হচ্ছেন।[৩১]

আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য কেবল তাদের শিক্ষা দেওয়া ও তাদের হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তোলা।...তাদের ভাল ভাল ভাব দিতে হবে। তাদের চোখ খুলে দিতে হবে যাতে তারা জানতে পারে জগতে কোথায় কি হচ্ছে; তারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই করবে। প্রতিটি জাতি, প্রতিটি নর-নারীকে নিজের উদ্ধার নিজেকেই সাধন করতে হয়। তাদের কয়েকটি উঁচু ভাব দিয়ে দাও—সেইটুকু সাহায্যই তাদের দরকার। অবশিষ্ট যা কিছু, তা এর ফল হিসেবে আপনিই আসবে। আমাদের কাজ কেবল রাসায়নিক পদার্থগুলিকে একত্র করে দেওয়া—তারপর প্রাকৃতিক নিয়মেই সেগুলি দানা বাঁধবে। আমাদের কর্তব্য তাদের মাথায় কতগুলো ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া, বাকি যা কিছু তারা নিজেরাই করে নেবে। ভারতে এই কাজটি করা বিশেষ দরকার।[৩২]

নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে এরকম সুস্থ সবল জনমত তৈরী হতে সময় লাগে—অনেক সময় লাগে। তার আগে পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং সম্পূর্ণ সমাজ-সংস্কার-সমস্যাটি এই দাঁড়ায়· সংস্কার যারা চায়, তারা কোথায়? আগে তাদের তৈরী কর। ...কয়েকটি লোক মনে করল, কোন একটা জিনিস মন্দ—সেই অনুযায়ী কিন্তু গোটা জাতিটা চলবে না। ...প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও; ...সমাজসংস্কারের জন্যও প্রথম কর্তব্য হল জনসাধারণকে শিক্ষিত করা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।[৩৩]

যে-জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে-জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।[৩৪]

আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা

জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানত শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষাবিস্তার।[৩৫]

বিদেশের সঙ্গে আদান-প্রদান চাই

আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; ভারতকে যদি আবার উঠতে হয়, তবে তাকে নিজের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়ে পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং বিনিময়ে অপরে যা কিছু দেয়, তা-ই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সম্প্রসারণই জীবন—সংকীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু। আমরা যেদিন থেকে অপর জাতিগুলোকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলাম, সেদিন থেকে আমাদের ধ্বংস আরম্ভ হল; আর যতদিন না আমরা আবার সম্প্রসারণশীল হচ্ছি, ততদিন কিছুই আমাদের বিনাশ আটকে রাখতে পারবে না। অতএব আমাদের পৃথিবীর সব জাতির সঙ্গে মিশতে হবে। আর শত শত কুসংস্কার-আবিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তির চেয়ে প্রত্যেক হিন্দু, যিনি বিদেশ ভ্রমণে যান, তিনি স্বদেশের অনেক বেশী উপকার করেন।[৩৬]

যখনই ভারতবাসীরা 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কার করল এবং অন্য জাতির সঙ্গে সব রকম সংস্রব ত্যাগ করল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সূত্রপাত হল।[৩৭]

ভারতবর্ষের দুঃখ-দুর্দশা ও পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, সে

নিজেকে সংকুচিত করেছিল, শামুকের মতো খোলার মধ্যে ঢুকে বসেছিল; আর্য-ভিন্ন অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির কাছে নিজের রত্নভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেনি। আমরা কখনও বাইরে যাইনি, অন্য জাতির সঙ্গে কখনও নিজেদের তুলনা করে দেখিনি। আমাদের পতনের একটি প্রধান কারণ এইটি। ...অতএব, আমাদের ভারতের বাইরে যেতেই হবে। জীবনের রহস্যই হচ্ছে আদান-প্রদান। আমাদের কি চিরকাল শুধু নিতেই হবে? সবকিছুই কি পাশ্চাত্যবাসীর পায়ের নীচে বসে শিখতে হবে? এমনকি ধর্মও? আমরা ওদের কাছে যন্ত্রের ব্যবহার শিখতে পারি, আরও অনেক কিছুই শিখতে পারি। কিন্তু আমাদের কাছেও পাশ্চাত্যকে শেখাবার মতো কিছু আছে। তা হল আমাদের ধর্ম—আধ্যাত্মিকতা। জগৎ অপেক্ষা করে আছে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার জন্য। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ উত্তরাধিকারসূত্রে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক চিন্তা লাভ করেছে, যাকে বহু শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ-দুর্বিপাকের মধ্যে এই জাতি সযত্নে বক্ষে ধারণ করে আছে—জগৎ সেই রত্নের জন্য তৃষ্ণাতুর হয়ে রয়েছে। তোমরা বিন্দুমাত্রও জান না, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদের জন্য ভারতবর্ষের বাইরের মানুষের মনে কতখানি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জমাট বেঁধে রয়েছে। ...অতএব আমাদের দেশের বাইরে যেতেই হবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে, তাদের দেবার মতো যা আছে, নিতেই হবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের অপূর্ব তত্ত্বগুলির বিনিময়ে আমরা শিখব জড়জগতের অদ্ভুত বিষয়গুলি। চিরকাল শিষ্য হয়ে থাকলেই চলবে না, আমাদের গুরুও হতে হবে। সমান সমান না হলে বন্ধুত্ব হয় না। যখন একজন সব সময়ই শিক্ষা দেয় এবং আরেক দল সব সময়ই তাদের পায়ের তলায় বসে শেখে—তখন দুদলের মধ্যে কখনই সমতা আসতে পারে না। যদি ইংরেজ বা মার্কিনদের সমকক্ষ হতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদের তাদের কাছে যেমন শিখতে হবে, তেমনি তাদের শেখাতেও হবে। আর এখনও বহু শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শেখাবার বিষয় তোমাদের যথেষ্ট আছে।[৩৮]

চাই ওয়েস্টার্ন সায়েন্সের সঙ্গে বেদান্ত; আর মূলমন্ত্র—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। ...(চাই) স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর সায়েন্স পড়ানো; চাই টেকনিক্যাল এডুকেশন, চাই যাতে ইন্ডাস্ট্রী বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।[৩৯]

তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম-বিশ্বাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হতে পার? [৬০]

আমরা চাই বা না চাই, পাশ্চাত্যের সংঘবদ্ধ কার্যপ্রণালী ও বাহ্য সভ্যতার ভাব আমাদের দেশে প্রবেশ করে গোটা দেশকে ছেয়ে ফেলবার উপক্রম করছে। তেমনি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন পাশ্চাত্যদেশকে প্লাবিত করবার উপক্রম করছে। কেউই এর গতিরোধ করতে পারবে না। আমরাও জড়বাদী সভ্যতার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করতে পারব না। সম্ভবত কিছু কিছু বাহ্য সভ্যতা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর, পাশ্চাত্যদেশের পক্ষে আবার সম্ভবত একটু আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন। তা হলেও উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে; আমাদের যে পাশ্চাত্যদেশ থেকে সব কিছু শিখতে হবে বা পাশ্চাত্যকে আমাদের কাছে সব কিছু শিখতে হবে তা নয়। [৬১]

ভোগের ব্যাপারে কিভাবে সফলতা লাভ করা যায়, আমরা পাশ্চাত্যজাতির কাছে সে-সম্বন্ধে কিছুটা শিখতে পারি। কিন্তু খুব সাবধানে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। খুবই দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে আজকাল আমরা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত যেসব লোক দেখি, তাদের প্রায় কারও জীবন খুব আশাপ্রদ নয়। এখন আমাদের একদিকে প্রাচীন হিন্দু-সমাজ, অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। এই দুটির মধ্যে আমি প্রাচীন হিন্দু-সমাজকেই বেছে নেব। [৬২]

...ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়, ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল - তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে? [৬২ক]

পৃথিবীর (অন্য জাতিগুলির) কাছ থেকে আমাদের কিছু শিখবার আছে

কি? সম্ভবত অন্য জাতির কাছ থেকে আমাদের কিছু বহির্বিজ্ঞান শিখতে হবে; কিভাবে সংঘ গঠন করে পরিচালনা করতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালী-বদ্ধভাবে কাজে লাগিয়ে কিভাবে অল্প চেষ্টায় ফললাভ করতে হয়, তাও শিখতে হবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হলেও দেশের লোক যতদিন না সম্পূর্ণ ত্যাগ-স্বীকারে সমর্থ হচ্ছে, ততদিন সম্ভবত পাশ্চাত্যের কাছে পূর্বোক্ত বিষয়গুলি কিছু কিছু শিখতে হবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত—ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। যদি কেউ ভারতে ভোগসুখকেই পরম-পুরুষার্থ বলে প্রচার করে, যদি কেউ জড়জগৎকেই ঈশ্বর বলে প্রচার করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। এই পবিত্র ভারতভূমিতে তার স্থান নেই—ভারতের লোক তার কথা শুনতে চায় না।[৪৩]

আমার মত কি জানেন? আমরা এইরূপে বেদান্তোক্ত ধর্মের গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্যজগতে প্রচার করে, ঐ মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে ধর্মবিষয়ে চিরদিন ওদের গুরুস্থানীয় থাকব এবং ওরা ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের গুরু থাকবে। ধর্ম জিনিসটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসী যেদিন পাশ্চাত্যের পদতলে ধর্ম শিখতে বসবে, সেই দিন এই অধঃ-পতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে। দিনরাত চিৎকার করে ওদের 'এ দেও, ও দেও' বললে কিছু হবে না। এই আদান-প্রদানরূপ কাজের দ্বারা যখন উভয়পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির একটা টান দাঁড়াবে, তখন আর চেঁচামেচি করতে হবে না। ওরা আপনা হতেই সব করবে। আমার বিশ্বাস—এই-রূপে ধর্মের চর্চায় ও বেদান্তধর্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্যদেশ উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চা এর তুলনায় আমার কাছে গৌণ উপায় বলে বোধ হয়। আমি এই বিশ্বাস কাজে পরিণত করতে জীবনক্ষয় করব। আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্যভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন তো অন্যভাবে কাজ করে যান।[৪৪]

ভারতবর্ষকে ইউরোপের কাছে শিখতে হবে বাইরের জগৎকে কি করে জয় করা যায়, আর ইউরোপকে ভারতের কাছে শিখতে হবে অন্তর্জগৎকে জয় করবার উপায়। তাহলে তখন 'হিন্দু' আর 'ইউরোপীয়' বলে আলাদা কিছু থাকবে না। থাকবে একটি আদর্শ মানবজাতি—যে বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ

উভয়কেই জয় করেছে। মানুষের মহিমার একটা দিক আমরা বিকশিত করেছি, তারা করেছে অন্য আর একটা দিক। প্রয়োজন হল দুয়ের সম্মিলন।[৪৪ক]

নতুন ভারত গড়ে উঠবে ভারতীয় ধারাতেই

সংস্কারকদের আমি বলতে চাই, আমি তাঁদের যে-কোন জনের চেয়ে বড় সংস্কারক। তাঁরা একটু-আধটু সংস্কার করতে চান, আর আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের পার্থক্য কেবল সংস্কারের পদ্ধতিতে। তাঁদের পদ্ধতি ধ্বংসের, আমার পদ্ধতি গঠনের। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসিয়ে সমাজকে 'তোমায় এদিকে চলতে হবে, ওদিকে নয়' বলে আদেশ করতে সাহস করি না। আমি কেবল সেই কাঠবেড়ালীর মতো হতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় নিজের সাধ্য মতো একমুঠো বালি বহন করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিল। ...এই অদ্ভুত জাতীয় জীবন-নদী আমাদের সামনে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কে জানে, কিংবা কে সাহস করে বলতে পারে, এ ভাল কি মন্দ, কিংবা কিভাবে একে চলতে হবে? ...জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি তাকে দাও; কিন্তু তার বিকাশ হওয়া চাই নিজের পদ্ধতিতে। কেউ তার বিকাশের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। আমাদের সমাজে দোষ যথেষ্ট আছে, কিন্তু অন্যান্য সমাজেও তা আছে। ...নিন্দা করবার কি প্রয়োজন? ...সকলেই দোষ দেখিয়ে দিতে পারে, কিন্তু যিনি সমস্যা-সমাধানের পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তিনিই মানবজাতির প্রকৃত বন্ধু। ...ভারতবর্ষে কি কখনও সংস্কারকের অভাব হয়েছিল? আপনারা কি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েছেন? রামানুজ কি ছিলেন? শঙ্করাচার্য কি ছিলেন? নানক? চৈতন্য? কবীর? দাদু? এই যে বড় বড় ধর্মপ্রচারক—যাঁরা একের পর এক ভারতবর্ষে এসেছেন অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো — তাঁরা কি ছিলেন?.. তাঁরা সকলেই চেষ্টা করেছিলেন, এবং তাঁদের কাজ এখনও চলছে। তবে তফাত এই...আধুনিক সংস্কারকদের মতো তাঁদের মুখ থেকে কখনও অভিশাপ উচ্চারিত হত না, তাঁদের মুখ থেকে কেবল আশীর্বাদ বর্ষিত হত। তাঁরা কখনও নিন্দা করতেন না। ...তাঁরা কখনই বলেননি, 'তোমরা এতদিন খারাপ ছিলে, এখন তোমাদের ভাল হতে হবে।' তাঁরা বলতেন, 'তোমরা ভালই

ছিলে, কিন্তু এখন তোমাদের আরও ভাল হতে হবে।' এই দু-ধরনের কথার ফলে বিরাট পার্থক্য হয়। আমাদেরকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করে আমাদের যে প্রণালীতে চালানোর চেষ্টা করছে, সেই অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা বৃথা। আমি অন্যান্য জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করছি না। তাদের পক্ষে সেগুলো ভাল হলেও আমাদের পক্ষে নয়। তাদের পক্ষে যা অমৃত, আমাদের পক্ষে তা বিষের মতো হতে পারে। প্রথমে এটাই বুঝতে হবে। তাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান, ঐতিহ্য এবং পদ্ধতি অনুযায়ী, আমাদের পেছনে আবার আর এক ধরনের ঐতিহ্য এবং হাজার হাজার বছরের 'কর্ম' রয়েছে। স্বভাবতই আমরা কেবল আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী আমাদের নিজস্ব খাতেই চলতে পারি, এবং আমাদেরকে সেরকমই করতে হবে।[৪৫]

চাই একদল মহান দেশপ্রেমিক

জাপানে শুনিয়াছিলাম, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙে না।...আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পরপদবিদলিত চিরবুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারীসকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।[৪৬]

দেশপ্রেমিক হও—যে-জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করেছে, সেই জাতিকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসো।[৪৭]

হে আমার ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী দেশপ্রেমিকগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে কাটাচ্ছে! তোমরা কি মনে প্রাণে বুঝছ—অজ্ঞতার কালো মেঘ

ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে? এইসব ভাবনা কি তোমাদের অস্থির করে তুলেছে? তোমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? এই চিন্তা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে?...দেশপ্রেমিক হবার এই হল প্রথম সোপান। মানলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা প্রতিকার করবার কোন উপায় বের করেছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করে কোন কার্যকর পথ বের করেছ কি? দেশবাসীকে গালি না দিয়ে তাদের যথার্থ কোন সাহায্য করতে পার কি? শুধু তা-ই নয়— তোমরা কি পর্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে কাজ করতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হাতে তোমাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তথাপি তোমরা যা সত্য বলে বুঝেছ তাই করে যেতে পার কি? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি তোমরা যা সত্য বলে বুঝেছ, তা-ই করে যেতে পার কি?...তোমাদের কি এরকম দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করতে পার।[৪৮]

দেশ গড়বার পথিকৃৎদের প্রতি

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন কর। তোমাদের উৎসাহ-অগ্নি তাদের ভিতর জ্বালিয়ে দাও। আর ক্রমশ এই সংঘ বাড়াতে থাকো। এর পরিধি বাড়তে থাকুক।[৪৯]

আমি বিশ্বাস রাখি আধুনিক যুব-সমাজের উপর। আমার কর্মীরা তাদের মধ্যে থেকেই আসবে। সিংহের মতো তেজে তারা দেশের সব সমস্যাগুলির সমাধান করবে।[৫০]

হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ, আর কিছুতেই আবশ্যক নেই, আবশ্যক শুধু প্রেম সরলতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ বিস্তার; বিস্তার আর প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন, প্রেমই জীবনের একমাত্র গতিনিয়ামক। স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকতেও তা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। দেহের অবসান হলে কিছুই থাকে না, একথাও যদি কেউ

বলে, তবুও তাকে স্বীকার করতে হবে যে, এই স্বার্থপরতাই মৃত্যু। পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বই জন নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য, কারণ হে যুবকবৃন্দ, যার হৃদয়ে প্রেম নেই, সে মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও নিপীড়িত মানুষের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হোক, মস্তিষ্ক ঘুরতে থাকুক, তোমাদের পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হোক। তখন গিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁর কাছ থেকে শক্তি ও সাহায্য আসবে—অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসবে। গত দশ বছর ধরে আমার মূল-মন্ত্র ছিল- এগিয়ে যাও ; এখনও বলছি এগিয়ে যাও ; যখন চতুর্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখতে পাইনি, তখনও বলেছি--এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছে, এখনও বলছি—এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পেওনা। উপরে তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চেয়ে মনে কোরো না তা তোমাকে পিষে ফেলবে। অপেক্ষা কর, দেখবে—অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখবে, সবকিছুই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধা-বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে।[১৯]

গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রেখো না। তাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নেই—তারা একরকম মৃতকল্প বললেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর—যারা পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী। ভগবানে বিশ্বাস রাখো। কোন চালাকির প্রয়োজন নেই; চালাকির দ্বারা কিছুই হয় না। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসবেই আসবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার ও মাথায় এই চিন্তা নিয়ে বেড়িয়েছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দোরে দোরে ঘুরেছি তারা আমাকে জুয়াচোর ভেবেছে শুধু। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করতে করতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করে এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছি। আর আমার দেশবাসীই যখন আমায় জুয়াচোর ভাবে তখন আমেরিকানরা এক অপরিচিত বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থভিক্ষা করতে দেখলে কত কি-ই না ভাববে ? কিন্তু ভগবান অনন্ত শক্তিমান ; আমি জানি তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি, কিন্তু আমি তোমাদের কাছে

এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি এই প্রাণপণ চেষ্টা —দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে— যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপদের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করতে সঙ্কুচিত হননি, যিনি তাঁর বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন , যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর; তাঁর কাছে এক মহাবলি প্রদান কর। বলি—অর্থাৎ জীবন-বলি। জীবন-বলি তাদের জন্য যাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, যাদের তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন , সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য জীবন-বলি। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি (বর্তমানে প্রায় সত্তর কোটি) ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যারা দিন দিন ডুবছে।...

আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিদের ও তাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলিও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পেছনে তাকিও না। কে পড়ল দেখতে যেও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইভাবেই আমরা অগ্রসর হব—একজন পড়বে, আর একজন তার স্থান দখল করবে।[৩২]

মূল রহস্য ত্যাগ ও সেবা

আমাদের পদ্ধতিটি খুব সহজেই বর্ণনা করা যায়। তা আর কিছুই নয়— জাতির জীবনাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করলেন, ভারতবর্ষ কান পেতে তা শুনল এবং ছয় শতাব্দীর মধ্যেই সে তার গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করল। এই হল গিয়ে রহস্য। ত্যাগ এবং সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুটি বিষয়ে তাকে উন্নত কর, তাহলে অবশিষ্ট যা কিছু আপনা আপনিই হবে।[৩৩]

চাই শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস

আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকার নিজের উপর বিশ্বাসী হওয়া। এমন কি—ভগবানে বিশ্বাস করবারও আগে সবাইকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। দুঃখের বিষয় আমরা ভারতবাসীরা প্রতিদিন এই আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছি। সংস্কারকদের বিরুদ্ধে সেখানেই আমার আপত্তি।[৫৪]

আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ থেকে এই শ্রদ্ধা প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে। সেইজন্যই আমাদের এই বর্তমান দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য নিয়ে, আর কিছুতেই নয়। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেউ বড় হয়, কেউ ছোট হয়। আমার গুরুদেব বলতেন, যে নিজেকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বলই হবে—এ অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্যজাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করেছে, তা এই শ্রদ্ধার ফলে ; তারা শারীরিক শক্তিতে বিশ্বাসী। তোমরা যদি আত্মাতে বিশ্বাসী হও, তাহলে তার ফল আরও অদ্ভুত হবে।[৫৫]

চাই আরও কিছু

চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা ; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।[৫৬]

বড় হতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির তিনটি জিনিসের দরকার :

(১) সাধুতার শক্তিতে গভীর বিশ্বাস।

(২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব।

(৩) যারা ভাল হতে কিংবা ভাল কাজ করতে চেষ্টা করছে, তাদের সাহায্য করা।[৫৭]

সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ভাবটা আমাদের চরিত্রে একেবারে নেই, এটা যাতে আসে—তার চেষ্টা করতে হবে। এটা করবার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সব সময় তোমার ভাইয়ের মতে মত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সব সময়ই যাতে

মিলে-মিশে শান্তভাবে কাজ হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। এই হল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার গুপ্ত রহস্য।[৩৮]

ইংরেজদের কাছ থেকে—আজ্ঞামাত্র নেতার আদেশ-পালন, ঈর্ষাহীনতা, অদম্য অধ্যবসায় ও নিজেতে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখা আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার। কাউকে নেতা বলে স্বীকার করলে একজন ইংরেজ তাকে সব অবস্থায় মেনে চলবে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞাধীন হবে। ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম তামিল করবার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা। আমাদের ঈর্ষার অন্ত নেই ..। যতদিন না এই ঈর্ষা-দ্বেষ দূর হয়....ততদিন একটা সমাজ-সংহতি হতেই পারে না, ততদিন আমরা এই রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকব, কিছুই করতে পারব না।[৩৯]

আমি আশা করি, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একদিকে যেমন উদার ভাব—হৃদয়ের প্রসারতা আসবে, অপরদিকে তেমনি দৃঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকবে;... আমি চাই গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু ও তার সঙ্গে জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রের মতো গভীর অথচ আকাশের মতো প্রশস্ত হওয়া চাই। আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নতিশীল জাতির মতো উন্নত হতে হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমানকালের সঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে।[৪০]

শূদ্র-জাগরণ হবেই

মানবসমাজ পরপর চারটে বর্ণের দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রতিটির শাসনকালেই রাষ্ট্রে দোষ-গুণ দুই-ই বর্তমান থাকে। পুরোহিত-শাসনে, বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সঙ্কীর্ণতা রাজত্ব করে। তাঁদের ও তাঁদের বংশধরদের অধিকার-রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকে। তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শেখবার অধিকার কারও নেই, বিদ্যাদানেরও না। এ-যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ-সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতরা মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ ; কিন্তু ক্ষত্রিয়রা এতটা

অনুদার নন। এ-যুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির (culture) চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্য-শাসন যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ। এ-যুগের সুবিধা এই যে, ব্যবসায়ীরা সর্বত্র যাতায়াত করে বলে আগের দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চারদিকে বিস্তৃতি লাভ করে। বৈশ্যযুগ ক্ষত্রিয়যুগের চেয়েও উদার—কিন্তু এই সময় কৃষ্টির অবনতি শুরু হয়।

সবশেষে শূদ্র-শাসন-যুগের আবির্ভাব হবে। এ-যুগের সুবিধা হবে—এ-সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে। কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি হবে। সাধারণ শিক্ষার খুব প্রসার হবে; কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা ক্রমশই কমে আসবে।...

তবুও প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ রোধ করতে পারবে না।[৬১]

এমন সময় আসবে, যখন শূদ্ররা তাদের শূদ্রসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো সঙ্গে নিয়েই *প্রাধান্যলাভ করবে। অর্থাৎ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ত করে* শূদ্রজাতি যেমন প্রধান হয়ে উঠছে সেরকম নয়...শূদ্র-প্রকৃতি এবং আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে সবদেশের শূদ্ররাই সমাজে একাধিপত্য লাভ করবে। তারই পূর্বাভাস পাশ্চাত্যজগতে ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে এবং সকলেই তার ফলাফল ভেবে আকুল। সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নিহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।[৬২]

হ্যাঁ, পৃথিবীর শূদ্রদের অভ্যুত্থান ঘটবে। সামাজিক গতিশীলতার নির্দেশই এই, সেই হল শিবম্। নতুন পৃথিবী গঠনের জন্য সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে নবজাগরণ ঘটবে, আজ দিবালোকের মতো তা স্পষ্ট। চেয়ে দেখ, চীনের ভবিষ্যৎ মহান অভ্যুত্থান এবং তার অনুসরণে সমগ্র এশিয়ার দেশসমূহের জাগরণ।...

তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, আমি আবরণের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া প্রত্যক্ষ করছি। ভগবানের আশীর্বাদে এই অন্তর্দৃষ্টি আমি অর্জন করেছি। অধ্যয়ন কর এবং ভ্রমণ কর, তাই হল সাধনা। দূরবীক্ষণের সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্‌রা যেমন নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, তদনু-

রূপ পৃথিবীর ঘটনাবলীর গতিও আমার দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে। তোমরা আমার থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে যাও, শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তার পরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই ভারত।[৬০]

যদি এমন একটা রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের কৃষ্টি, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সব-গুলোই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলো থাকবে না, তাহলে তা একটা আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু একি সম্ভব?...

আর সব কটা প্রথাই (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শাসন) জগতে চলেছে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্তত আর কিছুর জন্য না হলেও অভি-নবত্বের দিক থেকে এটিরও, শূদ্র-শাসনেরও, একবার পরীক্ষা হোক না কেন। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখ-দুঃখটা যাতে পালা করে সবার মধ্যে ভাগ হতে পারে, সেটাই ভাল। জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে; তবে নতুন শাসন-পদ্ধতিতে এই জোয়ালটা (yoke) এক কাঁধ থেকে উঠে আর এক কাঁধে পড়বে, এই পর্যন্ত।[৬১]

নতুন ভারত

নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।[৬২]

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

ভারত কি মরে যাবে? তাহলে জগৎ থেকে সমস্ত আধ্যাত্মিকতা দূর হয়ে যাবে; সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত হবে, ধর্মের প্রতি সমস্ত মধুর সহানুভূতির ভাব চলে যাবে; সব রকম আদর্শবোধ নষ্ট হয়ে যাবে। তার জায়গায় দেবদেবীরূপে যৌথ রাজত্ব চালাবে কাম এবং বিলাসিতা; সে-পূজার পুরোহিত হবে অর্থ; প্রতারণা পাশবিক বল এবং প্রতিযোগিতা হবে পূজা-পদ্ধতি; আর মানবাত্মা হবে সে-পূজার বলি। এ কখনই হতে পারে না। সহিষ্ণুতার শক্তি কর্মশক্তির চেয়ে লক্ষগুণে বড়, প্রেমের শক্তি ঘৃণার শক্তির চেয়ে অনন্তগুণে বেশী।[৬৬]

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। মহাদুঃখ অবসানপ্রায়। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব জাগ্রতপ্রায়। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘন অন্ধকার ভেদ করতে ব্যর্থ, সেখান থেকে ভেসে আসছে এক অপূর্ব বাণী। জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের অনন্ত হিমালয় আমাদের যে মাতৃভূমি, সেই ভারত-বর্ষের প্রতিটি শৃঙ্গে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করে আনছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন সেই বাণী স্পষ্টতর গভীরতর হয়ে উঠছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুর স্পর্শে মৃতদেহের শিথিল অস্থিমাংসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার হচ্ছে—সমস্ত জড়তা দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। যে অন্ধ সে-ই শুধু দেখতে পাচ্ছে না, যে বিকৃতমস্তিষ্ক কেবল সে-ই বুঝতে পারছে না—আমাদের মাতৃভূমি জাগছেন, গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করে আমাদের মাতৃভূমি জেগে উঠছেন। আর কেউ-ই তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আর কখনই ইনি নিদ্রিত হবেন না। কোন বহিঃশক্তিই আর এঁকে দমন করে রাখতে পারবে না।[৬৭]

প্রাচীনকালে ঢের ভাল জিনিস ছিল, খারাপ জিনিসও ছিল। ভালগুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত—Future India Ancient India-র অপেক্ষা অনেক বড় হবে।[৬৮]

আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত।[৬৯]

ভারত আবার উঠবে, জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে। বিনাশের

বিজয়পতাকা নিয়ে নয়; শান্তি ও প্রেমের পতাকা নিয়ে—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। ...আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই দেশজননী আবার জেগে উঠেছেন। নবজীবন লাভ করে আগের চেয়েও অনেক বেশী গৌরবময় মূর্তিতে তিনি তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট। শান্তি এবং আশীর্বাণীর সঙ্গে তাঁর নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।[৭০]

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি আবির্ভূত হয়েছে; আমরাও চিরকাল দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের কাহিনী ভারতের মহান সম্রাট অশোক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার ভারতকে পৃথিবী জয় করতে হবে। এই আমার সারা জীবনের স্বপ্ন...। আমাদের সামনে এ-ই মহান আদর্শ রাখা আছে। আমাদের প্রত্যেককেই এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ভারতের দ্বারা সমগ্র জগৎ বিজয়—এর কম কিছুতেই নয়। আর আমাদের সকলকে এজন্য প্রস্তুত হতে হবে, জীবন পণ করতে হবে।...

ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দিয়ে জগৎ জয় কর। এই দেশেই একথা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিলঃ ঘৃণার দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারা তাকে জয় করতে হয়। আমাদেরকে সেটাই করতে হবে। জড়বাদ এবং তার আনুষঙ্গিক দুঃখগুলিকে জড়বাদের সাহায্যে জয় করা যায় না। যখন একদল সৈন্য অপর দলকে জয় করবার চেষ্টা করে, তখন ক্রমশ সৈন্যসংখ্যা বাড়তে থাকে এবং মানবজাতিকে তারা পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনে। আধ্যাত্মিকতার শক্তি নিশ্চয়ই প্রতীচ্য দেশগুলোকে জয় করবে। ধীরে ধীরে তারা উপলব্ধি করছে, জাতি-হিসেবে যদি বাঁচতে হয়, তবে তাদের আধ্যাত্মিকতার একান্ত প্রয়োজন। তারা আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্য অপেক্ষা করছে, উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কোথা থেকে আসবে সেই আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ? কোথায় আছে সেইসব মানুষ, যারা ভারতের মহান ঋষিদের চিন্তারাশি পৃথিবীর প্রতিটি দেশে বহন করে নিয়ে যেতে প্রস্তুত? কোথায় সেইসব মানুষ, এই মহান বাণী পৃথিবীর প্রতিটি গৃহ-কোণে পৌঁছে দেবার জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত? সত্যের প্রচারের জন্য, বেদান্তের সত্যগুলিকে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য এই রকম বীর-কর্মীরই প্রয়োজন। জগৎ উন্মুখ হয়ে আছে এইজন্য। আধ্যাত্মিকতার আদর্শ না পেলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সমগ্র পাশ্চাত্যজগৎ

যেন একটা আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে, কালই তা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। তারা পৃথিবীর সর্বত্র অন্বেষণ করে দেখেছে, কোথাও শান্তি পায়নি। সুখের পেয়ালা প্রাণ ভরে পান করেছে, কিন্তু তৃপ্তি পায়নি। এখন সময় এসেছে এমন চেষ্টা করার, যাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবরাশি পাশ্চাত্যের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারে। ...আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা জগৎ জয় করতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতেই হবে; নচেৎ মৃত্যু।[৭১]

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।[৭২]

শিক্ষা

মানুষের নিজের ভেতরেই পূর্ণজ্ঞান

আমরা যে বলি মানুষ 'জানে', ঠিক; মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে মানুষ 'আবিষ্কার করে' (discovers) বা 'আবরণ উন্মোচন করে' (unveils)। মানুষ যা 'শিক্ষা করে', প্রকৃতপক্ষে সে তা 'আবিষ্কার করে'। 'Discover' শব্দটির অর্থ—অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজের যে-আত্মা তার উপর থেকে আবরণ সরিয়ে নেওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন। তা কি এক কোণে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল? না, সেটা তাঁর নিজের মনেই ছিল। সময় এল, অমনি তিনি তা দেখতে পেলেন। মানুষ যতরকম জ্ঞান লাভ করেছে, সবই মন থেকে। জগতের অনন্ত গ্রন্থাগার তোমারই মনে। বহির্জগৎ কেবল তোমার নিজের মনকে অধ্যয়ন করবার উত্তেজক কারণ—উপলক্ষ মাত্র, তোমার নিজের মনই সর্বদা তোমার অধ্যয়নের বিষয়। আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দীপক-কারণ হল, তখন তিনি নিজের মন অধ্যয়ন করতে লাগলেন। তাঁর মনের ভিতর আগে থেকে যে-ভাবপরম্পরা ছিল তিনি সেগুলি আর একভাবে সাজিয়ে সেগুলির ভিতর একটা নতুন শৃঙ্খলা আবিষ্কার করলেন; তাকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি। তা আপেলে অথবা পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন কিছুতে ছিল না। অতএব লৌকিক বা পারমার্থিক সমস্ত জ্ঞানই মানুষের মনে; অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি আবিষ্কৃত (বা অনাবৃত) হয় না, আবৃতই থাকে। যখন এই আবরণ ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন আমরা বলি, 'আমরা শিক্ষা করছি', এবং এই আবরণ অপসারণের কাজ যতই এগিয়ে চলে, জ্ঞানও ততই অগ্রসর হতে থাকে। এই আবরণ যাঁর ক্রমশ উঠে যাচ্ছে, তিনি তুলনামূলকভাবে জ্ঞানী; যার আবরণ খুব বেশী, সে অজ্ঞান; আর যাঁর ভিতর থেকে অজ্ঞান একেবারে চলে গিয়েছে, তিনি সর্বজ্ঞ। আগে অনেক সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন;

আমার বিশ্বাস এযুগেও অনেক হবেন, আর আগামী প্রজন্মগুলিতে অসংখ্য সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাবেন।[২]

শিক্ষা বলতে কি বোঝায়

মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই আছে, তারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা।...সুতরাং উপদেষ্টার কর্তব্য কেবল পথ থেকে বাধাবিঘ্নগুলো সরিয়ে দেওয়া।[৩]

প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের আসেনি।.. আমি কখনও কোন কিছুর সংজ্ঞা নির্দেশ করি না। তথাপি এইভাবে (শিক্ষার সংজ্ঞা) বর্ণনা করা যেতে পারে যে, শিক্ষা বলতে কতগুলো শব্দ শেখা নয়; আমাদের বৃত্তি-গুলির শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যেতে পারে; অথবা বলা যেতে পারে—শিক্ষা বলতে ব্যক্তিকে এমনভাবে তৈরী করা, যাতে তার ইচ্ছা সংবিষয়ের দিকে যায় এবং সফল হয়।[৩]

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের গাড়ীর ইঞ্জিন—তাহারাও জড়, চলে-ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণুটি রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটি চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না, কীটটি নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্বোচ্চ। বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া?—না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন?—তাও নয়। যে-শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয় তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে-শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা—চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর।[৪]

মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়ে ভরে রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করে তোলা এবং তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা—এই হল শিক্ষার আদর্শ।[৫]

আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্য সংগ্রহ করা নয়। আবার যদি আমাকে নতুন করে শিক্ষালাভ করতে হত আর নিজের ইচ্ছামতো আমি যদি তা করতে পারতাম, তাহলে আমি শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না। আমি আমার মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততার ক্ষমতাকেই ক্রমশ বাড়িয়ে তুলতাম; তারপরে, ঐভাবে যে নিখুঁত যন্ত্রটি গড়ে উঠত, তার সাহায্যে খুশিমতো তথ্য সংগ্রহ করতে পারতাম। মনকে একাগ্র ও নির্লিপ্ত করবার ক্ষমতা কিভাবে বাড়ানো যায়, এই দুই শিক্ষা শিশুদের একসঙ্গেই দেওয়া উচিত।[৬]

মাথায় কতগুলো তথ্য ঢুকিয়ে দেওয়া হল, সেগুলো হজম না হয়ে চিরকাল এলোমেলো বিশৃঙ্খলভাবে সেখানে ঘুরপাক খেতে লাগল—একে শিক্ষা বলে না। বিভিন্ন চিন্তারাশিকে এমনভাবে নিজের করে নিতে হবে, যাতে আমাদের জীবন এবং চরিত্র গড়ে ওঠে, মানুষ তৈরী হয়। যদি কেউ পাঁচটা ভাব হজম করে জীবন ও চরিত্র ঐভাবে তৈরী করতে পারে, তবে যে মানুষটি একটা গোটা লাইব্রেরী মুখস্থ করে বসেছে, তার চেয়েও সে বেশী শিক্ষিত বলতে হবে। ...শিক্ষা বলতে যদি শুধু তথ্য সংগ্রহ বোঝায় তবে তো লাইব্রেরীগুলিই জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিশ্বকোষগুলিই এক একজন ঋষি।[৭]

যাতে character form (চরিত্র তৈরী) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই।[৮]

যে-বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে-শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।[৯]

শিক্ষকের কর্তব্য

শিশুদেরকে শিক্ষা দিতে হলে তাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস-সম্পন্ন হতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধার-

স্বরূপ, আর আমাদেরকে তার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগানোর চেষ্টা করতে হবে। শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় আর একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে—তারাও যাতে নিজেরা চিন্তা করতে শেখে, সেই বিষয়ে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তারা মানুষ হবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে সমর্থ হবে।[১০]

ছোট ছেলেদের 'গাধা পিটে ঘোড়া করা'-গোছ শিক্ষা দেওয়াটা তুলে দিতে হবে একেবারে।...কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। 'শেখাচ্ছি' মনে করেই শিক্ষক সব মাটি করে।.. বেদান্ত বলে—এই মানুষের ভেতরেই সব আছে। একটা ছেলের ভেতরও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলো যাতে নিজ নিজ হাত-পা নাক-কান মুখ-চোখ ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে হবে। তা হলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্তু গোড়ার কথা—ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি। কেবল শুধু তরকারি খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই।[১১]

শিক্ষকের কাজ কেবল পথ থেকে সব অন্তরায় সরিয়ে দেওয়া। আমি যেমন সবসময় বলে থাকিঃ 'অপরের অধিকারে হাত দিও না, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য, রাস্তা সাফ করে দেওয়া।[১২]

কারও বিশ্বাস নষ্ট করবার চেষ্টা কোরো না। যদি পারো তবে তাকে কিছু ভাল জিনিস দাও। যদি পারো তবে মানুষ যেখানে আছে, সেখান থেকে তাকে একটু উপরে তুলে দাও। এটাই কর—কিন্তু মানুষের যা আছে, তা নষ্ট কোরো না। কেবল তিনিই ঠিক ঠিক আচার্য নামের যোগ্য, যিনি নিজেকে এক মুহূর্তে যেন সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করতে পারেন। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য, যিনি সহজেই শিষ্যের অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন—নিজের শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে তার চোখ দিয়ে দেখতে পান, তার কান দিয়ে শুনতে পান, তার মন দিয়ে বুঝতে পারেন। এরকম আচার্যই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়। যাঁরা কেবল অপরের ভাব নষ্ট করবার চেষ্টা করেন, তাঁরা কখনই কোন উপকার করতে পারেন না।[১৩]

শিক্ষক ও ছাত্রের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা চাই

আমার বিশ্বাস, গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হয়ে থাকে। গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না এলে কোন রকম শিক্ষাই হতে পারে না। আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা ধরুন। পঞ্চাশ বছর হল ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু ফল কি দাঁড়িয়েছে? ঐগুলি একজনও মৌলিকভাব-সম্পন্ন মানুষ তৈরী করতে পারেনি। ঐগুলি শুধু পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর এখনও একটুও বিকশিত হয়নি।[১৪]

একটা জ্বলন্ত character-এর (চরিত্রের) কাছে ছেলেবেলা থেকেই থাকা চাই, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল 'মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ' পড়লে কচুও হবে না। Absolute (অখণ্ড) ব্রহ্মচর্য করাতে হবে প্রত্যেক ছেলেটাকে, তবে না শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসবে। নইলে যার শ্রদ্ধা বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না? আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগী লোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার হয়েছে। ...যতদিন ত্যাগীরা বিদ্যাদান করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল।[১৫]

শিক্ষা ও ধর্ম

আমি ধর্মকে শিক্ষার ভেতরকার সার জিনিস বলেই মনে করি।[১৬]

(শিক্ষার) গোড়ার কথা—ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি। কেবল শুধু তরকারি খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই।[১৭]

ধর্মপ্রচারের সাথে সাথেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যা কিছু প্রয়োজন তা আপনিই আসবে। কিন্তু যদি ধর্মকে বাদ দিয়ে লৌকিক জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদেরকে স্পষ্টই বলছি, ভারতে তোমাদের এই চেষ্টা বৃথা হবে—লোকের হৃদয়ে তা প্রভাব বিস্তার করবে না।[১৮]

ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি পরিকল্পনা

আমাদের একটা মন্দির তৈরী করতে হবে, কারণ হিন্দুরা সব কাজের প্রথমে

ধর্মকে নিয়ে আসে। তোমরা বলতে পারো মন্দিরে কোন্ দেবতার পুজো হবে—এই নিয়ে সব সম্প্রদায় ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু আমরা যে-মন্দির প্রতিষ্ঠা করব তা অসাম্প্রদায়িক হবে, তাতে সব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হবে। যদি কোন সম্প্রদায়ের ওঙ্কার-উপাসনায় আপত্তি থাকে, তবে তার নিজেকে 'হিন্দু' বলার কোন অধিকার নেই। যে-কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, প্রত্যেকেই নিজের সম্প্রদায়ের ভাব অনুসারে ঐ ওঙ্কারের ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু সকলের উপযোগী একটা মন্দিরের প্রয়োজন। অন্যান্য জায়গায় তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা দেব-প্রতিমা থাকতে পারে। কিন্তু এখানে আলাদা আলাদা মতের লোকদের সঙ্গে ঝগড়া কোরো না। এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হবে অথচ ঐ জায়গায় এসে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাদের নিজের নিজের মতগুলি শিক্ষা দেবার পুরো স্বাধীনতা থাকবে। খালি একটা বিষয়ে নিষেধ—অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতের পার্থক্য থাকলেও ঝগড়া করতে পারবে না। তোমার যা বলার আছে—বলে যাও, জগৎ তা শুনতে চায়। কিন্তু অপর লোক-সম্বন্ধে তোমার কি মত, তা শুনবার সময় জগতের নেই, সেটা তোমার নিজের মনের ভেতরেই থাক।

দ্বিতীয়ত এই মন্দিরের সাথে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করার জন্য একটা শিক্ষাকেন্দ্র থাকবে। এখান থেকে যেসব শিক্ষক শিক্ষিত হবে, তারা সবাইকে ধর্ম ও লৌকিক বিদ্যা শিক্ষা দেবে। আমরা এখন যেমন দরজায় দরজায় গিয়ে ধর্মপ্রচার করছি, তাদেরও সেরকম ধর্ম ও লৌকিক বিদ্যা দুটোই প্রচার করতে হবে। আর তা খুব সহজেই হতে পারে। এইসব আচার্য ও প্রচারকদের চেষ্টায় যেমন কাজ ছড়াতে থাকবে অমনি এই রকম আচার্য ও প্রচারকও বাড়তে থাকবে, ক্রমে অন্যান্য জায়গায় এই রকম মন্দির প্রতিষ্ঠা হতে থাকবে—যতদিন না আমরা সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ি। এই আমার পরিকল্পনা।[১১]

নেতিমূলক নয়—ইতিমূলক শিক্ষা

সাধারণকে কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতিবাচক ভাব) মানুষকে weak (নির্জীব) করে দেয়।

দেখছিস না, যে-সকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে, 'এটার কিছু হবে না—বোকা, গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ...Positive ideas (গঠনমূলক ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐসব বিষয় কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভালরকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত![২০]

নিউ ইয়র্কে দেখতাম, Irish colonists (আইরিশ ঔপনিবেশিকরা) আসছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নেই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irishmanকে তার স্বদেশে চারদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল 'প্যাট, তোর আর আশা নেই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন্ম শুনতে শুনতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট হিপনটাইজ (সম্মোহিত) করলে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সংকুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামামাত্র চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল—'প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।' প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি।

ঐ প্রকার আমাদের বালকদের যে-বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত negative (নেতিভাবপূর্ণ)—স্কুল-বালক কিছুই শেখে না, কেবল সব ভেঙে চুরে যায়—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে-শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে-শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের

মুখে গিয়ে প্রশ্ন করতে সাহসী করেছিল, যে-শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলছে, সে 'শ্রদ্ধা'র লোপ।...তাই আমরা বিনাশের এত নিকট।

এখন উপায়—শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বললেই যে জটাজুট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি?...এই 'জীবাত্মা'তেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা থেকে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই 'আত্মা',—তফাত কেবল প্রকাশের তারতম্য...। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত। এই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে দ্বারে দ্বারে গিয়ে। দ্বিতীয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হবে।[২১]

(এখন আমাদের চাই) গুরুগৃহে বাস। সেই পুরাকালের বন্দোবস্ত। তবে তার সঙ্গে আজকালের পাশ্চাত্যদেশের জড়বিজ্ঞানও চাই। দুটোই চাই।...চাই Western Science-এর সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়।[২২]

স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর science পড়ানো; চাই technical education, চাই যাতে industry বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।[২৩]

দুর্বলতার শিক্ষা নয়

যে-কোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নর-নারী, বালক-বালিকা যখন দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাচ্ছে, আমি তাদের এই এক প্রশ্ন করে থাকি—তোমরা কি বলবান? তোমরা কি বল পাচ্ছ? কারণ আমি জানি, একমাত্র সত্যই বল বা শক্তি দেয়। আমি জানি, সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে আমরা কিছুতেই বীর্যবান হতে পারব না, আর বীর না হলে সত্যেও যাওয়া যাবে না। এইজন্যেই যে-কোন মত, যে-কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্ককে দুর্বল করে ফেলে, মানুষকে কুসংস্কার-আবিষ্ট করে তোলে, যাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়, যা সর্বদাই মানুষকে সবরকম বিকৃতমস্তিষ্ক-প্রসূত অসম্ভব, আজগুবি ও

কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়—আমি সেই প্রণালীগুলো পছন্দ করি না, কারণ মানুষের উপর তাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি নিতান্ত নিষ্ফল।[২৪]

আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা

জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানত শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার।...(যাতে) ঐ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হতে পারে, বিবাহের দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক না থাকে, এবং এই-ভাবে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।[২৫]

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি

(আজকালকার শিক্ষাপ্রণালীতে) প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরানি-গড়া কল বইতো নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা বিশ্বাস বর্জিত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে; বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছু আছে, তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে, নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক—তিন পুরুষের নামও জানে না।... যাদের দেশের ইতিহাস নেই তাদের কিছুই নেই। তুই মনে কর্ না, যার 'আমি এত বড় বংশের ছেলে' বলে একটা বিশ্বাস ও গর্ব থাকে সে কি কখন মন্দ হতে পারে? কেমন করে হবে বল্ না? তার সেই বিশ্বাসটা তাকে এমন রাশ টেনে রাখবে যে, সে মরে গেলেও একটা মন্দ কাজ করতে পারবে না। তেমনি একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতটাকে টেনে রাখে, নীচু হতে দেয় না।...এক-দিক দিয়ে দেখলে তোদের বড়লাটের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। High education তুলে দিচ্ছে বলে দেশটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। বাপ! কি পাসের ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন কি?—না, নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন high education থাকলেই

বা কি, আর গেলেই বা কি? তার চেয়ে একটু technical education পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে পারবে; চাকরি চাকরি করে আর চেঁচাবে না।[২৬]

তোমরা এখন যে-শিক্ষালাভ করছ, তার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু এর আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে, গুণের ভাব তাতে ডুবে যায়। প্রথমত ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নেতিবাচক। নেতিবাচক শিক্ষা অথবা অন্য যে-কোন শিক্ষা যা 'না'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত, তা মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ। শিশু স্কুলে গেলে সে প্রথম শেখে তার বাবা একটি মূর্খ, দ্বিতীয়ত তার পিতামহ একটি পাগল, তৃতীয়ত তার প্রাচীন সব আচার্যরা ভণ্ড, আর চতুর্থত শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বছর বয়স হবার মধ্যেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। আর এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এরূপ পঞ্চাশ বছরের শিক্ষায় ভারতের তিন প্রেসিডেন্সির ভিতরে মৌলিকচিন্তাযুক্ত একটা লোকও জন্মাল না। মৌলিকভাবপূর্ণ যে-কেউ এখানে জন্মেছেন, তিনি এদেশে নয়, অন্যত্র শিক্ষালাভ করেছেন অথবা তাঁর নিজেদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবার জন্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করেছেন।[২৭]

জনসাধারণের দুরবস্থার প্রতিকার সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সংকুচিত হইতেছেন।[২৮]

শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উন্মেষ—এসব না হলে দেশের উন্নতি কি করে হবে? ...সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার জো নেই।...পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র-গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে। ...যাঁদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাঁদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়।[২৯]

গণশিক্ষা

জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নতি করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা।...

সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যারা কুঁড়ে ঘরে দিন কাটায়, তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে। হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান—প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে হয়ে তাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মে গেছে যে, ধনীর পায়ের নীচে নিষ্পেষিত হবার জন্যই তাদের জন্ম। তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।..

আমাদের কর্তব্য রাসায়নিক দ্রব্যগুলো একত্র করা—দানাবাঁধার কাজ ঈশ্বরের বিধানে আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।.. আমরা তাদের মাথায় ভাব ঢুকিয়ে দেব—বাকীটুকু তারা নিজেরাই করবে। এর অর্থ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে। কিন্তু তাতেও অসুবিধা আছে। যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয়ও খুলে দিতে পারি, তবু দেখা যাবে, গরীব-ঘরের ছেলেরা সে-সব স্কুলে পড়তে আসছে না; তারা বরং ঐ সময়টা জীবিকা-র্জনের জন্য হালচাষ করতে বের হয়ে পড়বে। আমাদের না আছে প্রচুর অর্থ—না আছে এদের শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করবার ক্ষমতা। সুতরাং সমস্যাটা নৈরাশ্য-জনক বলেই মনে হয়। কিন্তু আমি এরই মধ্যে একটা পথ বের করেছি। তা এই—যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না-ই আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। দরিদ্র মানুষ যদি শিক্ষার কাছে না পৌঁছতে পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে উৎসাহী না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাংগলের কাছে মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যেতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, কি করে তা সম্ভব হবে? নিঃস্বার্থ, সৎ ও শিক্ষিত শত শত ব্যক্তি আমি সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে পাব। এদেরকে গ্রামে গ্রামে, প্রতি দ্বারে দ্বারে শুধু ধর্মের নয়, শিক্ষার আলোকও বহন করে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিধবাদেরকে শিক্ষয়িত্রীর কাজে লাগানোর গোড়াপত্তন আমি করেছি।

কোন একটা গ্রামের অধিবাসীরা হয়তো সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরে এসে কোন একটা গাছের তলায় অথবা অন্য কোন জায়গায় জড়ো হয়ে গল্পগুজব করে সময় কাটাচ্ছে। সেই সময় জন-দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী তাদের মধ্যে গিয়ে গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে কিংবা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোকচিত্র দেখিয়ে কিছু শিক্ষা দিল। এইভাবে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিসই না শেখানো যেতে পারে...। চোখই যে জ্ঞানলাভের একমাত্র দরজা তা নয়, কানে শুনেও শেখার কাজ যথেষ্ট হতে পারে। এইভাবে তারা নতুন চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, নৈতিক শিক্ষা-লাভ করতে পারে এবং ভবিষ্যতে অপেক্ষাকৃত ভাল হবে বলে আশা করতে পারে। ঐটুকু পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য—বাকীটুকু তারা নিজেরাই করবে।[৩০]

আমাদের দেশে হাজার হাজার দৃঢ়চিত্ত, নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁরা এখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোককে ধর্ম শেখাচ্ছেন। যদি তাঁদের মধ্যে কতকগুলিকে সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যাগুলির শিক্ষকরূপে সংগঠন করা যায়, তবে তাঁরা এখন যেমন এক জায়গা হতে অন্য জায়গায়, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধর্মশিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিদ্যাও শিখাবেন। মনে করুন, এরূপ দুজন লোক একটা ক্যামেরা, একটা গোলক ও কতকগুলো ম্যাপ ইত্যাদি নিয়ে কোন গ্রামে গেলেন। এই ক্যামেরা, ম্যাপ ইত্যাদির সাহায্যে তাঁরা অজ্ঞ লোকদের জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ত্ব শিখাতে পারেন। তারপর যদি বিভিন্ন জাতির—জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পের মাধ্যমে তাদের কাছে বলা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়ে তারা যা না শিখতে পারে তার চাইতে একশগুণ বেশী এইভাবে মুখে মুখে শিখতে পারে।[৩১]

যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে। অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম।[৩২]

স্ত্রীশিক্ষা

ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন—এসব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। নভেল-নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়।...কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—এঁদের জীবনচরিত মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে।[৩৩]

শিক্ষাই বলিস, আর দীক্ষাই বলিস, ধর্মহীন হলে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে। এখন ধর্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন, ব্রহ্মচর্যব্রত-উদ্‌যাপন—এজন্য শিক্ষার দরকার। বর্তমানকালে এ পর্যন্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটাকে secondary (গৌণ) করে রাখা হয়েছে।[৩৪]

চলিত ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে-ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও-একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে-ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে-ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর?

স্বাভাবিক যে-ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে-ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃত গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক-চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,—লক্ষণ।

ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। ...যেটা ভাবহীন—সে-ভাষা, সে-শিল্প, সে-সংগীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাব-রাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।[৩১]

একজন শিক্ষক বা আচার্য কত বড় তাঁর ভাষার সবলতা থেকে তা বোঝা যায়।[৩৬]

ভাষার ব্যাপারে আমার আদর্শ আমার গুরুদেবের ভাষা—একেবারে কথ্য অথচ ভাবপ্রকাশে সম্পূর্ণ সক্ষম।[৩৭]

নারীশক্তি ও তার জাগরণ

ভারতীয় নারীর আদর্শ

হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।[১]

ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য-ক্ষমাশীলা জননী।[২]

প্রাচ্যের নারীকে প্রতীচ্যের মাপকাঠিতে বিচার করা ঠিক নয়। প্রতীচ্যে নারী হলেন স্ত্রী, আর প্রাচ্যে নারী হলেন জননী।[৩]

নারীর সারা জীবনে এই একটি চিন্তা তাঁকে তৎপর রাখে যে, তিনি মাতা। আদর্শ মাতা হতে গেলে তাঁকে খুব পবিত্র থাকতে হবে।[৪]

আমাদের দেশের মেয়েরা তেমন শিক্ষিত নয় বটে, কিন্তু তারা অনেক বেশী পবিত্র। প্রত্যেক নারীর কাছে স্বামী ছাড়া অন্য সব পুরুষই সন্তানের মতো এবং প্রত্যেক পুরুষের কাছে নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য সব নারীই মায়ের মতো মনে হওয়া উচিত। আমি যখন (পাশ্চাত্যদেশে) আমার আশেপাশে তাকাই, তোমরা (পাশ্চাত্যবাসীরা) যাকে নারীজাতির প্রতি পুরুষসুলভ সৌজন্য (gallantry) বল, তা দেখে আমার মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ মন থেকে মুছে ফেলে যতদিন না তোমরা মানবিকতার সাধারণ ভিত্তি-ভূমিতে পরস্পর মেলামেশা করতে পারছ, ততদিন তোমাদের নারীসমাজের ঠিক ঠিক উন্নতি হবে না। তারা ততদিন তোমাদের খেলার পুতুলই শুধু হয়ে থাকবে, তার বেশী নয়। এগুলোই হল বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ। তোমাদের পুরুষেরা নত হয়ে মেয়েদের অভিবাদন করে এবং বসতে চেয়ার এগিয়ে দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করে প্রশংসাবাদ। তারা বলতে থাকে, 'মহোদয়া, আপনার চোখ দুটো কি সুন্দর।' এরকম করার তাদের কি অধিকার? পুরুষ কি করে এতদূর সাহসী হতে পারে, আর তোমরা মেয়েরাই বা কি করে এসব অনুমোদন কর? এই ধরনের মনোভাব মানবিকতার অপেক্ষাকৃত নীচ দিকটাই

বাড়িয়ে তোলে। এগুলির দ্বারা মহৎ আদর্শের দিকে যাওয়া যায় না। আমরা যেন না ভাবি যে, আমরা পুরুষ বা স্ত্রী, বরং আমরা যেন ভাবি যে, আমরা মানুষ-মাত্র। জীবনকে সার্থক করার জন্য এবং পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যই আমাদের জন্ম।[৭ক]

মেয়েদের অবমাননা করার ফলে জাতির অধঃপতন

ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি জাতি' করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা।[৫]

আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।[৬]

শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে।[৭]

পুরুষ ও স্ত্রীলোকে কোন তফাত থাকা উচিত নয়

এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল্ দেখি?[৮]

আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মন্দ, সব আত্মা।[৯]

নারীজাতিকে মর্যাদা দিতে হবে

তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।[১০]

তোমরা কি মনে কর প্রতিটি নারীর অন্তরে যে দেবী রয়েছেন, তাঁকে মুহূর্তের জন্যও ছলনা করা যায়? কখনই তা হয়নি, হবেও না কখনও। সেই দেবী সব সময় নিজেকে প্রকাশ করছেন। (পুরুষ-মানুষের অন্তরের)

যে কোন ছলনা অনিবার্যভাবে তাঁর কাছে ধরা পড়ে। সত্যের গৌরব, আধ্যাত্মিকতার আলো, পবিত্রতার মহিমা—সব কিছুই সেই দেবী নির্ভুলভাবে অনুভব করেন। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতে এই পবিত্রতার একান্ত প্রয়োজন।[১১]

জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রীগুরু' গ্রহণ, সেই-জন্যই নারীভাব-সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার। সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।[১২]

ঠাকুরকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখেছি, স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাব—তা যে-জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন। দেখেছি কিনা! —তাই এত করে তোদের ঐরূপ করতে বলি এবং মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে।[১৩]

কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হল ভট্চার্য-বামুনরা ব্রাহ্মণেতর জাতকে যখন বেদ-পাঠের অনধিকারী বলে নির্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখতে পাবি মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এসব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself (ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়)।

মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন্কালে পারবেও না।

তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তি-

মূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।'

যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে-সংসারের—সে-দেশের কখন উন্নতির আশা নেই। এজন্য এদের আগে তুলতে হবে।[১৪]

মেয়েদের সমস্যার সমাধান হতে পারে শিক্ষার মাধ্যমে

(নারীদের) অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নেই, 'শিক্ষা'—এই মন্ত্রবলে যার সমাধান না হতে পারে।[১৫]

তোমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। তারপর তারাই বলবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাদের পক্ষে দরকার।[১৬]

শিক্ষা পেলে মেয়েদের problems (সমস্যাগুলো) মেয়েরা নিজেরাই solve (মীমাংসা) করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ-সময়ে তাদের মধ্যে self-defence (আত্মরক্ষা) শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ্ দেখি, ঝাঁসির রানী কেমন ছিল![১৭]

মেয়েরা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে।[১৭ক]

ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন—এ-সব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। ...সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে।[১৮]

হিন্দুর মেয়ে—সতীত্ব কি জিনিস, তা সহজেই বুঝতে পারবে; এটা তাদের heritage কিনা। প্রথমে সেই ভাবটাই বেশ করে তাদের মধ্যে উস্কে দিয়ে তাদের character form করতে হবে—যাতে তাদের বিবাহ হোক বা তারা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? ...সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাতে তাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হতে পারে, তাও শেখাতে হবে।[১৯]

স্ত্রী-শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে ধর্ম

ধর্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্যব্রত-উদ্‌যাপন—এজন্য শিক্ষার দরকার। ...নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই।[২০]

আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক, এ আমি খুবই চাই, কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়ে যদি তা করতে হয়, তবে নয়।[২১]

সীতা : ভারতীয় নারী-আদর্শের মূর্ত রূপ

সীতা ভারতীয় আদর্শের মূর্ত রূপ—যেন ভারতবর্ষই। সীতা সত্যি সত্যিই ছিলেন কিনা, সীতা-চরিত্রের ঐতিহাসিকতা কতখানি—এই প্রশ্ন বড় নয়। আমরা জানি, ঐ আদর্শটি ছিল। সীতার আদর্শ গোটা জাতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে; জাতীয় জীবনের ঠিক মর্মমূলে স্থান করে নিয়েছে; শুধু তাই নয় এই জাতির প্রতিটি রক্তকণিকার সঙ্গে ঐ আদর্শ মিশে গেছে। আর কোন পৌরাণিক কাহিনীই এরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ভারতবর্ষে যা-কিছু শুভ, শুচি এবং পবিত্র, নারীত্বের মহিমা বলতে যা-কিছু বোঝায়—'সীতা' যেন তারই নামান্তর। ভারতবর্ষে কোন নারীকে আশীর্বাদ করবার সময় বলা হয়—'সীতার মতো হও।' কোন শিশুকেও আশীর্বাদ করবার সময় বলা হয়—'সীতার মতো হও।' ভারতবাসী সীতার সন্তান। প্রতিটি ভারতবাসী চেষ্টা করে চলেছে সীতা হয়ে উঠতে। ...সীতা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ভারতীয়। তিনি কখনই আঘাতের উত্তরে আঘাত করেননি।[২২]

সীতার কথা কি বলব! তোমরা জগতের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য পড়ে শেষ করতে পার, ভবিষ্যতে জগতে যেসব সাহিত্য হবে তাও পড়ে ফেলতে পার, কিন্তু তোমাদের আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, আর একটা সীতা-চরিত্র বের করতে পারবে না। সীতা-চরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র একবারই চিত্রিত হয়েছে, আর কখনও হয়নি, হবেও না। রাম হয়তো কয়েকটি হয়েছে, কিন্তু সীতা আর হয়নি। ভারতীয় নারীদের যেমন হওয়া উচিত, সীতা তার আদর্শ;

নারীচরিত্রের যত রকম ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা-চরিত্র থেকে উদ্ভূত। হাজার হাজার বছর ধরে সমগ্র আর্যাবর্তের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকের পূজার পাত্রী হিসেবে সীতা এই দেশে বিরাজ করছেন। ...মহা-মহিমময়ী সীতা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এই পূজা পাবেন। চিরকালই তিনি আমাদের জাতীয় দেবীরূপে আরাধ্যা থাকবেন।...আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনকি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পেতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু...যতদিন ভারতে অতি অমার্জিত গ্রাম্য ভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর রক্তে সীতা বিরাজমানা। আমরা সবাই সীতার সন্তান। আমাদের নারীদের আধুনিকভাবে গড়ে তুলবার যেসব চেষ্টা হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে যদি সীতা-চরিত্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হবে। আর প্রতিদিনই আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখছি। ভারতীয় নারীদের সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ সেইটিই।[২৮]

যে-জাতি সীতা-চরিত্র সৃষ্টি করেছে—ঐ চরিত্র যদি কাল্পনিকও হয়, তথাপি স্বীকার করতে হবে, নারীজাতির উপর সেই জাতির যেমন শ্রদ্ধা, জগতে তার তুলনা নেই।[২৯]

আধুনিক নারীর আদর্শ : শ্রীমা সারদাদেবী

আমাদের মা (সারদাদেবী) আধ্যাত্মিক শক্তির একটি বিশাল আধার, যদিও বাইরে সমুদ্রের মতো প্রশান্ত। তাঁর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে এক নব-যুগের সূচনা করেছে, যে আদর্শসমূহ তিনি তাঁর জীবনচর্যায় রূপায়িত করেছেন এবং অপরকে আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, তা শুধু ভারতবর্ষের নারীর বন্ধনমুক্তির প্রচেষ্টাকেই অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত করবে না, সমগ্র পৃথিবীর নারীজাতিকে তা প্রভাবিত করে তাদের হৃদয় ও মানসলোকে অনুপ্রবিষ্ট হবে।[৩০]

মাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে (বেলুড় মঠে) যেমন ব্রহ্মচারী সাধু—সব তৈরী হবে, ওপারে মেয়েদের মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী—সব তৈরী হবে।[২৬]

মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা ইওরোপে কি দেখছি?- শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজানতে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পারো কি?...

দাদা, রাগ কোরো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। ...ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে। ...আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ করে পগার পার, এই বুঝ। দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার করে লড়াই করে টাকার যোগাড় করছি—মায়ের মঠ হবে।

বাবুরামের মার বুড়োবয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন; দাদা জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গামাকে যেদিন বসিয়ে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। যত শীঘ্র পারবে—। টাকা পাঠাতে পারলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি; তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি। গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য। দাদা, মায়ের কথা

মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।[২৭]

স্ত্রী-মঠ স্থাপনার বিষয়ে স্বামীজীর পরিকল্পনা

যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে-সংসারের সে-দেশের কখন উন্নতির আশা নেই। এজন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।...

যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ করে রেখেছে, তাঁরই জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যাদি আন্তরবিকাশে আবার মানুষকে সর্বজ্ঞ সিদ্ধসংকল্প ব্রহ্মজ্ঞ করে দিচ্ছে—সেই মাতৃরূপিণী, স্ফুরদ্বিগ্রহস্বরূপিণী মেয়েদের পূজা করতে আমি কখনই নিষেধ করিনি। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—এই মহামায়াকে পূজা প্রণতি দ্বারা প্রসন্না করতে না পারলে সাধ্য কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হন? গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে—তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা বিকাশ-কল্পে মেয়েদের মঠ করে যাব।...

এখনও ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী (সারদা-দেবী) তাঁদের central figure (কেন্দ্রস্বরূপা) হয়ে বসবেন। আর শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের ভক্তদের স্ত্রী-কন্যারা ওখানে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্যে সহায় হবে।...

জগতের কোন মহৎ কাজই sacrifice (ত্যাগ) ভিন্ন হয়নি। বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে—কালে সেটা প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন তো এইভাবে মঠ স্থাপন করব। পরে দেখবি, এক আধ generation (পুরুষ) বাদে ঐ মঠের কদর দেশের লোক বুঝতে পারবে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এ-কাজে জীবনপাত করে যাবে। তোরা ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে সহায় হ। আর এই উচ্চ ideal (আদর্শ)-

সকল লোকের সামনে ধর। দেখবি, কালে এর প্রভায় দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।...

গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকবে। আর ভক্তিমতী গেরস্তের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর থেকে স্ত্রী-মঠের কার্য-ভার চালাবে। স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকবে; তাতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি—অল্পবিস্তর ইংরেজিও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলিও শেখানো হবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা এসব তো শিক্ষার অঙ্গ থাকবেই। যারা বাড়ি ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রীরূপে এসে পড়াশুনা করতে পারবে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকতে এবং যতদিন থাকবে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্য-কল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পারবে। যোগ্যাধিকারিণী বলে বিবেচিত হলে অভিভাবকদের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে। যারা চির-কুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকা-দের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে—কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হলে তবে তো তোদের দেশে সীতা সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্যদেশ দেখে এলে বুঝতে পারতিস। মেয়েদের ঐ দুর্দশার জন্য তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের পুনরায় জাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বলছি, কাজে লেগে যা।...

(মেয়েদের) শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় করবে। বে করে সংসারী হলেও ঐরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দেবে এবং বীর পুত্রের জননী হবে। কিন্তু স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ১৫ বৎসরের পূর্বে তাদের বে দেবার নামগন্ধ করতে পারবে না—এ নিয়ম রাখতে হবে। ...এইসব বিদুষী ও কর্ম-তৎপরা মেয়েদের বরের অভাব হবে না। 'দশমে কন্যকাপ্রাপ্তিঃ'—সেসব বচনে এখন সমাজ চলছে না, চলবেও না। এখনি দেখতে পাচ্ছিসনে?[২৮]

নারীদের ব্যাপারে পুরুষদের খবরদারি চলবে না

তোমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। তারপর তারাই বলবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাদের পক্ষে দরকার।[২৯]

নারীদের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করবার অধিকার শুধু তাদের শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীদের এমন যোগ্যতা অর্জন করাতে হবে, যাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করে নিতে পারে। তাদের হয়ে অপর কেউ এ-কাজ করতে পারে না, করবার চেষ্টা করাও উচিত না। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ-যোগ্যতা লাভে সমর্থ।[৩০]

স্বাধীনতাই উন্নতির প্রধান শর্ত। এটা ভুল—মহাভুল—যদি কেউ মনে করে যে, 'আমি এই নারীর বা এই শিশুটির মুক্তির ব্যবস্থা করে দেব।' বারবার আমাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বিধবা বিবাহ এবং নারী-সমস্যা সম্বন্ধে আমার কি মত। আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলে দিতে চাইঃ আমি কি বিধবা যে এরকম অর্থহীন প্রশ্ন করছ? আমি কি মেয়ে যে তোমরা আমাকে বার-বার ধরে ঐ এক প্রশ্ন কর? মেয়েদের সমস্যা সমাধান করবার তোমরা কে? তোমরা কি ভগবান নাকি যে, প্রতিটি বিধবা এবং প্রতিটি নারীর উপরে কর্তৃত্ব করে চলবে? খবরদার! হাত সরিয়ে নাও। মেয়েদের সমস্যার সমাধান মেয়েরা নিজেরাই করবে।[৩১]

নারীকর্মীদের প্রতি

আমি পুরুষদের যা বলে থাকি, নারীদেরও ঠিক তা-ই বলব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলে লজ্জিত না হয়ে গৌরব বোধ কর, আর মনে রেখো, আমাদের অন্যান্য জাতির কাছ থেকে কিছু নিতে হবে ঠিকই, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতির চেয়ে আমাদের অপরকে দেবার জিনিস সহস্রগুণ বেশী আছে।[৩২]

এক হাজার গৌর-মার দরকার (গৌরী-মা শ্রীরামকৃষ্ণের এক স্ত্রী-ভক্ত. মেয়েদের মধ্যে অনেক কাজ করেছেন)—ঐ noble stirring spirit (মহান ও উদ্দীপনাময় ভাব)।[৩৩]

ভারতের জন্য, বিশেষত নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন।[৩৪]

মেয়ে-মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়েপুরুষের ভেদ নেই। .. হাজার হাজার পুরুষ চাই. স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নেই—ছেলেখেলার সময় নেই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাত হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। Organization (সঙ্ঘ) চাই—কুঁড়েমি দূর করে দাও. ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মতো যাও সব জায়গায়। ...তোমরা ছড়াও, ছড়াও।[৩৫]

জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য; হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন। জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে।... আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?[৩৬]

পাঁচশ পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশ নারীর দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্ভব।[৩৭]

প্রকৃত ধর্ম

ধর্মের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

ধর্ম এমন একটি ভাব—যা পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।[১]

আমাদের মনের একটি বৃত্তি বলেঃ 'এটা কর।' আর একটি বৃত্তি বাধা দিয়ে বলেঃ 'না, কোরো না।' আমাদের ভেতরে কতগুলি প্রবৃত্তি আছে, যেগুলি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করছে; আর তার পেছনে আর একটি স্বর—যতই ক্ষীণ হোক না কেন,—বলে চলেছেঃ 'যেও না, বাইরে যেও না।' এই দুটি প্রক্রিয়া সংস্কৃতে দুটি শব্দে সুন্দর বোঝানো হয়েছে—'প্রবৃত্তি' এবং 'নিবৃত্তি'। ...ঐ 'কোরো না' থেকেই ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার শুরু। যেখানে এই 'কোরো না' নেই, সেখানে ধর্মের আরম্ভই হয়নি বুঝতে হবে।[২]

প্রতিটি জীবাত্মাই স্বরূপত দৈবী স্বভাবসম্পন্ন। জীবনের লক্ষ্য বাইরের এবং ভেতরের প্রকৃতিকে বশ করে অন্তর্নিহিত এই দেবত্বকে জাগিয়ে তোলা। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—এর মধ্যে একটি, একাধিক বা সবকটির সাহায্যে ভেতরের সেই দেবত্বকে বিকশিত কর এবং মুক্ত হয়ে যাও। এই হল ধর্মের সব। মতবাদ, আচার-অনুষ্ঠান, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্যান্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।[৩]

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।[৪]

ধর্ম মানে শাস্ত্রপাঠ, তত্ত্বকথা কিংবা মতবাদ নয়; ধর্মীয় আলোচনা এমনকি ধর্ম-সম্পর্কীয় যুক্তি-বিচারও নয়। ধর্ম মানে (আদর্শস্বরূপ) 'হওয়ার চেষ্টা করা' এবং 'হয়ে যাওয়া' (It is being and becoming)...যতক্ষণ না তোমরা প্রত্যেকেই ঋষি হচ্ছ, যতদিন না প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক সত্যকে মুখোমুখি দেখছ, ততদিন তোমাদের ধর্মজীবন আরম্ভ হয়নি জানবে। যতদিন না অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বার খুলে যায়, ততদিন তোমার কাছে ধর্ম কেবল কথার কথা মাত্র, ততদিন

পর্যন্ত তুমি ধর্মলাভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছ মাত্র, ততদিন পর্যন্ত (ধর্ম সম্বন্ধে) তোমার বক্তব্য পরোক্ষ বিবরণ মাত্র।[৬ক]

ভারতে ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি—নয়তো তা ধর্ম নামেরই যোগ্য নয়। ...ভারতের আধ্যাত্মিক-আকাশ থেকে যে মহাশক্তিময়ী বাণী নিঃসৃত হয়েছে তা হল অনুভূতি, উপলব্ধি। এবং একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই বারবার ঘোষণা করেছেঃ 'ঈশ্বরকে দর্শন করতে হবে।' খুব সাহসের কথা বটে; কিন্তু গভীর-ভাবে সত্য, প্রতিটি বর্ণে সত্য। ধর্ম সাক্ষাৎ করতে হবে। কেবল শুনলে হবে না, তোতাপাখীর মতো কেবল কতগুলো কথা মুখস্থ করলেই চলবে না। কেবল বুদ্ধির সায় দিলেও চলবে না—তাতে কিছুই হয় না। ধর্ম আমাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা চাই। তাই, ঈশ্বরের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই নয় যে, আমাদের যুক্তিবিচার এরকম বলছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, প্রাচীনেরা এবং আধুনিকেরাও সেই ঈশ্বরকে দেখেছেন।[৬খ]

চরিত্রই প্রকৃত শক্তি। আধ্যাত্মিকতার অর্থ সেই চরিত্র-শক্তি অর্জন করা।[৭]

পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কর—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম।[৮]

ধর্ম মানে শুধু মতবাদ নয়, ধর্ম মানে সাধনা। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা—এই দুয়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম।[৭]

স্বার্থশূন্যতাই ভগবান। একজন সিংহাসনে বসে, সোনার প্রাসাদে বাস করেও যদি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হন—তবে তিনি ঈশ্বরের মধ্যেই রয়েছেন। আর একজন হয়তো ছেঁড়া কাপড় পরে কুটিরে বাস করছেন, জগতে তাঁর নিজস্ব কিছুই নেই—এত সব সত্ত্বেও তিনি যদি স্বার্থপর হন, তবে তিনি সংসারে ভীষণভাবে ডুবে আছেন।[৮]

স্বার্থপরতা, সবার আগেই নিজের কথা ভাবা—এ এক মহাপাপ। যে মনে করে 'আমি প্রথমে খাব', 'আমি অন্যের থেকে বেশী টাকার মালিক হব', 'আমি পৃথিবীর সব কিছুর অধীশ্বর হব'—সে স্বার্থপর। যে মনে করে 'আমি অন্যের চেয়ে আগে স্বর্গে যাব', কিংবা 'অন্যের চেয়ে আগে মুক্তিলাভ করব'—সে-ও স্বার্থপর। নিঃস্বার্থ মানুষ বলে, 'আমি সবার শেষে থাকব। আমি স্বর্গে যেতে চাই না। আমি নরকেও যেতে প্রস্তুত—যদি তার দ্বারা আমার ভাইদের কোন উপকার হয়।' এই স্বার্থশূন্যতাই হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। যার মধ্যে স্বার্থশূন্যতা যত বেশী, সে শিবের তত নিকটবর্তী।[৯]

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে—যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে—পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে—তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ'—প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ—সচ্চিদানন্দ; যেন এমন এক আগুন—যা দহন করবে না কখনও; অপূর্ব ভালবাসায় পূর্ণ—যে-ভালবাসায় মানুষের ভালবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোন দুঃখগন্ধ।[১০]

মানুষ যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাকে সাহায্য করতে না পারে, তবে ধর্মের বিশেষ কোন মূল্য নেই—তা কয়েকজন ব্যক্তির জন্য মত-বাদ হিসেবেই থেকে যাবে। ধর্মের সাহায্যে যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করতে হয়, তবে ধর্মকে এমন হতে হবে যে, মানুষ যেখানে যে-অবস্থায় আছে, সেখানেই তার সাহায্য পেতে পারে--দাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, অধঃপাতের গহ্বরে বা পবিত্রতার উচ্চ শিখরে—ধর্ম যেন সব সময় সমানভাবে মানবজাতিকে সাহায্য করতে পারে।[১১]

যা-কিছু আধ্যাত্মিক, মানসিক কিংবা শারীরিক দুর্বলতা আনে—তাকে ছুঁয়েও দেখবে না। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তার বিকাশই ধর্ম। অসীম শক্তিসম্পন্ন একটা স্প্রীং যেন মানুষের এই ছোট্ট শরীরটার মধ্যে গোটানো আছে, এবং সেই স্প্রীং ধীরে ধীরে খুলে আসছে। ...মানুষ, ধর্ম, সভ্যতা এবং তার অগ্রগতি--সব কিছুরই এই একই ইতিহাস।[১২]

বিভিন্ন ধর্মপথ

সাধারণত চার ধরনের মানুষ দেখা যায়—যুক্তিবাদী, ভাবপ্রবণ, রহস্যবাদী এবং কর্মী। এদের প্রত্যেকের জন্যই উপযুক্ত সাধনপদ্ধতি থাকা চাই। যুক্তি-বাদী বলবেনঃ আমি এ-রকম সাধনপদ্ধতি মানি না—আমাকে বিশ্লেষণ-মূলক যুক্তিসিদ্ধ কিছু বলুন, যাতে আমার মন সায় দিতে পারে। সুতরাং বিচার-

বাদীর সাধন-পথ হল দার্শনিক-বিচার। তারপর কর্মী এসে বলবেনঃ আমি দার্শনিকের সাধনপদ্ধতি মানি না। আমাকে মানুষের জন্য কিছু করতে দিন। সুতরাং তাঁর জন্য কর্মই উপাসনার পথ হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে। রহস্যবাদী এবং ভাবপ্রবণ লোকেদের জন্যও উপযুক্ত সাধন-পথ রয়েছে। এঁদের সকলের জন্যই ধর্মে তাঁদের নিজের নিজের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা রয়েছে।[১০]

সমগ্র মানবজাতির শেষ পরিণতি, সব ধর্মের লক্ষ্য ও পরিসমাপ্তি বস্তুত একই—ভগবানের সঙ্গে পুনর্মিলন, কিংবা বলা যেতে পারে, যে-দেবত্ব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সেই দেবত্বে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু লক্ষ্য এক হলেও সেখানে পৌঁছনোর পথ মানুষের রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন হতে পারে।

দেবত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্য এবং পদ্ধতি উভয়কেই 'যোগ' বলা হয়। সংস্কৃত 'যোগ' এবং ইংরেজি 'yoke' শব্দটি একই সংস্কৃত মূল (ধাতু) থেকে উৎপন্ন। অর্থ হচ্ছে—যুক্ত করে দেওয়া। 'যোগ' মানে যা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে, আমাদের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে যোগ করিয়ে দেয়। এইরকম 'যোগ' বা যুক্ত হওয়ার পদ্ধতি অনেক আছে। সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ।

প্রতিটি লোককে তার নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী বিকাশ লাভ করতে হবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন নিজস্ব পদ্ধতি আছে, তেমনি প্রত্যেক ধর্মেরও আছে। ধর্মের লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায়কে 'যোগ' বলে। বিভিন্ন 'যোগ' শিক্ষা দেওয়া হয় মানুষের বিভিন্ন স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী। সেই যোগগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত চারটি নামে ভাগ করিঃ

(১) কর্মযোগ—যে পদ্ধতিতে মানুষ কর্ম এবং কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নিজের দেবত্বকে উপলব্ধি করে।

(২) ভক্তিযোগ—ব্যক্তি-ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা এবং তার দ্বারা নিজের দেবত্বের উপলব্ধি।

(৩) রাজযোগ—মনসংযমের দ্বারা দেবত্বের উপলব্ধি।

(৪) জ্ঞানযোগ—জ্ঞানের দ্বারা দেবত্বের উপলব্ধি।

এই পথগুলি বিভিন্ন, কিন্তু একই কেন্দ্রের দিকে চলেছে। সেই কেন্দ্র ভগবান।[১০ক]

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারটি পথ। প্রত্যেকের কর্তব্য

তার উপযুক্ত পথটি অনুসরণ করে চলা। তবে এইযুগে কর্মযোগের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।[১৪]

জ্ঞানযোগ

বেদান্তের মূলকথা—একত্ব বা অখণ্ডভাব। দুই কোথাও নেই, দুইপ্রকার জীবন নেই অথবা দুটি জগৎও নেই। ...একটিমাত্র জীবন আছে, একটিমাত্র জগৎ আছে, একটিমাত্র অস্তিত্ব আছে। সবই সেই এক সত্তা। প্রভেদ শুধু পরিমাণগত, প্রকারগত নয় (in degree, and not in kind)। ...আমিও যেমন, একটি ক্ষুদ্র জীবাণুও তেমন—প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, আর সেই সর্বোচ্চ সত্তার দিক থেকে দেখলে এ প্রভেদও দেখা যায় না।[১৫]

তুমি মুক্ত এবং পূর্ণই আছ। চেষ্টা করে পূর্ণত্ব পেতে হয় না। ধর্ম, ঈশ্বর বা পরকালের এইসব ধারণা কোথা থেকে এল? মানুষ 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে বেড়ায় কেন? কেন সব জাতির মধ্যে সব সমাজেই মানুষ পূর্ণ আদর্শের সন্ধান করে—তা মানুষে, ঈশ্বরে বা অন্য যেখানেই হোক? তার কারণ—পূর্ণ আদর্শ তোমার মধ্যেই রয়েছে। এ যেন, তোমার নিজের হৃদ্‌পিণ্ডই ধুক্‌ধুক্ শব্দ করছে, আর তুমি তা জান না বলে ভুল করে ভাবছ বাইরের কোথা থেকে সেই শব্দ আসছে। তোমার ভেতরের ঈশ্বরই তোমাকে তাঁর অনুসন্ধান করতে, তাঁকে উপলব্ধি করতে প্রেরণা দিচ্ছেন। এখানে সেখানে, মন্দিরে গির্জায়, স্বর্গে মর্তে, নানা জায়গায় এবং নানাভাবে দীর্ঘ অন্বেষণের পর আমরা যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলাম, সেখানেই অর্থাৎ আমাদের আত্মাতেই বৃত্তপথে ঘুরে আসি এবং দেখতে পাই—যাঁর জন্য আমরা সারা জগৎ খুঁজে বেড়িয়েছি, যাঁর জন্য আমরা মন্দির-গির্জা প্রভৃতিতে কাতর প্রার্থনা করেছি, ব্যাকুল হয়ে অশ্রুবিসর্জন করেছি, যাঁকে এতকাল মনে করেছি সুদূর আকাশে মেঘরাশি দ্বারা আবৃত অসীম রহস্যরূপে—তিনি আমাদের নিকট থেকেও নিকটতর, প্রাণেরও প্রাণ; তিনি আমার আত্মা। আমার শরীরের, আমার জীবনের, আমার অস্তিত্বের সারসত্য তিনি। সে-ই আমার স্বরূপ। এঁকে প্রকাশ কর। তোমাকে পবিত্র হতে হবে না—পবিত্রস্বরূপ তুমি আছই। তোমাকে পূর্ণ হতে হবে না, তুমি পূর্ণস্বরূপই আছ। প্রকৃতি যেন পর্দার

আবরণে সত্যকে ঢেকে রেখেছে। যে-কোন সৎ চিন্তা বা যে-কোন সৎ কাজ তুমি করছ, তা-ই যেন এই আবরণকে একটু একটু করে ছিঁড়ে ফেলছে; এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাল থেকে সেই শুদ্ধস্বরূপ, সেই অসীম অনন্ত ঈশ্বর ক্রমশ নিজেকে প্রকাশ করছেন।[১৬]

বেদান্তের সিদ্ধান্তই এই—আমরা বদ্ধ নই, আমরা নিত্যমুক্ত। শুধু তাই নয়, আমরা বদ্ধ—একথা বলা বা ভাবাই বিপজ্জনক, ঐরকম ভাবা ভুল—নিজেকে নিজে সম্মোহিত করা মাত্র। যখনই তুমি বল—'আমি বদ্ধ', 'আমি দুর্বল', 'আমি অসহায়', তখনই তোমার দুর্ভাগ্যের আরম্ভ, তুমি নিজের পায়ে আর একটি শিকল জড়াচ্ছ শুধু। এরকম বোলো না, এরকম ভেবোও না।[১৭]

বেদান্ত বলে, দুর্বলতাই সংসারের সমস্ত দুঃখের কারণ, দুর্বলতাই দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্বল বলেই এত দুঃখভোগ করি। আমরা দুর্বল বলেই চুরি ডাকাতি মিথ্যে জুয়াচুরি বা অন্যান্য পাপ করে থাকি। দুর্বল বলেই আমরা মৃত্যুমুখে পড়ি। যেখানে আমাদের দুর্বল করবার কিছুই নেই, সেখানে মৃত্যু বা কোনরকম দুঃখ থাকতে পারে না। আমরা দুঃখবোধ করছি একটি মহাভ্রান্তির জন্য। সেই ভ্রান্তিটি ত্যাগ কর, সব দুঃখ চলে যাবে।[১৮]

উচ্চতম দার্শনিক ধারণার সঙ্গে নীতি ও নিঃস্বার্থতার সর্বোচ্চ আদর্শ পাশাপাশি যেতে পারে। আমার দেখানো উদ্দেশ্য যে, নীতিপরায়ণ হতে গেলে তোমার দার্শনিক ধারণাকে খাটো করতে হয় না, বরং নীতির ভিত্তিভূমি লাভ করতে হলে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা-সম্পন্ন হতে হবে। মানুষের জ্ঞান মানুষের কল্যাণের বিরোধী নয়। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদের রক্ষা করে থাকে; জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জ্ঞানলাভ করতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদান্তী বলেন, এই আপাত-প্রতীয়মান অশুভের কারণ অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। যে প্রেম সীমাবদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্রভাব ধারণ করে এবং অশুভ বলে মনে হয়, সেই প্রেমই আবার অন্যদিকে অসীম হয়ে ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায়। বেদান্ত এ-ও বলে যে, এই আপাতপ্রতীয়-মান সমস্ত অশুভের কারণ আমাদের ভেতরেই আছে। অতিপ্রাকৃত কোন সত্তাকে দোষ দিও না, কখনও নিরাশ বা বিষণ্ণ হয়ো না, অথবা মনে কোরো না আমরা গর্তের মধ্যে পড়ে আছি, অন্য কেউ এসে সাহায্য না করলে আমরা আর উঠতে পারব না। বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য

পাওয়া যায় ভেতর থেকে। জগতের সমস্ত দেবতার কাছে চিৎকার করে কাঁদতে পার। আমি অনেক বছর এরকম কেঁদেছি; শেষকালে দেখলাম, সাহায্য পেলাম। কিন্তু সেই সাহায্য এল ভেতর থেকে। এবং ভুলবশত আমি এতদিন যা করেছিলাম, তা সংশোধন করতে হল। এই হল একমাত্র উপায়। নিজের চারদিকে যে জাল বিস্তার করেছি, তা আমাকেই ছিঁড়ে ফেলতে হবে, আব তা করবার শক্তিও আমার ভিতরেই আছে। এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, আমার জীবনের ভাল মন্দ কোন ভাবই বৃথা যায়নি—আজকের আমি অতীতের সেই শুভ অশুভ সমস্ত কর্মেরই ফল। আমি জীবনে অনেক ভুল করেছি, কিন্তু সেগুলোর একটাও যদি বাদ পড়ত, তাহলে আমি আজ যা হয়েছি, তা হতাম না। আমি সেই ভুলগুলি করেছি বলেও সন্তুষ্ট। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তোমরা বাড়ি ফিরে গিয়েই ইচ্ছা করে নানারকম অন্যায় কাজ করতে থাক; আমার কথার ভুল অর্থ কোরো না। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, কতগুলো ভুল হয়ে গেছে বলে একেবারে বসে পড়ো না। জেনো যে, শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। এর অন্যথা হতেই পারে না। কারণ, সাধুতা আমাদের স্বভাব; পবিত্রতা আমাদের স্বভাব এবং সেই স্বভাবকে কখনই ধ্বংস করা যায় না। আমাদের স্বভাব, আমাদের যথার্থ স্বরূপ সব সময় অবিকৃতই থেকে যায়।[১৯]

বেদান্তের চিন্তা এবং 'মানুষ পাপী' ইত্যাদি চিন্তা এই দুটি ভাবই কার্যত এক, তবে একটা ভুল দিকে চলেছে। প্রচলিত মত নেতিভাবাপন্ন, বেদান্ত ইতিভাবাপন্ন। একটা মত তার দুর্বলতা দেখিয়ে দেয়, অপরটি বলে --দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাত কোরো না; আমাদের উন্নতি করতে হবে। মানুষ যখন প্রথম জন্মেছে, তখনই তার রোগ কি জানা গেছে। সকলেই জানে, নিজের কি রোগ; অপর কাউকে তা বলে দিতে হয় না। আমরা বাইরের জগতের সামনে কপট আচরণ করতে পারি, কিন্তু অন্তরের অন্তরে আমরা আমাদের দুর্বলতা জানি। বেদান্ত বলে, কেবল দুর্বলতা স্মরণ করিয়ে দিলে বিশেষ কিছু উপকার হবে না, তাকে ওষুধ দাও, মানুষকে কেবল সর্বদা রোগগ্রস্ত ভাবতে বলা রোগের ওষুধ নয়—রোগ-প্রতিকারের উপায় নয়। মানুষকে সবসময় তার দুর্বলতার বিষয় ভাবতে বলা তার দুর্বলতার প্রতিকার নয়--তার শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই প্রতিকারের উপায়। তাব মধ্যে

যে-শক্তি আগে থেকেই বিরাজিত, তার বিষয় স্মরণ করিয়ে দাও। মানুষকে পাপী না বলে বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করে বলেঃ তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধ স্বরূপ; তুমি যাকে পাপ বলো, তা তোমাতে নেই। পাপগুলি তোমার অতি নিম্নভাবের প্রকাশ; যদি পার, উচ্চতরভাবে নিজেকে প্রকাশ কর। একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা উচিত—তা এই যে, আমরা সবই পারি। কখনও 'না' বোলো না, কখনও 'পারি না' বোলো না। তা কখনও হতে পারে না, কারণ তুমি অনন্তস্বরূপ। তোমার স্বরূপের তুলনায় দেশকালও কিছুই নয়। তোমার যা ইচ্ছা তা-ই করতে পার, তুমি সর্বশক্তিমান।[২০]

দুটো শক্তি সবসময় সমান্তরালভাবে কাজ করছে। একটা 'অহং' (আমি), আর একটা—'নাহং' (আমি নই)। শুধু মানুষের ভেতর নয়, জীবজন্তুর ভেতরও এই দুই শক্তির বিকাশ দেখা যায়।—এমনকি, ক্ষুদ্রতম কীটাণুর মধ্যেও এই দুই শক্তির প্রকাশ। যে বাঘিনী রক্তের লোভে মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে-ই আবার তার শাবককে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অতি অধঃপতিত মানুষ, যে অনায়াসে তার ভ্রাতৃস্থানীয় মানুষকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে, সে-ও তার অনাহার-ক্লিষ্ট স্ত্রী অথবা সন্তানদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এইভাবে দেখলাম সৃষ্টির সর্বত্র এই দুই শক্তি পাশাপাশি কাজ করছে। যেখানেই একটি আছে, সেখানেই অপরটিও আছে। একটি স্বার্থপরতা—অন্যটি নিঃস্বার্থতা। একটি গ্রহণের, অপরটি ত্যাগের। ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই এই দুই শক্তির লীলাক্ষেত্র। এর জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই সকলের কাছেই এ পরিষ্কার। তাহলে জগতের এক সম্প্রদায়ের লোকের বলবার কি অধিকার যে, ক্রমবিকাশ (evolution) পদ্ধতি এবং জগতের সমস্ত ক্রিয়াচাঞ্চল্যের মূলে শুধুমাত্র ঐ স্বার্থ-শক্তিটি? সমস্ত কিছুই স্থাপিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংগ্রামের উপর? একথা বলবার তাদের কি অধিকার যে, জগতের সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য রাগ-দ্বেষ, বিবাদ ও প্রতিযোগিতার উপর স্থাপিত? এইসব প্রবৃত্তি যে আছে, তা অস্বীকার করি না। কিন্তু অপর শক্তিটির ক্রিয়া অস্বীকার করবার কি অধিকার তাঁদের আছে? কেউ কি অস্বীকার করতে পারে যে এই প্রেম, এই অহংশূন্যতা, এই ত্যাগই জগতে একমাত্র ইতিমূলক (positive) শক্তি? অপর শক্তিটি এই প্রেমশক্তিরই অপপ্রয়োগের ফল, এবং এইভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎপত্তি? অশুভের উৎপত্তিও

নিঃস্বার্থতা থেকে। অশুভের উৎপত্তির মূলে শুভশক্তি এবং এর পরিণামও শুভ ছাড়া আর কিছু নয়। অশুভ বলে যাকে দেখছি, তা আসলে শুভশক্তিরই ভুল পথে প্রকাশ। যে-মানুষটি আর একজনকে হত্যা করে, সে-ও হয়তো নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহের প্রেরণায় তা করে (সন্তানকে ভরণপোষণ করবে বলে)। তার প্রেম পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে উপেক্ষা করে ঐ একটি শিশু-সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। কিন্তু সীমাবদ্ধই হোক, আর অসীমই হোক—এ-ও সেই একই ভালবাসা। অতএব, যে আকারেই প্রকাশ পাক না কেন—সমগ্র জগতের প্রেরণাশক্তি, জগতের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত ও জীবন্ত শক্তি সেই অদ্ভুত ভাব, সেই প্রেম নিঃস্বার্থতা এবং ত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদান্তবাদীরা এইজন্যই একত্বের উপরে জোর দেন।[২১]

অদ্বৈতবাদ—কেবল অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করছে যে, সমস্ত নীতিতত্ত্বের সার—অন্যের কল্যাণ সাধন। কেন অন্যের কল্যাণ করব? সব ধর্মই উপদেশ দিচ্ছে—নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হব?—দেবতার নির্দেশ বলে? দেবতার কথায় আমার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রের অনুশাসন বলে? শাস্ত্রে বলুক না, আমি তা মানতে যাব কেন? আর ধর, কতকগুলো লোক ঐ শাস্ত্র বা ঈশ্বরের দোহাই শুনে নীতিপরায়ণ হল—তাতেই বা কি? জগতের অধিকাংশ লোকের নীতি—'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'; তাই বলছি—আমি যে নীতিপরায়ণ হব, তার যুক্তি কি। অদ্বৈতবাদ ছাড়া এর ব্যাখ্যা করবার উপায় নেই। গীতায় বলছেঃ সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিত-মীশ্বরম্। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্। অর্থাৎ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে সেই সমদর্শী নিজে নিজেকে হিংসা করেন না। সেইজন্য তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।

অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করে উপলব্ধি কর যে, অন্যকে হিংসা করতে গিয়ে তুমি নিজেকেই হিংসা করছ—কারণ তারা সকলেই যে তুমি! তুমি জান আর নাই জান, সমস্ত হাত দিয়ে তুমি কাজ করছ, সমস্ত পা দিয়ে তুমি চলাফেরা করছ। তুমিই রাজপ্রাসাদে রাজসুখ ভোগ করছ, আবার তুমিই রাস্তার ভিখারি হয়ে দুঃখের জীবন যাপন করছ। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এইটি জান এবং সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও। যেহেতু অন্যকে আঘাত করলে নিজেকেই আঘাত করা

হয়, সেজন্য কখনও অন্যকে আঘাত করা উচিত নয়। সেজন্যই আমি যদি না-খেয়ে মরে যাই, তাতেও আমি গ্রাহ্য করি না, কারণ আমি যখন শুকিয়ে মরছি, তখনও আমার লক্ষ লক্ষ মুখে আমিই আহার করছি। অতএব এই ক্ষুদ্র 'আমি-আমার' সম্পর্কীয় বিষয় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা উচিত নয়, কারণ সমগ্র জগৎই আমার, আমি যুগপৎ জগতের সমস্ত আনন্দ সম্ভোগ করছি। আমাকে ও জগৎকে —কে বিনাশ করতে পারে? কাজেই, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য মতবাদ নীতিপরায়ণ হবার শিক্ষা দেয়, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হব, তার কোন কারণ নির্দেশ করতে পারে না।[২২]

অদ্বৈতবাদ আমাদের এই বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান জগৎকে ত্যাগ করতে শিক্ষা দেয় না—জগৎ কি, তা-ই বুঝতে বলে। আমরা প্রকৃতপক্ষেই সেই অসীম সত্তা। আমরা সকলে এক একটি প্রণালীর (channel-এর) মতো-- যেগুলোর মধ্যে দিয়ে সেই অনন্ত সত্তা নিজেকে অভিব্যক্ত করছে। আত্মা তাঁর অসীম শক্তিকে সর্বদা আরও বেশী করে বিকশিত করতে চাইছে। তার ফলে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে চলে, তার সমষ্টিকেই আমরা ক্রমবিকাশ (evolution) নাম দিই। অসীম অনন্ত হয়ে যাবার আগে আমরা থামতে পারি না। আমাদের সমস্ত শক্তি, জ্ঞান এবং আনন্দ বিকশিত হ'য়ে অনন্ত হয়ে উঠবে। তা না হয়ে পারে না। শাশ্বত সত্তা, অনন্ত শক্তি এবং অসীম আনন্দ আমাদের মধ্যেই আছে। আমাদের ঐগুলো 'অর্জন' করতে হবে না- 'প্রকাশ' করতে হবে শুধু। এইটিই অদ্বৈতবাদের কেন্দ্রীয় ভাব।[২৩]

জীবন যে দুঃখপূর্ণ, জগৎ যে দুঃখপূর্ণ—তা জগৎকে যে বিশেষভাবে জেনেছে, সে আর অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু সব ধর্ম এর প্রতিকারের কি উপায় বলে? ধর্মগুলি বলে, জগৎ কিছুই নয়; এই জগতের বাইরে এমন কিছু আছে যা প্রকৃত সত্য। এইখানেই বিবাদ। উপায়টি যেন আমাদের যা-কিছু আছে, সবই নষ্ট করে ফেলতে উপদেশ দিচ্ছে। ...তবে কি আর কোন উপায়ই নেই? প্রতিকারের অন্তত আর একটা উপায় প্রস্তাবিত হয়েছে! বেদান্ত বলে, বিভিন্ন ধর্ম যা বলছে, সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঐকথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হবে। ...বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায় না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নেই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ 'আত্মহত্যা' নয়—নিজেকে শুকিয়ে ফেলা নয়। বেদান্তে বৈরাগ্যের

অর্থ 'জগতের ব্রহ্মভাব'—জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, একে আমরা যেমন জানি, জগৎ যেভাবে প্রতিভাত হচ্ছে, তা ত্যাগ করা এবং এর প্রকৃত স্বরূপকে জানা। জগৎকে দিব্যায়িত করা, অর্থাৎ ঈশ্বররূপে দেখা। বস্তুত জগৎ ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাচীনতম উপনিষদের একটিতে আমরা পাইঃ 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'—জগতে যা-কিছু আছে তা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করতে হবে। সমগ্র জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করতে হবে। জগতে যে দুঃখ আছে তার দিকে চোখ বুজে থেকে আমরা তা করব না, 'সবই মঙ্গলময়, সবই সুখময় বা সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য'—এরকম কোন মিথ্যে সুখবাদ (false optimism) অবলম্বন করেও আমরা তা করব না। আমরা তা করব, সত্যি সত্যিই প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই ঈশ্বরকে দর্শন করে। এইভাবে আমাদেরকে 'সংসার' ত্যাগ করতে হবে। আর যখন সংসার ত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট থাকে কি? ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই—তোমার স্ত্রী থাকুক ক্ষতি নেই, স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যেতে হবে তা নয়; কিন্তু স্ত্রীর মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর দেখতে হবে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ কর—একথার অর্থ কি? ছেলেমেয়েদের কি রাস্তায় ফেলে দিতে হবে—যেমন সব দেশেই কিছু কিছু নরপশু করে থাকে? কখনই তা নয়। এ তো পৈশাচিক কাণ্ড—ধর্ম নয়। তবে কি? সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখ। এইভাবে সব বস্তুতেই ঈশ্বরকে দেখতে শেখ। সুখে এবং দুঃখে, জীবনে এবং মরণে সমভাবে ঈশ্বর উপস্থিত। সমস্ত জগৎই ঈশ্বরে পরিপূর্ণ। কেবল চোখ মেলে তাঁকে দর্শন কর। ...চোখ মেলে দেখ যে, আমরা যে-রূপে এতদিন জগৎকে দেখছিলাম প্রকৃতপক্ষে কখনই তার অস্তিত্ব ছিল না। আমরা যেন স্বপ্ন দেখছিলাম—মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আমাদের ঐ ভুল হয়েছিল। অনন্তকাল ধরে বস্তুত সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান। তিনিই সন্তানের মধ্যে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই ভালয় এবং মন্দতেও, তিনিই পাপ এবং পাপীতে, জীবনে তিনি, মরণেও সে-ই তিনি।[২৭]

রাজযোগ

প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। সব ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য এইটিই। ...যোগী মনসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হবার

চেষ্টা করেন। যতদিন না আমরা প্রকৃতির প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি, ততদিন তো আমরা ক্রীতদাস; প্রকৃতি যেমন নির্দেশ দেয়, আমরা সেই-ভাবে চলতে বাধ্য হই। যোগী বলেন, যিনি মনকে বশীভূত করতে পারেন, তিনি জড়কেও বশীভূত করতে পারেন। অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্য প্রকৃতির চেয়ে অনেক উঁচুতে, সুতরাং তার সঙ্গে সংগ্রাম করা, তাকে জয় করা—বেশী কঠিন। এই কারণে যিনি অন্তঃপ্রকৃতি জয় করেছেন, সমস্ত জগৎ তাঁর বশীভূত, জগৎ তাঁর দাস হয়ে গেছে। প্রকৃতিকে এইভাবে বশীভূত করবার উপায় রাজযোগে উপস্থাপিত হয়েছে।[২৫]

রাজযোগ-বিজ্ঞান প্রথমত মানুষকে তার নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ করবার উপায় দেখিয়ে দেয়। মনই ঐ পর্যবেক্ষণের যন্ত্র...মনকে পর্যবেক্ষণ করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনকে পর্যবেক্ষণ করছে। আমরা জানি, মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা নিজের ভেতরটা দেখতে পারে—একে অন্তঃপর্যবেক্ষণশক্তি বলা হয়। ...একই সময়ে তুমি কাজ করছ এবং চিন্তা করছ, আবার তোমার মনের আর এক অংশ যেন পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে—তুমি কি চিন্তা করছ। মনের সমগ্র শক্তি একত্র করে মনের উপরেই প্রয়োগ করতে হবে। সূর্যের তীক্ষ্ণ রশ্মির কাছে অতি অন্ধকার কোণগুলি যেমন তাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করে দেয়, তেমনি এই একাগ্র মন নিজের অতি অন্তরতম রহস্যগুলি প্রকাশ করে দেবে। ...রাজযোগের সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য —কিভাবে মনকে একাগ্র করা যায়, তারপর কিভাবে মনের গভীরতম প্রদেশ-গুলি আবিষ্কার করা যায়, শেষে মনের ভেতরের ভাবগুলি থেকে কিভাবে একটা সাধারণ প্রক্রিয়া খুঁজে বের করে তা থেকে নিজেদের একটা সিদ্ধান্ত করা যায়।[২৬]

মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, অপবিত্র হলে এবং ব্রহ্মচর্যের অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ—সবই চলে যায়। এই কারণেই দেখতে পাবে, জগতে যেসব ধর্মসম্প্রদায় থেকে বড় বড় ধর্মবীর জন্মেছেন, সেইসব সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এইজন্য বিবাহ-ত্যাগী সন্ন্যাসিদলের উৎপত্তি হয়েছে। কায়মনোবাক্যে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করা নিতান্ত কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য ছাড়া রাজযোগ সাধন খুব বিপজ্জনক; এর ফলে শেষে মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিতে পারে। যদি কেউ রাজযোগ অভ্যাস করে

অথচ অপবিত্র জীবনযাপন করে, সে কিভাবে যোগী হবার আশা করতে পারে?[২৭]

ভক্তিযোগ

ভক্তি সব ধর্মেই আছে—কোথাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কোথাও বা মহাপুরুষে অর্পিত। সর্বত্রই এই ভক্তিরূপ উপাসনার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি লাভ করা সহজ। জ্ঞান লাভ করতে দৃঢ় অভ্যাস, অনুকূল অবস্থা প্রভৃতি নানারকম বিষয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও রোগশূন্য না হলে এবং মন সম্পূর্ণভাবে বিষয়াসক্তিশূন্য না হলে যোগ অভ্যাস করা যেতে পারে না। কিন্তু সব অবস্থার লোকই খুব সহজেই ভক্তি-পথে সাধন করতে পারে।[২৮]

পুত্রলাভের জন্য ঈশ্বর-উপাসনাকে ভক্তি বলা যায় না, ধনী হবার জন্য ঈশ্বর-উপাসনাকে ভক্তি বলা যায় না, স্বর্গলাভের জন্য ঈশ্বর-উপাসনাকে ভক্তি বলা যায় না, এমনকি নরকযন্ত্রণা থেকে নিস্তারলাভের জন্য ঈশ্বর-উপাসনাকেও ভক্তি নামে অভিহিত করা যায় না। ভয় বা কামনা থেকে কখনও ভক্তি জন্মাতে পারে না। তিনিই প্রকৃত ভক্ত, যিনি বলতে পারেন—ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥—হে জগদীশ্বর, আমি ধন জন পরমা সুন্দরী স্ত্রী অথবা পাণ্ডিত্য কিছুই কামনা করি না। হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।[২৯]

ভারতীয় ভক্তি পাশ্চাত্যদেশের ভক্তির মতো নয়। ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের মূল ধারণা এই যে, এতে ভয়ের ভাব মোটেই নেই—কেবল ভগবানকে ভালবাসা। ...ভক্তির কথা প্রাচীনতম উপনিষদগুলিতে পর্যন্ত আছে। ঐ উপনিষদ-গুলি খ্রীষ্টানদের বাইবেল গ্রন্থের চেয়েও অনেক প্রাচীন। সংহিতার মধ্যে পর্যন্ত ভক্তির বীজ আছে। 'ভক্তি' শব্দটিও পাশ্চাত্য শব্দ নয়। বেদমন্ত্রে উল্লিখিত 'শ্রদ্ধা' শব্দ থেকে ক্রমশ ভক্তিবাদের উদ্ভব হয়েছিল।[৩০]

(ঈশ্বরপ্রেমের) সর্বনিম্ন অবস্থাকে 'শান্তভক্তি' বলে। যখন মানুষের অন্তরে ঈশ্বরপ্রেমের আগুন জ্বলে ওঠেনি, বাহ্য অনুষ্ঠানমূলক প্রতীক

উপাসনার চেয়ে একটু উন্নত সাধারণ শান্ত ভালবাসার উন্মেষ হয়েছে মাত্র, যাতে তীব্র প্রেমের সেই উন্মত্ততা মোটেই নেই—তখন সেই ভাবকে শান্তভক্তি বলে। দেখতে পাই, জগতে কিছু লোক সাধনপথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে ভালবাসেন। আর কিছু লোক ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেন। 'শান্তভক্ত' ধীর, শান্ত ও নম্র।

এর চেয়ে একটু উঁচু ভাব—'দাস্য'। এই অবস্থায় মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের দাস ভাবে। বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই তাঁর আদর্শ। এর পরেই আসছে 'সখ্য-প্রেম'। সখ্য-প্রেমের সাধক ভগবানকে বলে—'তুমি আমার প্রাণের সখা।' এরকম ভক্ত ভগবানের কাছে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে, ঠিক যেভাবে মানুষ বন্ধুর কাছে তার হৃদয় খুলে দেয় এবং জানে যে, বন্ধু তার দোষের জন্য কখনই তাকে তিরস্কার করবে না, বরং সর্বদাই সাহায্য করতে চেষ্টা করবে। দুজন বন্ধুর মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব থাকে, তেমনি সখ্য-প্রেমের সাধক এবং তার ঈশ্বররূপ বন্ধুর মধ্যেও একটা সমান ভাবের আদানপ্রদান চলতে থাকে। এই ভাবে ভগবান হয়ে ওঠেন আমাদের বন্ধু যাঁর কাছে জীবনের সব কথা খুলে বলা চলে।...

পরবর্তী ভাবকে বলে 'বাৎসল্য'। ভগবানকে পিতা না ভেবে 'সন্তান' ভাবা।... এই ভাবের উদ্দেশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থেকে ঐশ্বর্যের ভাবগুলি দূর করা। ঐশ্বর্য-ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই একটা সমীহ করার ভাব আসে। ভালবাসায় কিন্তু ভয় বা সমীহের ভাব থাকা ঠিক নয়।...ভক্ত বলে, আমি ভগবানকে মহামহিম, ঐশ্বর্যশালী, জগদীশ্বর, দেবতাদের অধিপতি হিসেবে ভাবতে চাই না। ভগবানের ধারণা থেকে এই ভয়োৎপাদক ঐশ্বর্যভাব দূর করবার জন্য তিনি ভগবানকে নিজের শিশুসন্তানরূপে ভালবাসেন। মা-বাবার সন্তানের প্রতি ভয় বা ভক্তির ভাব দেখা দেয় না। সন্তানের কাছ থেকে তাঁরা কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করার কথাও কখনও ভাবতে পারেন না। সন্তান সর্বদাই গ্রহীতা। সন্তানের প্রতি ভালবাসায় মা-বাবা সহস্রবার জীবন দিতে প্রস্তুত। ...এই ভাব থেকে ভগবানকে বাৎসল্যভাবে ভালবাসা হয়।...

মানবীয় ভাবের আর একটা রূপে ভগবৎ-প্রেমের আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। তার নাম 'মধুর' ভাব—সব রকম ভাবের মধ্যে সেটিই শ্রেষ্ঠ। এ-সংসারে প্রকাশিত সর্বোচ্চ প্রেমের উপর তার ভিত্তি—আর মানবীয় অভিজ্ঞতায় যত

রকম প্রেম আছে, তার মধ্যে ঐটিই উচ্চতম এবং প্রবলতম। নারী-পুরুষের প্রেম যেমন মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে ওলটপালট করে দেয় আর কোন্ প্রেম সেরকম করতে পারে? আর কোন্ প্রেম মানুষের প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে তাকে পাগল করে তোলে? —তার নিজের প্রকৃতি ভুলিয়ে দেয়? – মানুষকে হয় দেবতা, নয় পশু করে ফেলে? দিব্য প্রেমের এই মধুর-ভাবে ভগবান আমাদের স্বামী। আমরা সকলে নারী—এই জগতে কোন পুরুষ নেই। পুরুষ একমাত্র তিনি—সেই ভগবান, আমাদের প্রেমাস্পদ। পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে যে ভালবাসা দিয়ে থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করতে হবে।..

প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক আবার এতেও সন্তুষ্ট নন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম তাঁর কাছে তত উন্মাদক নয়। ভক্তেরা অবৈধ প্রেমের ভাব গ্রহণ করে থাকেন, কারণ তা অত্যন্ত প্রবল। ঐ প্রেমের অবৈধতা তাঁদের লক্ষ্য নয়। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে, যতই বাধা পায়, ততই তা উগ্ররূপ ধারণ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা সহজ স্বচ্ছন্দ। তাতে কোন বাধাবিঘ্ন নেই। সেইজন্য ভক্তেরা কল্পনা করেন, যেন কোন নারী তাঁর প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, এবং তাঁর বাবা, মা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই তা প্রবলভাব ধারণ করতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরকম লীলা করতেন, কিভাবে সবাই পাগল হয়ে তাঁকে ভালবাসত, কিভাবে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনামাত্র গোপীরা, সেই ভাগ্যবতী গোপীরা, সব কিছু ভুলে—জগৎ ভুলে, জগতের সমস্ত বন্ধন, সাংসারিক কর্তব্য ও সংসারের সুখদুঃখ ভুলে—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসত, মানবীয় ভাষা তা প্রকাশ করতে অক্ষম। মানুষ, হে মানুষ—তুমি ভগবৎ-প্রেমের কথা বল, আবার জগতের সব অসার বিষয়ে নিযুক্ত থাকতেও পার, তোমার কি মন মুখ এক? যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম থাকতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকতে পারেন না। এই দুটি কখনও একসাথে থাকে না। আলো এবং অন্ধকার (রবি এবং রজনী) কখনও একসঙ্গে থাকে না।[৩১]

সংসারে প্রেমিক যেমন তাঁর প্রেমাস্পদকে ভালবাসে, তেমনি আমাদের ভগবানকে ভালবাসতে হবে। কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—রাধা তাঁর প্রেমে উন্মত্ত।.. কিন্তু এ অপূর্ব প্রেমের তত্ত্ব কে বুঝবে? অনেকে আছে, যাদের অন্তরের অন্তস্তলটা পর্যন্ত পাপে পূর্ণ, তারা পবিত্রতা বা নীতি কাকে বলে জানে না; তারা কি

এইসব তত্ত্ব বুঝবে? তারা কোনমতেই এসব তত্ত্ব বুঝতে পারবে না। যখন লোকে মন থেকে সমস্ত অসৎ চিন্তা দূর করে পবিত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে বাস করে, তখন মূর্খ হলেও শাস্ত্রের অতি জটিল ভাষারও রহস্য ভেদ করতে পারে। কিন্তু এরকম লোক সংসারে কজন? কজনের পক্ষে এরকম হওয়া সম্ভব? [৩২]

ভক্তি তোমার ভিতরেই রয়েছে, কেবল তার উপর কাম-কাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে আছে। ঐ আবরণটা সরিয়ে দিলে সেই ভিতরকার ভক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। [৩৩]

ভক্তি খুব বড় জিনিস, কিন্তু এতে নিরর্থক ভাবপ্রবণতা এসে আসল জিনিসটাই নষ্ট হবার যথেষ্ট ভয় আছে। [৩৪]

ভক্তিপথের একটা বিরাট সুবিধে হল: এইটি সেই পরম লক্ষ্যে পৌঁছনোর সবচেয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক পথ। আর এই পথের বড় অসুবিধে হচ্ছে: ভক্তি তার নীচু অবস্থায় প্রায়ই ভয়ঙ্কর ধর্মোন্মাদনার স্তরে অবনমিত হয়ে আসে। [৩৫]

শ্রীচৈতন্যদেব মহাত্যাগী পুরুষ ছিলেন; স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেড়া-নেড়ীর দল করলে। আর তিনি যে-প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম। তা কখনও সাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব-গুরুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানোর দিকে ঝোঁক না দিয়ে তাঁর প্রেমটাকে সাধারণের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে সে উচ্চ প্রেমভাবটা নিতে পারলে না এবং সেটাকে নায়ক-নায়িকার দূষিত প্রেম করে তুললে।...

কাম থাকতে প্রেম হয় না—এক বিন্দু থাকতেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ও-প্রেমের অধিকারী কেউ নয়। ওই প্রেম সাধারণের সম্পত্তি করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভেতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠবে। ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিন্নিদের সঙ্গে যে প্রেম, তার কথাই মনে উঠবে।...

মধুরভাব ছাড়া ভগবানকে ভজন করবার আর কি কোন পথ নেই? আরও চারটে ভাব আছে তো, সেগুলো ধরে ভজন কর না? প্রাণভরে তাঁর নাম কর

না? হৃদয় খুলে যাবে। তারপর যা হবার আপনি হবে। তবে একথা নিশ্চিত জেনো যে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামশূন্য হবার চেষ্টাটাই আগে কর না।...

কীর্তন মানে ভগবানের গুণগান, তা যেমন করেই হোক। বৈষ্ণবদের মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্তু তাতে একটা দোষও আছে। সেটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যেও। কি দোষ জানো? প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাও রিরি করে, তারপর যেই সংকীর্তন থামে তখন সে-ভাবটা হুহু করে নাবতে থাকে। ঢেউ যত উঁচুতে ওঠে, নাববার সময় সেটা তত নীচুতে নাবে। বিচারবুদ্ধি সঙ্গে না থাকলেই সর্বনাশ, সে-সময়ে রক্ষা পাওয়া ভার। কামাদি নীচ ভাবের অধীন হয়ে পড়তে হয়।...

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে। ভক্তির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি রাখবে। এছাড়া চৈতন্যদেবের কাছ থেকে আরও নেবে তাঁর heart, সর্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের জন্য টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে।[৩৬]

কর্মযোগ

অনাসক্ত হওয়া, মুক্ত পুরুষের মতো কর্ম করা এবং সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করাই আমাদের একমাত্র প্রকৃত কর্তব্য। আমাদের সমস্ত কর্তব্যই ঈশ্বরের।[৩৭]

যে-কোন কাজ বা যে-কোন চিন্তা কোন কিছু ফল উৎপন্ন করে, তাকেই 'কর্ম' বলে।[৩৮]

ঠিকভাবে কাজ করতে হলে প্রথমেই আসক্তির ভাব ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, হৈচৈ-পূর্ণ কলহে নিজেকে জড়িও না; নিজে সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত থেকে কাজ করে যাও। আমার গুরুদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলেছেন, 'নিজের সন্তান-দের উপর দাসী বা ধাত্রীর ভাব অবলম্বন কর।' দাসী তোমার শিশুকে নিয়ে আদর করবে, তার সঙ্গে খেলা করবে, খুব যত্নের সঙ্গে লালন করবে, যেন তার নিজের সন্তান; কিন্তু দাসীকে বিদায় দেওয়ামাত্র সে গাঁটরি বেঁধে তোমার বাড়ি থেকে চলে যেতে প্রস্তুত। এত যে ভালবাসা ও আসক্তি, সবই সে ভুলে যায়। ...তুমিও যা-কিছু তোমার নিজের মনে কর, সেসবের প্রতি এরকম ভাব পোষণ

কর। তুমি যেন দাসী, আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, তবে বিশ্বাস কর—যা-কিছু তোমার বলে মনে কর, সবই তাঁর।[৩৯]

কর্মযোগী বলেন, স্বর্গে যাবে বলে যে ভাল কাজ করে, সেও নিজেকে বদ্ধ করে ফেলে। এতটুকু স্বার্থযুক্ত অভিসন্ধি নিয়ে যে-কাজ করা যায়, তা মুক্তির পরিবর্তে আমাদের পায়ে আর একটা শৃঙ্খল পরিয়ে দেয়। যদি আমরা মনে করি, এই কর্ম দ্বারা আমরা স্বর্গে যাব তাহলে আমরা স্বর্গনামক একটি স্থানে আসক্ত হব। আমাদেরকে স্বর্গে গিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করতে হবে। এটাও আমাদের পক্ষে আর একটা বন্ধন হয়ে দাঁড়াবে। অতএব একমাত্র উপায়—সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করা, অনাসক্ত হওয়া।... আমরা অভিসন্ধি-শূন্য হয়ে যে-কোন ভাল কাজ করি, তা আমাদের পায়ে একটি নতুন শৃঙ্খল সৃষ্টি না করে যে-শৃঙ্খলে আমরা বদ্ধ আছি, তারই একটা শিকলি ভেঙে দেয়। আমরা প্রতিদানে কিছু পাবার আশা না করে, যে-কোন সৎ চিন্তা চারদিকে প্রেরণ করি, তা সঞ্চিত হয়ে থাকবে—আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের একটা শিকলি চূর্ণ করবে এবং আমরা ক্রমশই পবিত্রতর হতে থাকব—যতদিন না পবিত্রতম মানবে পরিণত হই।[৪০]

যে কর্মের দ্বারা ..আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম। যদ্দ্বারা অনাত্ম-ভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম।[৪১]

শরীর ধারণ করে সর্বক্ষণ একটা কিছু না করে থাকতে পারা যায় না। জীবকে যখন কর্ম করতেই হচ্ছে, তখন যেভাবে কর্ম করলে আত্মার দর্শন পেয়ে মুক্তিলাভ হয়, সেভাবে কর্ম করতেই নিষ্কাম কর্মযোগে বলা হয়েছে।[৪২]

কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে হলে নিজেকে কর্মে নিযুক্ত কর, কিন্তু কোন কামনা কোরো না—ফলাকাঙ্ক্ষা যেন তোমার না থাকে। এইরকম কর্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে—ঐ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়। জ্ঞানলাভ করবার আগে কর্মত্যাগ করলে তাতে দুঃখই এসে থাকে। 'আত্মা'র জন্য কর্ম করলে তা থেকে কোন বন্ধন আসে না। কর্ম থেকে সুখের আকাঙ্ক্ষাও কোরো না; আবার কর্ম করলে কষ্ট হবে—এ ভয়ও কোরো না। ...সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ কর। সংসারে থাকো, কিন্তু সংসারের হয়ে যেও না। পদ্মপত্রের মূল পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তা সব সময়ই শুদ্ধ থাকে—সেইরকম লোকে তোমার

প্রতি যেরকম ব্যবহারই করুক না, তোমার ভালবাসা যেন কারও প্রতি কম না হয়।[৪০]

কর্মের ফলে যদি তোর দৃষ্টি না থাকে এবং সকল প্রকার কামনা-বাসনার পারে যাবার যদি তোর একান্ত অনুরাগ থাকে, তাহলে ঐসব সৎ কাজ তোর কর্মবন্ধন-মোচনেই সহায়তা করবে। ঐরূপ কর্মে বন্ধন আসবে! —ওকথা তুই কি বলছিস? এরূপ পরার্থ কর্মই কর্মবন্ধনের মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'[৪৪]

শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস?—সমস্ত গীতাটা personified! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলেছেন, তখন তার central idea-টি তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।...সমস্ত শরীরে intense action, আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হল গীতার central idea; দেহ, জীবন আর প্রাণ-মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥

যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন, আর বাহ্য কোন কর্ম না করলেও অন্তরে যাঁর আত্মচিন্তারূপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তাঁরই সব কর্ম করা হয়েছে।...

এই ভাব সমস্ত লোকের ভেতর ছড়ানো চাই—কর্ম কর্ম অনন্ত কর্ম—তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে, আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায়।. .এ-ই কর্মযোগ। কিন্তু সাধনভজন না করলে কর্মযোগও হবে না। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই। নইলে প্রাণ-মন কেমন করে তাঁতে দিয়ে রাখবি?...

তন্ত্রটা বড় slippery ground (পিছল পথ)। এইজন্য বলি, এদেশে তন্ত্রের চর্চা চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই। বেদের (বেদান্তের) চর্চা চাই। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করে সাধন করা চাই, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য চাই। জ্ঞান—বিচার-বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পূজাভাব চাই। ওরাই হল আদ্যাশক্তি। যেদিন আদ্যাশক্তির পুজো আরম্ভ হবে, সেদিন মায়ের কাছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপনি 'নরবলি' দেবে, সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল শুরু হবে।[৪৫]

ধর্ম-সমন্বয়

সমগ্র মানবজাতিকে যদি কেবল একটাই ধর্ম, একটামাত্র পূজাপদ্ধতি বা একটামাত্র নৈতিক মানদণ্ডকে স্বীকার ও গ্রহণ করতে হয়, তাহলে জগতে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। সমস্ত ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রগতির পক্ষে তা হবে মৃত্যু-তুল্য আঘাত। এবং এই ধ্বংসাত্মক ঘটনাটিকে কিন্তু ত্বরান্বিতই করা হবে যদি আমরা অন্যকে ভাল বা মন্দ উপায়ে বাধ্য করি আমাদের নিজেদের দৃষ্টিতে সত্যের যা সর্বোচ্চ আদর্শ তাকেই গ্রহণ করতে। তার পরিবর্তে আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যাতে মানুষের নিজের নিজের আদর্শ-অভিমুখে চলবার পথে সমস্ত বাধা দূর হয়ে যায় এবং জগতের সকলের জন্য একটিমাত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়।[৪৩ক]

আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সব ধর্মের ও সব জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী মানুষকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে এসেছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।[৪৬]

পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাবশূন্য হলেই চলবে না, আমাদেরকে ঐ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গনও করতে হবে; সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি।[৪৭]

কারও নিন্দা কোরো না, সাহায্য করতে পার তো কর; যদি না পার, হাত গুটিয়ে নাও; সকলকে আশীর্বাদ কর, সকলকে নিজ নিজ পথে চলতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করলে কোন উন্নতিই হয় না। এভাবে কখনও কারও উন্নতি হয় না। অন্যের নিন্দা করলে কেবল বৃথা শক্তিক্ষয় হয়। সমালোচনা ও নিন্দা দ্বারা বৃথা শক্তিক্ষয় হয় মাত্র; আর শেষে আমরা দেখতে পাই—অন্যে যেদিকে চলছে, আমরাও ঠিক সেইদিকেই চলছি; আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার বিভিন্নতা-মাত্র।[৪৮]

বস্তুতপক্ষে, ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে বিভিন্নতা থাকাতে সুবিধেই হয়েছে। মানুষকে ধর্মজীবন-যাপন করতে যতক্ষণ উৎসাহ দেয়, ততক্ষণ সব বিশ্বাসই শুভ। মানুষের মধ্যে দেবত্বের সংস্কার বিরাজ করে। ধর্মসম্প্রদায় যত বেশী হয়, সেই সংস্কারের প্রতি আবেদন জানিয়ে সফল হওয়ার সুযোগ ততই বেশী পাওয়া যায়।[৪৮ক]

আমার গুরুদেব বলতেন, ধর্ম এক। সব অবতারকল্প পুরুষ একরকম শিক্ষাই দিয়ে যান, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন আকার দিতে হয়। সেইজন্য তাঁরা তাকে তার পুরাতন আকার থেকে তুলে নিয়ে একটা নতুন আকারে আমাদের সামনে ধরেন।[৪৯]

সব ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ—এমনকি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলের ঠিক একই রকম অনুভূতি হয়ে থাকে।[৫০]

খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলো গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং নিজের বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজের প্রকৃতি অনুসারে বেড়ে উঠবে।[৫১]

...সাধুতা, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্ম-মণ্ডলীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়; এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মাধ্যমেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। এইসব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও কেউ যদি স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে এবং তাঁর ধর্মই শুধু টিকে থাকবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। তাঁর জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। তাঁকে আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি তাঁর মতো মানুষের বাধা দেওয়া সত্ত্বেও প্রতি ধর্মের পতাকার উপর শীঘ্রই লিখিত হবেঃ 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়—পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়—সমন্বয় ও শান্তি।'[৫২]

যদি কখনও এক সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তা কখনও কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হবে না। যে অসীম ভগবানের কথা ঐ ধর্মে প্রচারিত হবে, ঐ ধর্মকে তারই মতো অসীম হতে হবে; সেই ধর্মের সূর্য, কৃষ্ণভক্ত, খ্রীষ্টভক্ত, সাধু, অসাধু সবার উপর সমানভাবে কিরণ দিয়ে চলবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান ধর্ম হবে না—হবে সব ধর্মের সমষ্টি-স্বরূপ অথচ তাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকবে; সেই উদার ধর্ম অসংখ্য বাহু প্রসারিত করে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে। ...সেই ধর্মের নীতিতে কারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকবে না। সেই ধর্মে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হবে এবং সেই ধর্মের সমস্ত শক্তি মানবজাতিকে দেবস্বভাব উপলব্ধিতে সহায়তা করবার জন্যই সতত

নিযুক্ত থাকবে। এইরকম একটি ধর্ম উপস্থাপিত কর—সব জাতিই তোমার অনুবর্তী হবে।[৫৩]

ধার্মিকের লক্ষণ

তুমি যে ধার্মিক হচ্ছ, তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছেঃ তুমি ক্রমশ হাসিখুশি হতে থাকবে। যদি কেউ গোমড়া মুখে থাকে—তবে তা বদহজমের জন্য হতে পারে, কিন্তু তা ধর্ম নয়। ...দুঃখ-কষ্টের মূলে থাকে পাপ—আর কিছু নয়। ...বিষণ্ণ মুখ ভয়ংকর। বিষণ্ণ মেঘলা মুখ নিয়ে বাইরে যেও না, কখনও এরকম হলে সারাদিন নিজেকে ঘরে বন্ধ করে রেখো। সমাজে-সংসারে এই ব্যাধি সংক্রামিত করবার তোমার কি অধিকার?[৫৪]

প্রকৃত ধার্মিক লোক সর্বত্রই উদার হয়ে থাকেন। তাঁর ভিতরে যে প্রেম আছে, তাইতে তাঁকে বাধ্য হয়ে উদার হতে হয়। কেবল যাদের কাছে ধর্ম একটা ব্যবসামাত্র, তারাই ধর্মের ভিতর সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিবাদ ও স্বার্থপরতা এনে ব্যবসার খাতিরে ওরকম সংকীর্ণ ও অনিষ্টকারী হতে বাধ্য হয়।[৫৫]

আমরা জগতে অসৎ ভাব দেখি কেন? কারণ আমরা নিজেরাই অসৎ। ...আমরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও সেরকম দেখে থাকি। মনে কর, ঘরে একটা শিশু আছে, আর টেবিলের ওপর একথলে মোহর আছে। একজন চোর এসে সেগুলি নিয়ে নিল। শিশুটি কি বুঝতে পারবে যে, মোহরগুলো চুরি করা হল? আমাদের ভেতরে যা, বাইরেও তা-ই দেখে থাকি। শিশুর মনে চোর নেই, সুতরাং সে বাইরেও চোর দেখে না। সমস্ত জ্ঞান সম্বন্ধেই এরকম। জগতের পাপ ও অন্যায়ের কথা বোলো না। বরং তোমাকে যে জগতে এখনও অন্যায় দেখতে হচ্ছে, সেজন্য কাঁদো। তোমাকে যে এখনও সর্বত্র পাপ দেখতে হচ্ছে, সেজন্য কাঁদো। যদি তুমি জগতের উপকার করতে চাও, তবে আর জগতের উপর দোষারোপ কোরো না—জগৎকে আরও বেশী দুর্বল কোরো না। এইসব পাপ দুঃখ এসব আর কি?—এগুলো তো দুর্বলতারই ফল। মানুষ ছোটবেলা থেকে শিক্ষা পায় যে, সে দুর্বল ও পাপী। জগৎ এই শিক্ষার ফলে দিন দিন আরও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তাদের শেখাও যে, তারা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান—এমনকি যাদের ভেতর আত্মার প্রকাশ অত্যন্ত ক্ষীণ, তারাও। ছোটবেলা থেকেই

তাদের মাথায় শুধু ইতিবাচক (positive) চিন্তাই ঢুকুক, যা তাদের সত্যিই সাহায্য করবে, যা তাদের সবল করবে, যাতে তাদের প্রকৃত কল্যাণ হবে। দুর্বলতা ও কর্মশক্তি-লোপকারী চিন্তা যেন তাদের মাথায় না ঢোকে। সৎ চিন্তার স্রোতে গা ঢেলে দাও, নিজের মনকে সর্বদা বল 'আমি সেই, আমিই সেই' (সোঽহং সোঽহং)। তোমার মনে দিনরাত্রি এই চিন্তা সঙ্গীতের মতো বাজতে থাকুক; আর মৃত্যু যখন আসবে তখনও 'সোঽহং সোঽহং' বলে দেহত্যাগ কর। সত্য এইটিই...জগতের অনন্ত শক্তি তোমার ভেতরে। ...সাহসী হও। সত্যকে জেনে তা জীবনে রূপায়িত কর। চরম লক্ষ্য হয়তো অনেক দূর, কিন্তু ওঠো, জাগো লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না।[১৬]

তোমরা কি ইতিহাসে পাওনি, জগতের আচার্য-পুরুষদের শক্তির উৎস কি ছিল? কোথায় সেই উৎস? বুদ্ধিতে কি? তাঁরা কি কেউ দর্শনের উপর বা তর্কবিজ্ঞানের জটিল বিচার-পদ্ধতির উপর কোন মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন? না, তাঁদের একজনও তা করেননি। তাঁরা কেবল কয়েকটা বাণী উচ্চারণ করেছেন। যীশুখ্রীষ্টের মতো হৃদয়বান হতে চেষ্টা কর— তখন তুমিই হবে যীশুখ্রীষ্ট। বুদ্ধের মতো হৃদয়বান হতে চেষ্টা কর—তুমিই হয়ে উঠবে বুদ্ধ। এই হৃদয়বত্তাই জীবন, জীবনের শক্তি এবং সজীবতা। একে বাদ দিয়ে বুদ্ধির কোন ক্রিয়া-কলাপই তোমায় ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবে না।[১৭]

সাহস দু-রকমের। এক রকমের সাহস কামানের মুখে যাওয়া; আর এক রকম -আধ্যাত্মিক দৃঢ় প্রত্যয়ের সাহস। একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁর গুরু তাঁকে বলে দিয়েছিলেন ভারতীয় সাধু-দের সঙ্গে দেখা করতে। অনেক খোঁজখবর করার পর তিনি দেখলেন, এক বৃদ্ধ সাধু একটি পাথরের উপর বসে আছেন। সম্রাট তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। তিনি ঐ সাধুকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে তাঁর দেশে যেতে। সাধু রাজী হলেন না, বললেনঃ 'আমি এই বনে বেশ আনন্দে আছি।' সম্রাট বললেন, 'আমি সারা পৃথিবীর সম্রাট। আমি আপনাকে ধন ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদা দেব।' সাধু বললেন, 'ঐশ্বর্য পদমর্যাদা প্রভৃতি কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নেই।' তখন সম্রাট বললেন, 'আপনি যদি আমার সঙ্গে না যান, তবে আমি আপনাকে মেরে ফেলব।' সাধু স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'মহারাজ, তুমি এরকম বোকার মতো কথা আর কখনও বলোনি। তুমি

আমাকে হত্যা করতে পার না। সূর্য আমায় শুষ্ক করতে পারে না, আগুন আমায় পোড়াতে পারে না, তরবারি আমায় সংহার করতে পারে না—কারণ, আমি জন্মরহিত, অবিনাশী, নিত্য বিদ্যমান, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান আত্মা।' এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাহসিকতা। আর অন্য যে-ধরনের সাহস, সেটি পাশবিক সাহসিকতা।—বাঘ-সিংহের যেমন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় একটি মুসলমান সৈনিক একজন সন্ন্যাসীকে প্রচণ্ডভাবে অস্ত্রাঘাত করে। হিন্দু বিদ্রোহীরা ঐ মুসলমানকে সন্ন্যাসীর কাছে ধরে এনে বলল, 'বলেন তো, একে হত্যা করি।' কিন্তু সন্ন্যাসী তার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বললেনঃ 'ভাই, তুমিই সেই, তুমিই সেই'। একথা বলেই সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করলেন। এ-ও সেই আধ্যাত্মিকতার সাহস।[৫৮]

ব্যবহারিক ধর্ম : জীবই শিব

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে 'প্রভু প্রভু' বলে চিৎকার করে সে নয়—যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক।[৫৯]

নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও—প্রাণের ভয় পর্যন্ত রাখিও না। ধর্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্যন্ত পাপচিন্তা আসিতে দেয় না।[৬০]

তুমি যদি সত্যিই পবিত্র হও, তাহলে তুমি অপবিত্র দেখবে কি করে? কারণ ভেতরে যা থাকে, তা-ই থাকে বাইরে। আমাদের নিজেদের ভেতরেই অপবিত্রতা না থাকলে আমরা কখনও বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পারি না। এইটি বেদান্তের একটি ব্যবহারিক দিক এবং আমি আশা করি, আমরা সকলেই এটি জীবনে রূপায়িত করতে চেষ্টা করব।[৬১]

পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ।[৬২]

সব রকম শুভভাবের, সব রকম নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র—'আমি' নয়, 'তুমি'। কে ভাবতে যায়—স্বর্গ নরক আছে কি না? কে ভাবতে যায় আমার আত্মা আছে কি না? কে ভাবতে যায়—কোন অপরিণামী অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে কি না? এই সংসার সামনে পড়ে আছে, যা মহাদুঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধের মতো এই সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও। দুঃখ লাঘব করার জন্য—হয় সংগ্রাম কর, নয় ঐ চেষ্টায় প্রাণ দাও। আস্তিক হও বা নাস্তিক হও, অজ্ঞেয়-বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীষ্টান হও বা মুসলমান হও, নিজেকে ভুলে যাও—শিক্ষার প্রথম বিষয় এইটিই। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বুঝতে পারে—ক্ষুদ্র 'আমি'র বিনাশ এবং প্রকৃত 'আমি'র বিকাশ।[৫৩]

আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'[৫৪]

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[৫৫]

পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।[৫৬]

আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই দেখিনি; তুমিও দেখনি। এই চেয়ারটাকে দেখতে হলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বর দেখতে হয়, তারপর তাঁরই ভেতর দিয়ে চেয়ারটিকে দেখতে হয়। তিনি দিনরাত জগতে থেকে 'আমি আছি, আমি আছি' বলছেন। যে-মুহূর্তে তুমি বল 'আমি আছি', সেই মুহূর্তেই সেই সত্তাকে জানছ। কোথায় আমরা ঈশ্বরকে খুঁজতে যাবো, যদি আমরা তাঁকে আমাদের হৃদয়ে, সমস্ত প্রাণীর ভিতরে না দেখতে পাই?[৫৭]

যদি একজনের মনে—এ সংসার-নরককুণ্ডের মধ্যে একদিনও একটু আনন্দ ও শান্তি দেওয়া যায়, সেইটুকুই সত্য, এই তো আজন্ম ভুগে দেখছি—বাকি সব ঘোড়ার ডিম।[৫৮]

সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ, তার পুজো মানে তাঁর সেবা—এর নাম কর্ম। ...ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। ...পাগলা-গারদ দেশ-ময়।[৬৯]

প্রত্যেক নরনারীকে—সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখতে থাক। তোমরা কাউকে সাহায্য করতে পার না, কেবল সেবা করতে পার: প্রভুর সন্তানদের, যদি সম্ভব হয়, স্বয়ং প্রভুর সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁর কোন সন্তানের সেবা করতে পার, তবে তোমরা ধন্য। নিজেদের খুব বড় কিছু ভেব না। তোমরা ধন্য যে, সেবা করবার অধিকার পেয়েছ, অন্যে তা পায়নি। উপাসনাবোধে এটুকু কর। দরিদ্রদের মধ্যে আমি যেন ঈশ্বরকে দেখি—নিজের মুক্তির জন্যই তাদের কাছে গিয়ে আমি তাদের পুজো করব। কতগুলো লোক যে দুঃখ-দারিদ্রে কষ্ট পাচ্ছে, তা তোমার-আমার মুক্তির জন্য—যাতে আমরা রুগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পুজো করতে পারি।[৭০]

প্রথম পুজো—বিরাটের পুজো, আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের পুজো। এদের 'পুজো' করতে হবে। ...'পুজো' শব্দটিই হচ্ছে ঠিক কথা। এছাড়া আর কোন শব্দেই আমার অভিপ্রেত ভাবটা প্রকাশ করা যাবে না। এইসব মানুষ ও পশু--এরাই আমাদের ঈশ্বর, আর আমার স্বদেশবাসীরাই আমার প্রথম উপাস্য। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করে, পরস্পর বিবাদ না করে প্রথমেই এই স্বদেশবাসীদের পুজো করতে হবে।[৭১]

আমার কথা যদি শোন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখতে হবে। তোমার বাড়ির কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ-পথ্য যোগাড় করে দিলে এবং শরীরের দ্বারা সেবাশুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে—তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ, মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও বাপু,

তাহলে এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে তুমি মনের শান্তি পাবে।[৭২]

সমস্ত উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া এবং অপরের কল্যাণ করা। দরিদ্র, দুর্বল, রুগী—সবার মধ্যেই যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই ঠিক ঠিক শিবের উপাসনা করেন। আর যে কেবল প্রতিমার মধ্যে শিবের উপাসনা করে, তার উপাসনা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের। যে কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তার চেয়ে যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একজন দরিদ্রকেও শিববোধে সেবা করে, তার প্রতি শিব বেশী প্রসন্ন হন।

এক ধনী ব্যক্তির একটি বাগান এবং দুটি মালী ছিল। তাদের মধ্যে এক-জন খুব অলস, সে কোন কাজই করত না, কিন্তু প্রভু আসামাত্র হাতজোড় করে—'প্রভুর কী রূপ কী গুণ' বলে তাঁর সামনে নাচত। অপর মালীটি বেশী কথা বলতে জানত না—সে খুব পরিশ্রম করে প্রভুর বাগানে সব রকম ফল ও শাকসবজি উৎপাদন করত এবং সেগুলি মাথায় করে অনেক দূরে প্রভুর বাড়িতে নিয়ে যেত। এই দুজন মালীর মধ্যে প্রভু কাকে বেশী ভালবাসবেন? শিব আমাদের সকলের প্রভু, এবং এই জগৎ তাঁর উদ্যান আর এখানেও দুধরনের মালী আছে। এক শ্রেণীর মালী অলস, কপট; কেবল শিবের রূপের—তাঁর চোখ নাক ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা করবে; আর এক শ্রেণীর মালী আছেন—যাঁরা শিবের দুর্বল সন্তানদের জন্য, তাঁর সৃষ্ট সমস্ত প্রাণীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। এই দুই শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে কে শিবের বেশী প্রিয় হবেন? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সন্তানদের সেবা করেন। যিনি পিতার সেবা করতে চান, তাঁকে আগে তাঁর সন্তানদের সেবা করতে হবে। যিনি শিবের সেবা করতে চান, তাঁকে শিবের সন্তানদের সেবা সবার আগে করতে হবে—জগতের জীবদের সেবা আগে করতে হবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যারা ভগবানের দাসদের সেবা করেন, তাঁরাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দাস। অতএব, এটা সর্বদা মনে রাখবে। আমি তোমাদের আবার বলছি, তোমাদের শুদ্ধচিত্ত হতে হবে এবং যে-কেউ তোমাদের কাছে আসে, যথাসাধ্য তার সেবা করতে হবে। এইভাবে পরের সেবা করা শুভকর্ম। এই শুভকর্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সবার ভেতরে যে শিব রয়েছেন, তিনি প্রকাশিত হন। ...আর যদি কেউ স্বার্থপর হয়, সে যদি পৃথিবীতে যত দেবমন্দির আছে সব দেখে থাকে, সব তীর্থ দর্শন করে থাকে,

সে যদি (ফোঁটা কেটে) চিতাবাঘের মতো সেজে বসে থাকে, তাহলেও সে শিব থেকে অনেক দূরে।[৭৩]

তুমিই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির; আমি কোন মন্দিরে কোনরকম প্রতিমা বা কোনরকম শাস্ত্র উপাসনা না করে বরং তোমার উপাসনা করব। লোকে এত পরস্পর-বিরোধী চিন্তা করে কেন? ...লোকে বলে, তারা খুব বাস্তববাদী। বেশ কথা। কিন্তু এইখানে তোমার উপাসনার চেয়ে আর কি বেশী বাস্তব হতে পারে? আমি তোমাকে দেখছি, তোমাকে বিলক্ষণ অনুভব করছি, আর জানছি যে, তুমিই ঈশ্বর। ...মানবদেহান্তর্গত মানবাত্মাই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্য জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল। যদি মানুষের মধ্যে তাঁর উপাসনা করতে না পারলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হবে না। ...যে-মুহূর্তে আমি প্রতিটি মানুষের সামনে শ্রদ্ধা-সহকারে দাঁড়াতে পারব, আর বাস্তবিক তার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখব—যে-মুহূর্তে আমার মধ্যে এই ভাব আসবে—সেই মুহূর্তেই আমি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হব।[৭৪]

উপলব্ধির পর কি হয়? ...ধর্মের এই প্রত্যক্ষানুভূতিই জগতের যথার্থ উপকার করে থাকে। লোকের ভয় হয় যখন সে এই অবস্থা লাভ করবে, যখন সে উপলব্ধি করবে সবই এক—তখন তার প্রেমের প্রস্রবণ শুকিয়ে যাবে; জীবনের সবকিছুই যাবে চলে; ইহজীবনে ও পরজীবনে তাদের ভালবাসার আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু লোকে একবার ভেবে দেখে না যে, যেসব মানুষ নিজের সুখচিন্তায় একরকম উদাসীন, তাঁরাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী হয়েছেন। তখনই মানুষ ঠিক ঠিক ভালবাসতে শেখে যখন সে দেখতে পায়—তার ভালবাসার জিনিস সামান্য কোন মর্তজীব নয়। তখনই মানুষ ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারে, যখন সে দেখতে পায়—তার ভালবাসার পাত্র খানিকটা মৃৎপিণ্ড নয়, স্বয়ং ভগবান। স্ত্রী তার স্বামীকে আরও বেশী ভালবাসবে যদি সে ভাবতে পারে তার স্বামী স্বয়ং ভগবান। স্বামী তার স্ত্রীকে আগের চেয়ে বেশী ভালবাসবে যদি সে জানতে পারে—স্ত্রী স্বয়ং ভগবান। সেই মা সন্তানদের আরও বেশী ভালবাসবে, যদি সে সন্তানদের ঈশ্বরবুদ্ধিতে ভাবে। যিনি জানেন শত্রু সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনি তাঁর মহাশত্রুকেও ভালবাসবেন। যিনি জানেন, সাধু সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনিই একজন সাধুপুরুষকে ভালবাসবেন। সেই

মানুষই আবার সবচেয়ে অসাধু ব্যক্তিকেও ভালবাসবেন, কারণ তিনি জানেন যে অসাধুতম পুরুষের পেছনেও আছেন প্রভু। এই ধরনের মানুষ—যাঁর নিজের ক্ষুদ্র 'অহং' মৃত, ঈশ্বর সেই 'অহং'-এর স্থান অধিকার করে বসে আছেন—সেই মানুষ জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকেন। তাঁর কাছে সমগ্র জগৎ রূপান্তরিত হয়ে যায়। দুঃখকর কষ্টকর যা-কিছু, সবই চলে যায়; সবরকমের গোলমাল দ্বন্দ্ব মিটে যায়। এই জগৎ—যেখানে আমরা প্রতিদিন একটুকরো রুটির জন্য ঝগড়া-মারামারি করি—সেই জগৎ তখন তাঁর কাছে কারাগার না হয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হবে। এই জগৎই তখন কী সুন্দর মনে হবে। এই ধরনের মানুষেরই কেবল বলবার অধিকার আছেঃ 'এই জগৎ কী সুন্দর!' তাঁরই কেবল বলবার অধিকার আছেঃ 'সবই মঙ্গলস্বরূপ।' এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলে জগতের এই মহাকল্যাণ হবে যে, সমস্ত বিবাদ গন্ডগোল দূর হয়ে পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপিত হবে। যদি সব মানুষ এই মহান সত্যের এক বিন্দুও উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে সারা পৃথিবী আর একরূপ ধারণ করবে; অন্যায় অশোভনভাবে তাড়াতাড়ি অপর সবাইকে অতিক্রম করবার প্রবৃত্তি জগৎ থেকে চলে যাবে; তার সঙ্গে সঙ্গেই সব রকম অশান্তি, সব রকম ঘৃণা, সব রকম ঈর্ষা ও অশুভ চিরকালের জন্য চলে যাবে। তখন এই জগৎ হবে দেবতার বাসভূমি, এই জগৎই স্বর্গ হয়ে যাবে। আর যখন দেবতায় দেবতায় খেলা, দেবতায় দেবতায় কাজ, দেবতায় দেবতায় প্রেম—তখন কি আর অশুভ থাকতে পারে? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা সুফল। সমাজের সবকিছু তখন পরিবর্তিত হয়ে অন্য রূপে প্রতিভাত হবে। আর, সবচেয়ে প্রথম যে মহালাভ হবে তা হচ্ছে—তখন তোমরা মানুষকে আর খারাপ বলে দেখবে না। তখন তোমরা আর কোন অন্যায়কারী হতভাগ্য নর-নারীর প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। ...তখন তোমাদের মনে আর ঈর্ষা বা অন্যকে শাস্তি দেবার ভাব উঠবে না—সে সবই চলে যাবে। তখন প্রেম এত প্রবল হবে যে, মানবজাতিকে সৎ পথে পরিচালিত করবার জন্য আর চাবুকের প্রয়োজন হবে না।

যদি পৃথিবীতে যত নরনারী আছে, তাদের লক্ষ ভাগের এক ভাগ শুধু চুপ করে বসে খানিকক্ষণের জন্যও বলে—'তোমরা সকলেই ঈশ্বর; হে মানব-গণ, পশুগণ, প্রাণিগণ, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ।'—তাহলে

আধঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত জগৎ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখন আর চতুর্দিকে ঘৃণার বীজ নিক্ষেপ না করে, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ বিস্তার না করে সকল দেশের লোকই চিন্তা করবে--সবই তিনি। যা-কিছু দেখছ বা অনুভব করছ, সবই তিনি। তোমার মধ্যে মন্দ না থাকলে তুমি কেমন করে মন্দ দেখবে? তোমার মধ্যে চোর না থাকলে তুমি কেমন করে চোর দেখবে? তুমি নিজে খুনী না হলে খুনীকে দেখবে কিভাবে? ভাল হও, সমস্ত মন্দ তোমার কাছে তিরোহিত হয়ে যাবে। এইভাবে সমস্ত জগৎ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই হল প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির মহৎ লাভ--সমাজের পক্ষে, এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষে।[৭৫]

আলো--আলো নিয়ে এসো। প্রত্যেকের কাছে জ্ঞানের আলো নিয়ে এসো। যতদিন না সকলেই ভগবান লাভ করে, ততদিন তোমাদের কাজ শেষ হবে না। দরিদ্রের কাছে আলো নিয়ে চলো, ধনীর কাছে নিয়ে এসো আরও অধিক আলো --কারণ দরিদ্রের চেয়ে তার আলোর প্রয়োজন বেশী। অশিক্ষিত-মূর্খের কাছে আলো নিয়ে চলো; শিক্ষিতের কাছে নিয়ে এসো আরও অধিক আলো--কারণ, শিক্ষার অভিমান আজ বড়ই প্রবল। এইভাবে সবার কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দাও--বাকি যা, তা প্রভুই করবেন, কারণ তিনিই তো বলেছেন, 'কাজেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।'[৭৬]

চাই আত্মবিশ্বাস

বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—উন্নতি-লাভের এই একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করেছে তার সব-গুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হবে না।[১]

পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছু করতে পারো। অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করতে যথোচিত যত্নবান হও না বলেই বিফল হও। যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তার বিনাশ হয়।[২]

যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলতঃ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। নতুন ধর্ম বলছেঃ যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক।[৩]

কখনও ভেবো না, আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব। এমন বলা ভয়ানক নাস্তিকতা। যদি পাপ বলে কিছু থাকে, তবে 'আমি দুর্বল' বা 'ওরা দুর্বল' —এমন বলাই একমাত্র পাপ।[৪]

তুমি যা চিন্তা করবে, তাই হয়ে যাবে। যদি তুমি নিজেকে দুর্বল ভাবো, তবে দুর্বল হবে। তেজস্বী ভাবলে তেজস্বী হবে।[৫]

ব্যর্থতা, ভুল থাকলই বা; গরুকে কখনও মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি, কিন্তু সে চিরকাল গরুই থাকে, কখনই মানুষ হয় না। অতএব বারবার বিফল হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নেই; হাজারবার ঐ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ কর, আর যদি হাজারবার অকৃতকার্য হও, আর একবার চেষ্টা করে দেখ।[৬]

মানুষকে সবসময় তার দুর্বলতার বিষয় ভাবতে বলা তার দুর্বলতার প্রতিকার নয়; তার শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই প্রতিকারের উপায়।[৭]

হে আমার যুবক বন্ধুরা, তোমরা সবল হও—তোমাদের কাছে এই আমার

বক্তব্য। গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হবে। আমাকে অতি সাহসের সঙ্গে এ-কথাগুলো বলতে হচ্ছে; কিন্তু না বললেই নয়। আমি তোমাদের ভালবাসি। আমি জানি, সমস্যাটা কোথায়। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হলে তোমরা গীতা আরও ভালো বুঝবে।[৮]

জীবনের পরম সত্য এইঃ শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ, শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; দুর্বলতাই মৃত্যু।[৯]

সাফল্য লাভ করতে হলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করব। আমার ইচ্ছা-মাত্রে পর্বত চূর্ণ হয়ে যাবে।' এমন তেজ, এমন সংকল্প আশ্রয় করে খুব দৃঢ়-ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হবে।[১০]

নিরাশ হয়ো না; পথ বড় কঠিন—যেন ক্ষুরধারের মতো দুর্গম; তা হলেও নিরাশ হয়ো না; ওঠো—জাগো এবং তোমাদের চরম আদর্শে উপনীত হও।[১১]

যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর; বলি, প্রথমে নিজেকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out.[১২]

সাহস অবলম্বন কর। আমার দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা বড় বড় কাজ হবে, এই বিশ্বাস রাখো। ভগবান বড় বড় কাজ করবার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট করেছেন, আমরা তা করব।[১৩]

যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদ-মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।[১৪]

নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও—প্রাণের ভয় পর্যন্ত রাখিও না। ধর্মের মতামত

লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্যন্ত পাপচিন্তা আসিতে দেয় না।[১৫]

সকলকে গিয়ে বল্—'ওঠো, জাগো, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, একথা বিশ্বাস করো, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।'[১৬]

সিংহ-গর্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর্, জীবকে অভয় দিয়ে বল্—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—Arise! Awake! and stop not till the goal is reached.—(ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পেঁছনো পর্যন্ত থেমো না)।[১৭]

বলো, আমি যে কষ্ট ভোগ করছি, তা আমারই কৃতকর্মের ফল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমার দ্বারাই এই দুঃখ-কষ্ট দূর হবে। আমি যা সৃষ্টি করেছি, তা আমিই ধ্বংস করতে পারি।...অতএব ওঠো, সাহসী হও, বীর্যবান হও। সব দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ করো—জেনে রাখো, তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা। তুমি যে শক্তি বা সাহায্য চাও, তা তোমার ভিতরেই রয়েছে।[১৮]

আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ করতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কাজে পরিণত করা হত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট আছে, সেগুলোর বেশীরভাগই দূর হত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ নরনারীর মধ্যে যদি কোন প্রেরণা অধিকতর শক্তি সঞ্চার করে থাকে, তা আত্মবিশ্বাস।[১৯]

বিশ্বাস, সহানুভূতি—অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি!...তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত।...এগিয়ে যাও।...পিছনে চেয়ো না। কে পড়ল দেখতে যেয়ো না—এগিয়ে যাও—সামনে, সামনে! এইভাবেই আমরা অগ্রসর হব—একজন পড়বে, আর একজন তার জায়গা নেবে।[২০]

হীন কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং তা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন। যখন মানুষ নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে, তখন বুঝতে হবে—তার উপর শেষ আঘাত পড়েছে।...অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষদের নামে লজ্জা পেয়ো না বরং তাঁদের নামে গৌরব অনুভব কর; আর অনুকরণ কোরো না, অনুকরণ কোরো

না। যখনই তোমরা অন্যের ভাবানুসারে পরিচালিত হবে, তখনই তোমরা নিজেদের স্বাধীনতা হারাবে। এমনকি, আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি তোমরা অন্যের আজ্ঞায় কাজ কর, তোমরা সব শক্তি, এমনকি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলবে।

তোমাদের ভিতরে যা আছে, নিজের শক্তিতে তা প্রকাশ কর, কিন্তু অনুকরণ কোরো না; অথচ অন্যের যা ভালো তা গ্রহণ কর। আমাদের অন্যের কাছে শিখতে হবে।...অবশ্যই অন্যের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে; যে শিখতে চায় না, সে তো আগেই মরেছে।[২১]

দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়ী হও এবং প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখো। কাজে লাগো।...আমাদের কাজের এই মূল কথাটা সবসময় মনে রাখবে—'ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি বিধান'। মনে রাখবে দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হচ্ছে। কিন্তু হায়, কেউই এদের জন্য কিছুই করেনি।...তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করে তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাতে পারো? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কাজ ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম-বিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু (ভারতীয়) হতে পারো? এটাই করতে হবে এবং আমরাই তা করব। তোমরা সবাই সেজন্যই এসেছ। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখো।[২২]

চাই পূর্ণ সরলতা, পবিত্রতা, প্রকাণ্ড বুদ্ধি এবং সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি। এইসব গুণ আছে এরকম মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকও যদি কাজে লাগে, তবে দুনিয়া ওলটপালট হয়ে যাবে।[২৩]

নিজের উপর বিশ্বাস-সম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্যবান হও। এটাই আমাদের এখন দরকার।[২৪]

যদি কোন ব্যক্তি দিনরাত নিজেকে দীন দুঃখী হীন ভাবে, সে হীনই হয়ে যায়। তুমি যদি বল—'আমার মধ্যেও শক্তি আছে', তোমার ভিতর শক্তি জাগবে; আর যদি তুমি বল—'আমি কিছু নই', ভাব যে, তুমি কিছুই নও, দিনরাত যদি ভাবতে থাক যে তুমি কিছুই নও, তবে তুমিও 'কিছু না' হয়ে যাবে। ...আমরা সেই সর্বশক্তিমানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ। আমরা 'কিছু না' কিরূপে হতে পারি? আমরা সব করতে প্রস্তুত, সব করতে পারি, আমাদেরকে সব করতেই হবে।[২৫]

যদি জড়-জগতে বড় হতে চাও, তবে বিশ্বাস কর—তুমি বড়। আমি হয়তো ছোট্ট একটা বুদ্বুদ, আর তুমি হয়তো পাহাড়ের মতো বিশাল ঢেউ, কিন্তু জেনো আমাদের উভয়েরই পিছনে অনন্ত সমুদ্র রয়েছে; অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখান থেকে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস কর।[২৬]

জাতীয় সংহতি

কেন সংহতি চাই

আমার মনে অথর্ববেদ-সংহিতার সেই অপূর্ব শ্লোক ভেসে উঠছে—'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্/দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে'—তোমরা সকলে এক-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হও, কারণ প্রাচীনকালে দেবতারা একমনা হয়েই তাঁদের যজ্ঞভাগ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দেবতারা একচিত্ত ছিলেন বলেই মানুষের উপাসনার যোগ্য হয়েছেন। একচিত্ত হওয়াই সমাজগঠনের রহস্য। আর যতই তোমরা আর্য-দ্রাবিড়, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদে ব্যস্ত থাকবে, ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের উপযোগী শক্তিসংগ্রহ থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। কারণ, এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য কোরো যে, ভারতের ভবিষ্যৎ এরই উপর নির্ভর করছে। এই ইচ্ছাশক্তিগুলোর একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ—এ-ই হচ্ছে রহস্য। চীনাদের প্রত্যেকের মনের ভাব আলাদা আলাদা, আর মুষ্টিমেয় কয়েকটা জাপানী একচিত্ত—এর ফল কি হয়েছে, তা তোমরা জান। জগতের ইতিহাসে চিরকালই এরকম হয়ে থাকে।...

এইসব মত-বিরোধের ইতি করতে হবে।[১]

পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে স্বামীজী

এই সেই বীরভূমি—যা যতবার এই দেশ অসভ্য বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত

হয়েছে, ততবারই বুক পেতে প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করেছে। এই সেই ভূমি—এত দুঃখ-নির্যাতনেও যার গৌরব ও তেজ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়নি।

এই ভারতবর্ষেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দয়াল নানক তাঁর অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলে, বাহু প্রসারিত করে সমগ্র জগৎকে—শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানদের পর্যন্ত—আলিঙ্গন করতে ছুটেছিলেন।

এই ভারতবর্ষেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্বিত বীরদের অন্যতম গুরু গোবিন্দসিংহ জন্মগ্রহণ করেন—যিনি ধর্মের জন্য নিজের এবং নিজের প্রাণপ্রিয় আত্মীয়দের পর্যন্ত রক্তপাত করেছিলেন, এবং যাদের জন্য এই রক্তপাত করলেন, তারাই যখন তাঁকে পরিত্যাগ করল, তখন তিনি মর্মাহত সিংহের মতো দক্ষিণদেশে গিয়ে নির্জনে বাস করতে থাকলেন। এবং নিজের দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ না করে, বিন্দুমাত্র অসন্তোষের ভাব প্রকাশ না করে নিঃশব্দে মর্তধাম থেকে অপসৃত হলেন।

হে পঞ্চনদের সন্তানগণ....আমি আপনাদের কাছে আচার্য হিসেবে উপস্থিত হইনি—কারণ আপনাদের শেখানোর মতো জ্ঞান আমার খুব কমই আছে। আমি এসেছি—দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলের ভাইদের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করতে এবং পরস্পরের ভাব মিলিয়ে নিতে। আমি এখানে এসেছি—আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তা বের করার জন্য নয়; আমি এসেছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তারই সন্ধানে।

কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করলে আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে যে-বাণী অনন্তকাল ধরে আমাদের আশার কথা শুনিয়ে এসেছে, তা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে পারে, তা বুঝবার চেষ্টা করতে আমি এখানে এসেছি। আমি এখানে এসেছি—আপনাদের কাছে কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব করতে, কিছু ভাঙবার পরামর্শ দিতে নয়। ...সমালোচনার দিন চলে গেছে, আমরা এখন কিছু গড়বার জন্য অপেক্ষা করছি।...

আপনাদের বলতে চাই যে, আমি কোন দল বা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নই। আমার চোখে সব সম্প্রদায়ই মহান। আমি সব সম্প্রদায়কেই ভালবাসি। এবং

সারা জীবন ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যা সত্য, যা উপাদেয়, তা-ই খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে আসছি।...

যদি পারি—আমাদের পরস্পরের মিলনভূমি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করব। আর যদি ঈশ্বরের কৃপায় তা সম্ভব হয়, তবে ঐ তত্ত্ব কাজে পরিণত করতে হবে।...

এদেশে সম্প্রদায়ের অভাব নেই। এখনই যথেষ্ট আছে, আর ভবিষ্যতেও অনেক হবে।...সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক।

সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা জগতের কোন উন্নতি হবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকলে জগৎ চলতে পারে না। একদল লোক তো সব কাজ করতে পারে না। অসীমপ্রায় শক্তি অল্প কয়েকটা লোকের দ্বারা কখনই পরিচালিত হতে পারে না। এই বিষয়টা বুঝলেই আমরা বুঝব, কি প্রয়োজনে আমাদের ভেতর এই শ্রমবিভাগ অর্থাৎ এই সম্প্রদায়ের ভেদ অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে।

বিবিধ আধ্যাত্মিক শক্তির সুপরিচালনার জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু আমাদের পরস্পরের বিবাদ করবার কি প্রয়োজন? আমাদের সুপ্রাচীন শাস্ত্রগুলি কি ঘোষণা করছে না যে, এই ভেদ আপাতপ্রতীয়মান, এই সমস্ত আপাত বিভিন্নতা সত্ত্বেও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলনের স্বর্ণসূত্র বিদ্যমান?...

কেউ যদি সাম্প্রদায়িক বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করুনঃ তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করেছ?...যদি না করে থাক, তবে তাঁকে প্রচার করবার তোমার কি অধিকার?...সকলকেই নিজের নিজের সাধন-প্রণালী অবলম্বন করে প্রত্যক্ষানুভূতির দিকে অগ্রসর হতে দিন, সকলেই নিজের নিজের হৃদয়ে সেই সত্য দর্শন করতে চেষ্টা করুক। আর যখনই তারা সেই অপার অনাবৃত সত্য দর্শন করবে, তখনই তারা সেই অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পাবে—...তখন সেই হৃদয় থেকে প্রেমের বাণীই শুধু উৎসারিত হয়ে চলবে, কারণ যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ—তিনি তখন সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। তখন—কেবল তখনই সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিবাদ অন্তর্হিত হবে।[২]

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রশ্নে

বেদান্তের আধ্যাত্মিক উদারতা মুসলমান-ধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতের মুসলমান-ধর্ম অন্যান্য দেশের মুসলমান-ধর্ম থেকে

সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। অপর দেশ থেকে মুসলমানেরা এসে যখন তাদের ভারতীয় সমধর্মীদের বলে—তোমরা কেন বিধর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে আছ—তখনই কেবল এখানকার অশিক্ষিত গোঁড়া মুসলমানেরা উত্তেজিত হয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে থাকে।[৩]

অদ্বৈতবাদকে বেদান্ত বা অন্য যে-কোন নামে চিহ্নিত করি না কেন, আসল কথা এই যে, তা ধর্মের ও চিন্তার শেষ কথা এবং কেবল অদ্বৈতভূমি থেকেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চোখে দেখতে পারে। আমার বিশ্বাস, অদ্বৈতবাদই ভবিষ্যতের আলোকপ্রাপ্ত মানব সমাজের ধর্ম। হিন্দুরা অন্যান্য জাতির চেয়ে আগে ঐ তত্ত্বে পৌঁছনোর গৌরব পেতে পারে, কারণ তারা হিব্রু বা আরবজাতিগুলোর চেয়ে প্রাচীনতর কিন্তু কর্মপরিণত বেদান্ত- যা সমস্ত মানবজাতিকে নিজের আত্মা বলে দেখে—তা হিন্দুদের মধ্যে কখনই বাস্তবে পুষ্টিলাভ করেনি।

অন্যদিকে আমার অভিজ্ঞতা এই—যদি কোন ধর্মের মানুষ এই সাম্যকে যথেষ্ট পরিমাণে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এনে থাকতে পারে—তা একমাত্র ইসলামধর্মাবলম্বীরাই পেরেছে। আবার, এই আচরণের যে নিগূঢ় অর্থ, এবং এর ভিত্তিমূলে যেসব তত্ত্ব আছে, সে-সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা পরিষ্কার—ইসলামপন্থীরা সে-বিষয়ে সাধারণত সচেতন নন।

এইজন্য আমার দৃঢ় ধারণা—বেদান্ত মত যত সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হোক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সাহায্য ছাড়া তা বিশাল জনসমষ্টির কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে চাই—যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই—অথচ সে-কাজ করতে হবে বেদ, বাইবেল ও কোরানকে সমন্বিত করেই। মানবজাতিকে এইকথাই শেখাতে হবে যে, প্রচলিত ধর্মগুলো সেই অভেদরূপী নিত্যধর্মেরই অংশ। এই শিক্ষা পেলেই মানুষ নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী নিজের ধর্ম বেছে নেবে।

আমাদের নিজের মাতৃভূমির পক্ষে—হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম—এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা দূর করে ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহা মহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছে।[৪]

ভারতবর্ষের বাহ্যিক রূপের বিভিন্নতা এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার উপায়

সত্যিই ভারতবর্ষ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি-আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধ বানরের কঙ্কালটাও এখানে পাওয়া যাবে। ডোলমেনদেরও অভাব নেই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যে-কোন জায়গায় খুঁড়লেই মিলবে। হ্রদবাসী বা নদীতীরবাসীরা নিশ্চয়ই কোন সময় এখানে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্রসজ্জাকারী, তৎসহ বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও নানা অঞ্চলে দেখা যাবে। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্রও উপস্থিত। এদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের তথাকথিত নানা আর্য শাখা-প্রশাখা মিলিত। পারসিক, গ্রীক, ইয়ুৎচি, হূন, চীন, সীথিয়ান—অসংখ্য জাতি মিলিত মিশ্রিত। ইহুদী, আরব, মঙ্গোলীয় থেকে আরম্ভ করে স্ক্যান্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি, যারা এখনও একাত্ম হয়ে যায়নি—এইসব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিম্নে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করে আবার শান্ত হচ্ছে। ভারতবর্ষের এ-ই হল ইতিহাস।[৫]

জাতির অবান্তর বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসনপ্রণালী—এই সমস্ত নিয়েই একটা জাতি গঠিত। যদি একটা একটা করে জাতি নিয়ে আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে, অন্যান্য জাতি যেসব উপাদানে তৈরী সেগুলো সংখ্যায় ভারতীয় জাতির চেয়ে অল্প। আর্য, দ্রাবিড়, তাতার, তুর্ক, মোগল, ইউরোপীয়—পৃথিবীর সব জাতির রক্ত যেন এদেশে আছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ আর আচার-ব্যবহারে দুটি ভারতীয় শাখাজাতির যে প্রভেদ—ইউরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও তত প্রভেদ নেই।

কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য—আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, ঐ ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করতে হবে। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐ ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত-গঠনে ধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যভাবে প্রয়োজন।[৬]

এশিয়ায়—বিশেষত ভারতবর্ষে জাতি, ভাষা, সমাজ-বিষয়ক সমস্ত বাধা

ধর্মের সমন্বয়ীশক্তির কাছে তিরোহিত হয়। আমরা জানি, ভারতবাসীর ধারণা—আধ্যাত্মিক আদর্শের থেকে বড় আদর্শ আর কিছু নেই; এটিই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর এও জানি—আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কাজ করতে পারি।

ধর্ম যে সর্বোচ্চ আদর্শ—এ তো সত্যিই। কিন্তু আমি এখানে সেকথা বলছি না। আমি বলছিঃ ভারতবর্ষে কাজ করবার পক্ষে ধর্মই একমাত্র উপায়।...ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়-সাধনই ভবিষ্যৎ ভারতগঠনের প্রথম কর্মসূচী...।[৭]

জাতীয় কল্যাণের জন্য চিরকালই—অতীতকালে যেমন, বর্তমানকালেও তেমনি—প্রথমেই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তিটি। ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে একত্র করাই ভারতের জাতীয় একত্বসাধনের একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষে একটি অখণ্ড জাতি গড়ে উঠবে তাদেরই সমবায়ে যাদের হৃদয়তন্ত্রী একই আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা।[৮]

খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলো গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং নিজের বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজের প্রকৃতি অনুসারে বেড়ে উঠবে।[৯]

সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক।[১০]

আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলো যতই বিভিন্ন হোক, তাদের যতই বিভিন্ন দাবি থাকুক, কতগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে—যেগুলি সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ই একমত।...ঐগুলো স্বীকার করবার পর আমাদের ধর্ম সব সম্প্রদায় ও সব ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করবার, ইচ্ছামতো চিন্তা ও কাজ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। আমরা সবাই তা জানি, অন্তত আমাদের মধ্যে যাঁরা একটু চিন্তাশীল, তাঁরাই এটি জানেন। আমরা চাই—আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বগুলি সকলের কাছে, এই দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের কাছে প্রচারিত হোক, সকলেই সেগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করবার চেষ্টা করুক। সুতরাং এ-ই আমাদের প্রথম কর্তব্য।[১১]

যেসব বিষয়ে আমরা সকলেই একমত, সেগুলো প্রচার করা হোক; যেসব বিষয়ে মতভেদ আছে সেগুলো আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।...কোন ঘরে যদি বহু শতাব্দীর অন্ধকার থাকে, এবং যদি আমরা সেই ঘরে গিয়ে ক্রমাগত চিৎকার করে বলতে থাকি, 'উঃ কি অন্ধকার! কি অন্ধকার!'—তবে কি অন্ধকার দূর হয়ে যাবে? আলো নিয়ে এস, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলে যাবে।[১২]

আলোর দিশারি যাঁরা

দু-রকম শাস্ত্র : শ্রুতি এবং স্মৃতি

আমাদের শাস্ত্রে দু-ধরনের সত্যের কথা আছে। প্রথমটা সনাতন সত্য; আর একটি সত্য অতটা প্রামাণিক না হলেও বিশেষ বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী প্রযোজ্য। সনাতন সত্য—অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং এদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি শ্রুতি বা বেদে লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্য যে-শাস্ত্রগুলোতে পাওয়া যায় তাকে স্মৃতি বলে—যেমন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সংহিতা, এবং পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি। এগুলির প্রামাণ্য শ্রুতির অধীন, কারণ স্মৃতি যদি শ্রুতির বিরোধী হয়, তবে শ্রুতিকেই সেক্ষেত্রে মানতে হবে; এই হল শাস্ত্রের বিধান। বেদ বা শ্রুতিতে মানুষের নিয়তি এবং জীবনলক্ষ্য সম্বন্ধে মূল সত্যগুলি সব বর্ণনা করা আছে; কেবল খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলির বর্ণনা স্মৃতি ও পুরাণে আছে। সাধারণভাবে উপদেশ দিতে শ্রুতিই যথেষ্ট। ধর্মজীবন-যাপনের জন্য এর বেশী আর কিছু বলবার নেই, জানবারও নেই। এ-বিষয়ে যা প্রয়োজন সবই শ্রুতিতে আছে; জীবাত্মার সিদ্ধি-লাভের জন্য যেসব উপদেশের প্রয়োজন শ্রুতিতে সেগুলি সবই আছে। কেবল বিভিন্ন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ অবস্থার বিধান শ্রুতিতে নেই। স্মৃতি এই কাজটা করেছে—বিভিন্ন সময়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা স্মৃতি দিয়ে গেছে। শ্রুতির আর একটা বিশেষত্ব আছে। শ্রুতির সত্যগুলির পেছনে অনেক ঋষি রয়েছেন—তাঁদের অধিকাংশই পুরুষ, কয়েকজন নারীও আছেন। তাঁদের ব্যক্তি-গত জীবন সম্বন্ধে—যেমন, তাঁদের জন্মের সন তারিখ সম্বন্ধে আমরা খুব সামান্যই জানতে পারি। কিন্তু তাঁদের সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা—তাঁদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বললেই ভাল হয়—তা আমাদের পবিত্র ধর্মসাহিত্য বেদে সংরক্ষিত আছে। স্মৃতিতে কিন্তু মহাপুরুষদের জীবনী এবং কার্যকলাপই বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। ইঙ্গিতমাত্রই গোটা জগৎকে নাড়া দিতে পারেন, এমন অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহাপুরুষদের পরিচয় আমরা পুরাণ বা স্মৃতিতেই

সর্বপ্রথম পেয়ে থাকি। তাঁদের চরিত্র এত উন্নত যে তাঁদের উপদেশগুলিও কখনও কখনও তার কাছে সামান্য বলে মনে হয়। ...কিন্তু শ্রুতি বা বেদই আমাদের ধর্মের মূল। তাতে ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণা নেই। ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণা, অবতার, আচার্য বা মহাপুরুষদের বিষয় আমরা পাই স্মৃতি ও পুরাণে।[১]

ঋষি কারা

বেদান্ত নামক জ্ঞানভাণ্ডারের আবিষ্কর্তা কিছু মহামানব যাঁদের আমরা ঋষি বলি। ঋষিদের বলা হয় মন্ত্রদ্রষ্টা। তাঁরা যেন এক একটি চিন্তাকে দর্শন করেছেন। কিন্তু এরকম কখনও নয় যে, ঐ চিন্তাগুলি তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টি। যখনই আমরা দেখব, বেদের অমুক অংশটি অমুক ঋষির কাছ থেকে এসেছে, তখন যেন আমরা ভুল করে ভেবে না বসি যে, ঐ ঋষিই ঐ অংশটি নিজের মন থেকে লিখেছেন বা সৃষ্টি করেছেন। ঐ চিন্তাটি জগতে অনাদিকাল থেকেই ছিল। ঋষি সেটিকে দর্শন করেছেন, আবিষ্কার করেছেন মাত্র। ঋষিরা আধ্যাত্মিক সত্যের আবিষ্কর্তা।[২]

ঋষি কারা? ...তিনিই ঋষি, যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন, যাঁর কাছে ধর্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগ্‌বিতণ্ডা বা তর্কযুক্তি নয়—সাক্ষাৎ উপলব্ধি; অতীন্দ্রিয় সত্যের ঠিক যেন মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। ...উপনিষদে বলা হয়েছেঃ এঁরা সাধারণ মানুষ নন, মন্ত্রদ্রষ্টা। ...এই হল ঋষিত্ব।[৩]

চেতনা পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্য লাভ করতে হলে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বাইরে যেতেই হবে। আর এখনও এমন সব মানুষ আছেন, যাঁরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরে যেতে পারেন। এঁদেরকেই ঋষি বলা হয়। তাঁরা ঋষি—কারণ, তাঁরা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন, যেন মুখোমুখি সাক্ষাৎ করেন। সুতরাং আমার সামনের এই টেবিলকে যেমন আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জানতে পারি, বেদের সত্যগুলির প্রমাণও তেমনি প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া সম্ভব। টেবিলটিকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করি, আর আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকেও আমরা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করি ইন্দ্রিয়াতীত অতি-চেতন অবস্থায়। এই ঋষিত্ব লাভ দেশ-কাল-জাতি বা স্ত্রী-পুরুষ ভেদের উপর

নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন ঋষি নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করেছেন: এই ঋষিত্ব ঋষির বংশধরদের, আর্য-অনার্য, এমনকি ম্লেচ্ছদেরও সাধারণ সম্পত্তি।

বেদের ঋষিত্ব বলতে এটাই বুঝায়। আমাদেরকে ভারতীয় ধর্মের এই আদর্শ সর্বদা মনে রাখতে হবে। আর আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, জগতের অন্যান্য জাতিও এই আদর্শটি স্মরণ রাখবেন, তাহলেই ধর্মে ধর্মে বিবাদ-বিসংবাদ কমে যাবে। শাস্ত্রপাঠ করলেই ধর্ম হয় না; বা মত-মতান্তর ও বচন দ্বারা, এমনকি যুক্তিতর্ক-বিচার দ্বারাও ধর্মলাভ হয় না। ধর্ম হচ্ছে 'হওয়ার চেষ্টা করা' এবং 'হয়ে যাওয়া'। (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সত্যে পৌঁছনোর চেষ্টা এবং পরিণতিতে সত্য-স্বরূপ হয়ে যাওয়া।) ...যতদিন না তোমরা প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে ঋষি হয়ে উঠছ, ততদিন তোমাদের ধর্মজীবন আরম্ভই হয়নি বুঝতে হবে।[৭]

কোন সেনাপতি বা রাজা কখনও আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, ঋষিরাই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা। ...আর এই ঋষিত্বলাভ কোন দেশ-কাল-জাতি বা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া নয়। বাৎস্যায়ন ঋষি বলেছেন—সত্যের সাক্ষাৎকার করতে হবে।' আমাদের সকলকেই ঋষি হতে হবে। আমাদের অগাধ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হতে হবে। আমরাই সমগ্র জগতে শক্তিসঞ্চার করব; কারণ সব শক্তিই আমাদের ভিতরে। আমাদেরকে ধর্ম প্রত্যক্ষ করতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। তবেই ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। তখনই ঋষিত্বের উজ্জ্বল জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে আমরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষত্ব লাভ করব। তখনই আমাদের মুখ থেকে যে-বাণী নির্গত হবে, তা অব্যর্থ, অমোঘ ও শক্তিসম্পন্ন হবে।[৭]

শ্রুতি এবং ধর্মাচার্যগণ

আমাদের ধর্ম ছাড়া জগতের আর প্রত্যেকটি ধর্মই একজন বা কয়েকজন ধর্মপ্রবর্তকের জীবনের উপর নির্ভরশীল। খ্রীষ্টধর্ম যীশুখ্রীষ্টের, মুসলমান-ধর্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের, জৈনধর্ম জিনদের এবং অন্যান্য ধর্ম অন্যান্য ব্যক্তিদের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর ফলে স্বভাবতই ঐসব মহা-পুরুষদের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নিয়ে ঐ ধর্মগুলিতে যথেষ্ট ঝগড়া-বিবাদ

রয়েছে। এইসব প্রাচীন মহাপুরুষরা অতীতকালে সত্যিই ছিলেন কিনা এ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমর্থন কখনও যদি দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাহলেই ঐসব ধর্মের সৌধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমরা এই বিপদ এড়াতে পেরেছি —কারণ, আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবিশেষের উপরে নয়, তত্ত্বের উপরে। কোন মহাপুরুষ, এমনকি কোন অবতার বলে গেছেন বলেই যে আমরা ধর্ম মেনে চলি, তা নয়। বেদের প্রামাণিকতা কৃষ্ণের অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু বেদ-অনুসারী বলেই কৃষ্ণ-বাণীর প্রামাণ্য। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, বেদের যত প্রচারক হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অবতার ও মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও একই কথা।[৬]

আমরা প্রথমেই ধরে নিই যে, মানুষের পূর্ণতা এবং মুক্তিলাভের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সবই বেদে আছে। এর বাইরে নতুন আর কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত জ্ঞানের পরিণতি একত্ব-উপলব্ধিতে। সেই একত্ব-উপলব্ধির কথা বেদে বর্ণিত আছে এবং সেই উপলব্ধিকে অতিক্রম করে যাওয়া অসম্ভব। যখনই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য (তৎ-ত্বম্-অসি—তুমিই সেই পরম সত্য) আবিষ্কৃত হয়েছে, তখনই সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করেছে; এবং সেই জ্ঞানই বিধৃত রয়েছে বেদে। তাহলে বাকি থাকল কি? বাকি থাকল শুধু—বিভিন্ন যুগে স্থান, কাল, পরিস্থিতি এবং পরিবেশের পার্থক্যের সঙ্গে খাপখাইয়ে মানুষকে সেই সনাতন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে পরিচালিত করা। মানুষকে সেই সুপ্রাচীন পথ ধরেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে; এবং সেই উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত হয়ে থাকেন এইসব ধর্মাচার্য এবং মহাপুরুষরা। এই ব্যাপারটি গীতায় শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসিদ্ধ উক্তিটির মাধ্যমে যেমন পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে আর কোথাও সেরকম হয়নিঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

—যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই সৎ লোকের রক্ষার জন্য আমি অবতীর্ণ হই; সমস্ত দুর্নীতির বিনাশের জন্য সময়ে সময়ে আমি আবির্ভূত হই, ইত্যাদি। এই হল ভারতীয় ধারণা।[৭]

আমাদের ঈশ্বর যেমন নির্গুণ অথচ সগুণ, আমাদের ধর্মও অনুরূপ। আমাদের ধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর না করলেও এতে অনন্ত

অবতার ও অসংখ্য মহাপুরুষের স্থান হতে পারে। আমাদের ধর্মে যত অবতার, মহাপুরুষ বা ঋষি আছেন, আর কোন্ ধর্মে এত আছেন? শুধু তাই নয়, আমাদের ধর্ম বলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আরও অনেক অবতার-মহাপুরুষের অভ্যুদয় হবে। ভাগবতে আছে—'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ'। সুতরাং এই ধর্মে নতুন নতুন ধর্মপ্রবর্তক, অবতার ইত্যাদিকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।"

আমাদের ঋষিরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগতের অধিকাংশ লোকই কোন-না-কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর না করে থাকতে পারে না। সাধারণ মানুষের কোন-না-কোন আকারে একটি ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর চাই-ই। যে বুদ্ধদেব ব্যক্তি-ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করে গেলেন, তাঁর দেহত্যাগের পর পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতেই তাঁর শিষ্যরা তাঁকেই 'ঈশ্বর' করে তুলল। ব্যক্তি-ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে।

আমরা জানি, কাল্পনিক ঈশ্বরের চেয়ে...মহত্তর জীবন্ত ঈশ্বরেরা মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যেই নেমে এসে আমাদের সঙ্গে বাস করেন, আমাদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়ান। যে-কোন কাল্পনিক ঈশ্বরের চেয়ে—কল্পনা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে যত উঁচু ধারণা করতে পারি তার চেয়েও—তাঁরা অনেক বেশী পূজনীয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যতটা ধারণা করতে পারি, তার চেয়েও শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়। আমরা আমাদের মনে যতদূর উঁচু আদর্শের চিন্তা করতে পারি, বুদ্ধ তার চেয়েও অনেক উঁচু আদর্শ—উঁচু এবং জীবন্ত আদর্শ। সেইজন্যই সর্বপ্রকার কাল্পনিক দেবতাকেও অতিক্রম করে চিরকাল তাঁরা মানুষের পুজো পেয়ে আসছেন। আমাদের ঋষিরা তা জানতেন, সেইজন্যই তাঁরা সকল ভারতবাসীর জন্য এই মহাপুরুষ-উপাসনার—এই অবতার-পূজার পথ খুলে দিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেনঃ

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্॥

—যে মানুষের মধ্যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হয়, জেনো সেখানে আমি আছি; আমার মধ্যে থেকেই সেই আধ্যাত্মিক প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে হিন্দুদের পক্ষে সব দেশের সব অবতার উপাসনা করবার দ্বার খুলে

দেওয়া হয়েছে। হিন্দু যে-কোন দেশের যে-কোন সাধু-মহাত্মার পুজো করতে পারে।[৯]

যে-কোন অবতারকেই তোমার জীবনের আদর্শ এবং বিশেষ উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করতে পার; এমনকি, তাঁকে সব অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠও মনে করতে পার, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু শাশ্বত সত্যগুলিই যেন তোমার ধর্মসাধনার অবলম্বন হয়।...যে-কোন অবতারই হোন না কেন, বেদের সনাতন তত্ত্বগুলির জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ বলেই তিনি আমাদের উপাস্য।[১০]

মহান আচার্যবৃন্দ

প্রতিটি জাতির আধ্যাত্মিক জীবনেই পর পর উত্থান ও পতন এসে থাকে। জাতির পতন হয়, মনে হয় সবকিছুই যেন ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু আবার সেই জাতি শক্তি সংগ্রহ করে, আবার তার উত্থান হয়। জাতির জীবনে নবজাগরণের মহাতরঙ্গ আসে; আর সেই তরঙ্গের শীর্ষদেশে সবসময়ই বিরাজ করেন একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ, ঈশ্বরের একজন বার্তাবহ। একদিকে তাঁর শক্তিতেই সেই তরঙ্গের, সেই জাতির অভ্যুত্থান, অন্যদিকে আবার যেসব শক্তি থেকে ঐ তরঙ্গের উদ্ভব, তিনি সেগুলোর ফলস্বরূপ।...সেই মহাপুরুষ তাঁর প্রবল শক্তি সমাজের উপর প্রয়োগ করেন,...এঁরাই জগতের মহান চিন্তা-নায়ক, প্রেরিতপুরুষ, মহাজীবনের বার্তাবহ—ঈশ্বরের অবতার।[১১]

রামচন্দ্র ও সীতা

রামচন্দ্র হলেন প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ, সত্যপরায়ণতার প্রতিমূর্তি, নৈতিকতার সাকার বিগ্রহ। আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, সর্বোপরি আদর্শ নৃপতি। মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপেই রামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কন করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।...

আর সীতার কথা কি বলব! তোমরা জগতের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য পড়ে শেষ করতে পার, জগতের ভাবী সাহিত্যগুলিও পড়ে শেষ করতে পার, কিন্তু তোমাদের নিঃসংশয়ে বলতে পারি, আর একটা সীতার চরিত্র বের করতে

পারবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ। ঐ চরিত্র একবারই চিত্রিত হয়েছে। আর কখনও হয়নি, হবেও না। রাম হয়তো কয়েকটি হয়েছেন, কিন্তু সীতা আর হয়নি। ভারতীয় নারীদের যেমন হওয়া উচিত, সীতা তার আদর্শ। নারী-চরিত্রের যত রকম ভারতীয় আদর্শ আছে সবই এক সীতাচরিত্র থেকে উদ্ভূত।[১২]

রাম ছিলেন বৃদ্ধ নৃপতির জীবনস্বরূপ; কিন্তু তিনি রাজা, সুতরাং তাঁকে অঙ্গীকার পালন করতেই হয়েছিল।[১৩]

সীতা সতীত্বের প্রতিমূর্তি; স্বীয় পতি ব্যতীত অপর কোন পুরুষের অঙ্গ তিনি কখনও স্পর্শ করেননি।

রাম বলেছিলেন, 'পবিত্র? সীতা পবিত্রতা স্বয়ং।'...

রাম দেহ বিসর্জন করে পরলোকে সীতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

সীতা পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত। ভারতবর্ষে যা-কিছু কল্যাণকর, বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সীতা বলতে তা-ই বুঝায়; নারীর মধ্যে নারীত্ব বলতে যা বুঝায়—সীতা তা-ই। সীতা ধৈর্যশীলা, সহিষ্ণু, চির-বিশ্বস্তা, চির-বিশুদ্ধা পত্নী। তাঁর সমস্ত দুঃখের মধ্যে রামের বিরুদ্ধে তিনি একটাও কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করেননি। সীতা কখনও আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করেননি। 'সীতা ভব'—সীতা হও।[১৪]

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন। তাঁর মধ্যে বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়েছিল, অথচ তাঁর অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বোঝা যেতে পারে না; কারণ তিনি তাঁর নিজের উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন। সব অবতারই—তাঁরা যা প্রচার করতে এসেছিলেন, তার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চিরজীবন সেই ভগবদ্‌গীতার সাকার বিগ্রহ হিসেবে বর্তমান ছিলেন—তিনি অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত। তিনি অনেককে রাজা করলেন, কিন্তু নিজে সিংহাসনে বসলেন না। যিনি সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁর কথায় রাজারা নিজের নিজের সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনি নিজে রাজা হতে চাননি। বাল্য-

কালে যিনি সরলভাবে গোপীদের সঙ্গে খেলা করতেন, জীবনের সব অবস্থাতেই তিনি সেই সরল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।

তাঁর জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে, যা অতি দুর্বোধ্য। যতক্ষণ না কেউ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্রস্বভাব হচ্ছে, ততক্ষণ তা বুঝবার চেষ্টা করা উচিত নয়।...কে গোপীদের সেই প্রেম-জনিত বিরহ-যন্ত্রণার ভাব বুঝতে পারে—যে-প্রেম প্রেমের চরম আদর্শ, যে-প্রেম আর কিছু চায় না, যে-প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে-প্রেম ইহলোক-পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না!...গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করতে চাইত না। তিনি যে সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে সর্বশক্তিমান—তা-ও তারা জানতে চাইত না। তারা কেবল বুঝত—তিনি প্রেমময়, এই তাদের কাছে যথেষ্ট। গোপীরা কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলেই বুঝত। বহু সেনাবাহিনীর নেতা রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাদের কাছে বরাবর সেই রাখালবালকই ছিলেন। 'আমি ধন-জন চাই না, বিদ্যাবুদ্ধি চাই না, এমনকি আমি স্বর্গেও যেতে চাই না। আমাকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হোক, কিন্তু হে ভগবান, তোমার প্রতি যেন আমার ভালবাসা থাকে—নিষ্কাম ভালবাসা, ভালবাসার জন্যই ভালবাসা।' ধর্মের ইতিহাসে এ এক নতুন অধ্যায়—অহৈতুকী ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম...। এই আদর্শের কথা প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে; এই মহান বাণী প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল এই ভারতভূমিতেই। এর ফলে ভয়ের ধর্ম, প্রলোভনের ধর্ম চিরকালের জন্য চলে গেল।...অহৈতুকী ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্মের আদর্শের অভ্যুদয় হল।...

এ-প্রেমের মহিমা কি আর বলব! এইটুকু শুধু বলতে চাই যে, গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন।...প্রথমে এই টাকা-পয়সা, নাম-যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখন, কেবলমাত্র তখনই তোমরা গোপী-প্রেম বুঝতে পারবে। এই প্রেম এত শুদ্ধ যে, সর্বস্ব ত্যাগ না করলে, চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হলে এ বোঝা যায় না। যাদের মনে সারাক্ষণ কাম-কাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠছে, তারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝতে চায়, এর সমালোচনা করতে চায়!

কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমনকি যাকে দর্শনশাস্ত্রের শিরোমণি বলা যায়, সেই গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব

প্রেমোন্মত্ততার সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াতে পারে না। কারণ গীতায় ধীরে ধীরে সেই পরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই গোপী-প্রেমের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেমের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততাই শুধু রয়েছে। এছাড়া আর কিছুই নেই। গুরু-শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ সব একাকার হয়ে গেছে; ঈশ্বর নেই, স্বর্গ নেই, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নেই। সব গেছে—আছে শুধু সেই প্রেমোন্মত্ততা। এই অবস্থায় সংসারের আর কিছুই মনে থাকে না। ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ, একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখে না। সব মুখ তার কাছে কৃষ্ণের মুখ। তার নিজের মুখও তাই। তার সর্বসত্তা তখন 'কৃষ্ণ'বর্ণে রঞ্জিত। শ্রীকৃষ্ণের এমনই মহিমা!

কৃষ্ণের জীবনচরিত্রে হয়তো অনেক ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য আছে, অনেক বিষয় হয়তো প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এ সবই হয়তো সত্যি, কিন্তু তাহলেও ঐসময়ে সমাজে যে এই অপূর্ব নতুন চিন্তাধারার অভ্যুদয় হয়েছিল, তার অবশ্যই ভিত্তি আছে। অন্য যে-কোন ধর্মাচার্যের জীবন আলোচনা করলেই দেখতে পাই, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কতগুলি ভাবের ক্রমবিকাশ মাত্র। তাঁর নিজের দেশে সেই সময়েই যেসব চিন্তা বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকেই তিনি শুধু প্রচার করে গেছেন। এমনকি, সেই মহাপুরুষ আদৌ ছিলেন কিনা, সে-সম্বন্ধেই বিরাট সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি--কেউ প্রমাণ করুক তো দেখি শ্রীকৃষ্ণের নামে প্রচলিত এই নিষ্কাম কর্ম এবং প্রেমের তত্ত্ব—জগতে অভিনব মৌলিক ভাব নয়? কাজেই, বোঝা যায়, কোন একজন ব্যক্তি নিশ্চয়ই ছিলেন যিনি এই তত্ত্বের জন্মদাতা। ঐ তত্ত্বগুলি অপর কারও কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মেনে নেওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় এই চিন্তাগুলি এমন কিছু ভারতের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল না। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর প্রথম প্রচারক, ঐ তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করলেন তাঁর শিষ্য বেদব্যাস।...

এবার আমরা একটু নীচের ধাপে নেমে গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করব।...গীতার মতো বেদের ভাষ্য আর কখনও হয়নি, হবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য বোঝা বড় কঠিন, কারণ ভাষ্যকারেরা সকলেই নিজে-দের মতানুযায়ী তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং শ্রুতির

বক্তা, সেই ভগবান নিজে এসে গীতার প্রচারক হিসেবে শ্রুতির অর্থ বুঝালেন। আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর যেমন প্রয়োজন, সমগ্র জগতে তার যেমন প্রয়োজন, আর কিছুরই তেমন নয়।...একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার হয়তো কোন উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন; উপনিষদে অনেক দ্বৈতভাবের কথা আছে, তিনি কোনরকমে সেগুলোকে ভেঙেচুরে তা থেকে নিজের মনোমত অর্থ বের করলেন। আবার কোন দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাকার যখন ব্যাখ্যা করবেন, তিনি অদ্বৈতভাবের অংশগুলোকে ভেঙেচুরে দ্বৈত অর্থ করবেন। কিন্তু গীতাতে কোথাও শ্রুতির তাৎপর্য এভাবে বিকৃত করবার চেষ্টা হয়নি।[১৫]

গীতার মূল বক্তা কৃষ্ণ।...অন্যান্য অবতারের উপাসকদের চেয়ে সম্ভবত কৃষ্ণ-উপাসকের সংখ্যাই ভারতে সবচেয়ে বেশী। কৃষ্ণভক্তরা বলেনঃ কৃষ্ণই অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেনঃ বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারের কথা ভেবে দেখ; তাঁরা সন্ন্যাসী ছিলেন, সুতরাং গৃহীদের সুখে-দুঃখে তাঁদের সহানুভূতি ছিল না; কি করেই বা থাকবে? কিন্তু কৃষ্ণের বিষয় আলোচনা করে দেখ, তিনি পুত্ররূপে, পিতারূপে, নৃপতিরূপে সব অবস্থাতেই আদর্শ চরিত্র দেখিয়েছেন। আর তিনি যে অপূর্ব উপদেশ প্রচার করে গেছেন, সারা জীবন নিজে তা আচরণ করে জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ 'যিনি প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে থেকেও মধুর শান্তি লাভ করেন, আবার গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যেও যিনি মহা কর্মশীল, তিনিই জীবনের যথার্থ রহস্য বুঝেছেন।' এই আদর্শ কিভাবে কাজে পরিণত হতে পারে, কৃষ্ণ তা দেখিয়ে গেছেন। এর উপায় অনাসক্তি। সব কাজ কর, কিন্তু কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে বেশী জড়িয়ে ফেলো না। তুমি সর্বদাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। কর্ম আমাদের দুঃখের কারণ নয়, আসক্তিই দুঃখের কারণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে অর্থের কথা ধরুন। ধনী হওয়া খুব ভাল কথা। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশ এই—অর্থ উপার্জন কর, টাকার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, কিন্তু তার প্রতি আসক্ত হয়ো না।—স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন, মান-যশ সবার সম্বন্ধেই একই কথা। এদের ত্যাগ করবার প্রয়োজন নেই, কেবল এটুকু লক্ষ্য রাখবেন যে, এদের প্রতি যেন আসক্ত হয়ে না পড়েন। আসক্তি বা অনুরাগের পাত্র কেবল একজন—স্বয়ং ভগবান, আর কেউ নয়। আত্মীয়স্বজনদের জন্য কাজ করুন, তাদের ভালবাসুন, তাদের ভাল করুন, যদি প্রয়োজন হয় তাদের জন্য

শত শত জীবন উৎসর্গ করুন, কিন্তু কখনও তাদের প্রতি আসক্ত হবেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিজের জীবনই এই উপদেশের যথার্থ দৃষ্টান্ত।[১৬]

বুদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের কিছু পরেই ভারতের ইতিহাসে এক শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হল। গীতাতেই দূরাগত ধ্বনির মতো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ-কোলাহল আমাদের কানে আসে।...সাম্প্রদায়িক বিরোধের দূর-শ্রুত অস্ফুট ধ্বনি তখন থেকেই শুনতে পাই। সম্ভবত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে এই বিরোধ কিছু সময়ের জন্য কমে এসেছিল, কিছুকালের জন্য সমন্বয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল--কিন্তু আবার বিরোধ বাধল। . . আমাদের সমাজের দুই প্রবল অঙ্গ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। এবং পরবর্তী সহস্র বৎসর ধরে যে মহান তরঙ্গ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেছিল, তার সর্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিমময় মূর্তি দেখতে পেলাম। তিনি আর কেউ নন--আমাদের গৌতম শাক্যমুনি।. .আমরা তাঁকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে পূজা করে থাকি। এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক এর আগে জগৎ দেখেনি। কর্মযোগীদের মধ্যে বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজের মতগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য নিজের শিষ্য হিসেবে (বুদ্ধরূপে) আবার আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১৭]

যে-যুগে বুদ্ধের জন্ম সে-যুগে ভারতবর্ষে একজন মহান ধর্মনেতার, একজন আচার্যের প্রয়োজন হয়েছিল। ততদিনে একটি খুব শক্তিশালী পুরোহিত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল।...পুরোহিতরা বিশ্বাস করত—ঈশ্বর এক-জন আছেন বটে, কিন্তু এই ঈশ্বরকে জানতে হলে একমাত্র তাদের সাহায্যেই জানতে হবে।...

প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পুরোহিতদের নির্দেশ অস্বীকার করে শুদ্ধ সত্য প্রচার করেছিলেন। পুরোহিতদের শক্তিকে তাঁরা নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু দু-পুরুষ যেতে না যেতেই তাঁদের শিষ্যরা ঐ পুরোহিতদেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুটিল পদ্ধতির

পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। নিজেরাই পুরোহিত-পর্যায়ে নেমে গিয়ে তাঁরাও বলতে লাগলেনঃ 'আমাদের মাধ্যমেই তোমাদের সত্যকে জানতে হবে।' এই-ভাবেই সত্যবস্তু আবার কঠিন স্ফটিকাকার ধারণ করল। সেই শক্ত আবরণ ভেঙে সত্যকে মুক্ত করবার জন্য ঋষিরা বারবার এসেছেন। সাধারণ মানুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি—দুই-ই সর্বদা থাকবে; নাহলে মানব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।...

পুরোহিতরাই শুধু সত্যের যোগ্য পুরুষ? সাধারণ মানুষ সত্যের যোগ্য নয়? তা নয়। সত্যকে সহজবোধ্য করতে হবে. কিছুটা তরল করতে হবে। যীশুর শৈলোপদেশ কিংবা গীতার কথাই ধরা যাক—কী সহজ, কী সরল, কী চমৎকার! সত্য সেখানে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরল ভাবে প্রকাশিত। একজন রাস্তার লোকও তা বুঝতে পারে। কিন্তু না, পুরোহিতরা এত সহজেই সত্যকে ধরে ফেলা পছন্দ করবে না। তারা দু-হাজার স্বর্গ আর দু-হাজার নরকের কথা শোনাবেই। তারা বলবেইঃ লোকে তাদের বিধান মেনে চললে স্বর্গে যেতে পারবে, নাহলেই নরকবাস।

কিন্তু সত্যকে মানুষ ঠিকই জানবে। কেউ কেউ ভয় পান যে, যদি পূর্ণ সত্য সাধারণকে বলে ফেলা হয়, তবে তাদের ক্ষতিই হবে। এঁরা বলেন—নির্বিশেষ সত্য লোককে জানানো উচিত নয়। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আপস করে জগতের অবস্থা এমন কিছু ভাল হয়নি! জগৎ এর চেয়ে আর কত খারাপ হতে পারে? কাজেই, সত্যকেই তুলে ধর। যদি তা সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই তাতে মঙ্গল হবে। লোকে যদি তাতে প্রতিবাদ করে বা অন্য কোন প্রস্তাব আনে, তবে তাতে শয়তানিরই সমর্থন করা হবে।

বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ এইসব ভাবে ভরে গিয়েছিল। নিরীহ জন-সাধারণকে তখন সবরকম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। বেদের একটা শব্দও কোন লোকের কানে ঢুকলে তাকে দারুণ শাস্তি পেতে হত। যে বেদ প্রাচীন হিন্দুদের আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক সত্যের মহান ভাণ্ডার, সেই বেদকে পুরোহিতরা তাদের গুপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল।

অবশেষে একজন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর ছিল বুদ্ধি, শক্তি ও হৃদয়—উন্মুক্ত আকাশের মতো অনন্ত হৃদয়। তিনি দেখলেন, জনসাধারণ কেমন করে পুরোহিতদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, আর পুরোহিতরাও কিভাবে শক্তিমত্ত হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করতেও তিনি উদ্যোগী হলেন।

কারও ওপর কোন আধিপত্য বিস্তার করতে তিনি চাননি। মানুষের মানসিক বা আধ্যাত্মিক সবরকম বন্ধনকে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর হৃদয়ও ছিল বিশাল। প্রশস্ত হৃদয় আমাদের মধ্যে আরও অনেকেরই আছে এবং সকলকে সহায়তা করতে আমরাও চাই। কিন্তু আমাদের সকলেরই বুদ্ধিমত্তা নেই; কি উপায়ে কিভাবে সাহায্য করা যায়, তা জানা নেই। মানবাত্মার মুক্তির পথ উদ্ভাবন করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি এই মানুষটির ছিল। লোকের কেন এত দুঃখ—তা তিনি জেনেছিলেন, আর এই দুঃখনিবৃত্তির উপায়ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সর্বগুণান্বিত মানুষ ছিলেন তিনি, সবকিছুর সমাধান করেছিলেন। নির্বিচারে সকলকেই উপদেশ দিয়ে তিনি বোধিলব্ধ শান্তি উপলব্ধি করতে তাদের সাহায্য করেছিলেন। ইনিই মহামানব বুদ্ধ।...

তাঁর সমস্ত উপদেশের মধ্যে মানব-মৈত্রী অন্যতম। মানুষ সকলেই সমান, বিশেষ অধিকার কারও নেই। বুদ্ধ সাম্যের আচার্য। প্রত্যেক নরনারীরই আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে সমান অধিকার—এই তাঁর শিক্ষা। পুরোহিত ও অন্যান্য বর্ণের ভেদ তিনি দূর করেছিলেন। নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক রাজ্যের যোগ্য হতে পেরেছিল। নির্বাণের উদার পথ তিনি সবার জন্যই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।...

তাঁর বাণী ছিল এইঃ আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? কারণ আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর। আমরা শুধু নিজেদেরই জন্য সবকিছু কামনা করি। তাইতো দুঃখ। এ-থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি? আত্মবিসর্জন। 'অহং' বলে কিছু নেই।...দেহ অনুক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে, মন এবং বুদ্ধিও তাই। সুতরাং 'অহং' নিছক ভ্রান্তি। যত স্বার্থপরতা, তা এই 'অহং'কে নিয়ে, এই মিথ্যা 'অহং'কে কেন্দ্র করে। যদি জানি যে 'আমি' বলে কিছু নেই, তাহলেই আমরা নিজেরা শান্তিতে থাকব এবং অপরকেও সুখী করতে পারব। এই ছিল বুদ্ধের শিক্ষা। তিনি শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, জগতের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।[১৮]

জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণ করবার জন্য পশুদের বদলে নিজের জীবন বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার কোন এক রাজাকে বলেছিলেনঃ 'যদি যজ্ঞে ছাগশিশু হত্যা করলে আপনার স্বর্গে যাওয়ার সাহায্য হয়, তবে নরহত্যা করলে তাতে

তো আরও বেশী উপকার হবে। অতএব যজ্ঞে আমায় বধ করুন।' রাজা এই-কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন।[১১]

তিনি বলতেন, পশুবলি হচ্ছে অন্যতম কুসংস্কার। ঈশ্বর আর আত্মা—এ দুটিও কুসংস্কার। ঈশ্বর হচ্ছেন পুরোহিতদের উদ্ভাবিত এক কুসংস্কার মাত্র। পুরোহিতদের কথামতো যদি সত্যিই কোন একজন ঈশ্বর থাকেন, তবে জগতে এত দুঃখ কেন? তিনি তো দেখছি আমারই মতো কার্য-কারণের অধীন। যদি তিনি কার্য-কারণের অতীত তাহলে সৃষ্টি করেন কিসের জন্য? এরকম ঈশ্বর মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্বর্গে বসে একজন শাসক তাঁর আপন মর্জি-অনুযায়ী দুনিয়াকে শাসন করছেন, আর আমাদের এখানে ফেলে রেখে দিয়েছেন শুধু জ্বলেপুড়ে মরবার জন্য—আমাদের দিকে একবার ফিরে তাকানোর মতো সদিচ্ছাও তাঁর নেই! আমাদের গোটা জীবনটাই তো একটানা দুঃখের। কিন্তু এই শাস্তিই যথেষ্ট নয়—মৃত্যুর পরেও আবার নানা জায়গায় ঘুরতে হবে এবং আরও অনেক শাস্তি পেতে হবে। তবুও এই বিশ্বস্রষ্টাকে খুশি করবার জন্য আমরা কতই না যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ড করে চলেছি।

বুদ্ধ বলেছেনঃ এসব আচার-অনুষ্ঠান—সবই ভুল। জগতে আদর্শ মাত্র একটাই। সব মোহকে বিনষ্ট কর; যা সত্য তা-ই শুধু থাকবে। মেঘ সরে গেলেই সূর্যের আলো ফুটে উঠবে। 'অহং'-এর বিনাশ কিভাবে হবে? সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও। একটা সামান্য পিঁপড়ের জন্যও প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকো। কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কাজ করবে না, কোন ভগবানকে খুশি করবার জন্যও নয়, কোন পুরস্কারের লোভেও নয়। কাজ করবে নিজের 'অহং'কে নষ্ট করে তুমি নিজের নির্বাণ চাইছ বলে। পূজা-উপাসনা এ সবই নিতান্ত অর্থহীন। তোমরা সবাই বল 'ভগবানকে ধন্যবাদ'—কিন্তু কোথায় তিনি? কেউই জান না, অথচ 'ভগবান ভগবান' করে সবাই মেতে উঠেছ।

হিন্দুরা তাদের ভগবান ছাড়া আর সবকিছুই ত্যাগ করতে পারে। ভগবানকে অস্বীকার করার মানে ভক্তির মূল উৎপাটন করা। ভক্তি ও ভগবান হিন্দুরা আঁকড়ে থাকবেই। ...তবু এই বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত প্রসারলাভ করেছে। এর একমাত্র কারণ বুদ্ধের সেই বিস্ময়কর ভালবাসা, যা শুধু মানুষের সেবায় নয়, সমস্ত প্রাণীর সেবায় নিবেদিত হয়েছিল; যে-ভালবাসা সর্বভূতের সর্বদুঃখ মোচনের

উপায় নির্ধারণের জন্য আর কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেনি। মানব-ইতিহাসে এই ঘটনা এই প্রথম।

মানুষ ভগবানকে ভালবাসছিল, কিন্তু তার মানুষ-ভাইদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। ঈশ্বরের জন্য মানুষ নিজের জীবন পর্যন্ত বলি দিতে পারে, আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে সে নরহত্যাও করতে পারে। এই ছিল জগতের অবস্থা। ভগবানের মহিমার জন্য তারা পুত্র বিসর্জন দিত, দেশ লুণ্ঠন করত, সহস্র সহস্র জীবহত্যা করত, এই ধরিত্রীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করত ভগবানেরই জয় দিয়ে। এই সর্বপ্রথম তারা ফিরে তাকাল ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে। মানুষকেই ভালবাসতে হবে। এই হল সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ, এই হল সত্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রথম তরঙ্গ—যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশ উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।...

আমি সারা জীবন বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরাগী...। অন্য সব চরিত্রের চেয়ে এঁর চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেশী। আহা, সেই সাহসিকতা, সেই নির্ভীকতা, সেই গভীর প্রেম! মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর জন্ম! সবাই নিজের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছে, কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে; তিনি কিন্তু নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা করেননি। তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন করে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সারা জীবন তিনি কখনও নিজের ভাবনা ভাবেননি।...

তাঁর জীবন যেমন মহৎ, মৃত্যুও তেমনি। ...আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মতোই কোন জাতের একটি লোকের দেওয়া খাদ্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুরা এই জাতের লোকদের স্পর্শ করে না, কারণ তারা নির্বিচারে সবকিছুই খায়। তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন, 'তোমরা এ-খাদ্য খেও না, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। লোকটির কাছে গিয়ে বোলো, আমার জীবনের এক মহৎ কর্তব্য সে পালন করেছে—সে আমাকে দেহমুক্ত করে দিয়েছে।' (অন্তিম সময়ে) এক বৃদ্ধ বুদ্ধকে দর্শন করবার আশায় কয়েক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে এসেছিল। বুদ্ধ তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। জনৈক শিষ্যকে কাঁদতে দেখে তিনি তিরস্কার করে বললেনঃ 'এ কী? আমার এত উপদেশের এই ফল? কোন মিথ্যা বন্ধনে তোমরা জড়িও না, আমার উপর কিছুমাত্র নির্ভর কোরো না, এই

নশ্বর শরীরটার জন্য বৃথা গৌরবের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন, তিনি উপলব্ধিস্বরূপ। নিজেরাই নিজেদের নির্বাণলাভের উপায় করে নাও।'

এমনকি অন্তিমকালেও তিনি নিজের জন্য কোন প্রতিষ্ঠা দাবি করেননি। এই কারণেই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।[২০]

শংকরাচার্য

বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে একটা বিপদের বীজ ছিল—বৌদ্ধধর্ম ছিল সংস্কার-মূলক। প্রকাণ্ড ধর্ম-বিপ্লব আনবার জন্য তাঁকে অনেক নেতিবাচক শিক্ষাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু কোন ধর্ম যদি নেতিভাবের দিকেই বেশী জোর দেয় তবে তার বিলুপ্তির আশংকা থাকবেই। শুধুমাত্র সংশোধনের দ্বারাই কোন সংস্কারমূলক সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে না। যেগুলি সেই সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রেরণা সেই সংগঠনী উপাদানগুলিই, মূলতত্ত্বগুলিই শুধু টিকে থাকে। তাই সংস্কারের কাজগুলো হয়ে যাবার পরই ইতিবাচক দিকটির উপরে জোর দিতে হয়। বাড়ী তৈরী হয়ে গেলেই ভারা খুলে ফেলতে হয়। ..কালক্রমে বুদ্ধের অনুগামীরা তাঁর নেতিবাচক উপদেশগুলির উপরই বেশী জোর দিতে থাকায় তাঁর ধর্মের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।[২১]

বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে যে বীভৎসতা দেখা দিল, তা বর্ণনা করবার সময় আমার নেই, প্রবৃত্তিও নেই। অতি বীভৎস আচার-অনুষ্ঠান, অতি ভয়ংকর ও অশ্লীল গ্রন্থরাশি—যা মানুষের হাত দিয়ে আর কখনও বেরোয়নি বা মানুষের কল্পনায় আর কখনও আসেনি; অতি ভয়ংকর পাশবিক অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যা আর কখনও ধর্মের নামে চলেনি—এ সবই অবনত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি।[২২]

কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয়নি, তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হল। যিনি বলেছিলেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, তখনই আমি এসে থাকি', তিনিই আবার আবির্ভূত হলেন। এবার তাঁর আবির্ভাব হল দাক্ষিণাত্যে। আবির্ভাব হল সেই লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী শঙ্করাচার্যের, সেই ব্রাহ্মণ যুবকের—যাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে, ষোল বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত গ্রন্থের রচনা শেষ করেছিলেন। এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের রচনা, এই

বালক নিজেও—আধুনিক সভ্য জগতের চোখে পরম বিস্ময়। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে তার প্রাচীন পবিত্র ভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ভাবলে অবাক হতে হয়—কী কঠিন এবং কত বিরাট কাজ তাঁর সামনে ছিল। সে-সময়ে ভারতের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তার কিছুটা আভাস আপনাদের দিয়েছি...। সেইসময় থেকে আজ অবধি সমগ্র ভারতে এই অবনত-বৌদ্ধধর্মের হাত থেকে বেদান্তের পুনর্বিজয়ের কাজ চলছে—এখনও সেই কাজ চলছে, এখনও তার শেষ হয়নি।

মহাদার্শনিক শঙ্কর এসে দেখালেন, বৌদ্ধধর্ম এবং বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নেই। তবে বুদ্ধদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যরা তাঁর উপদেশের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে নিজেরা পতিত হয় এবং আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাস্তিক হয়ে পড়ে -শঙ্কর সেটাই দেখালেন। তখন বৌদ্ধরা সকলেই তাদের প্রাচীন ধর্মে ফিরে আসতে লাগল।...

শঙ্কর মহামনীষী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বোধহয় তাঁর হৃদয় মস্তিষ্কের অনুরূপ ছিল না।...শঙ্করকে কতকটা বর্জনশীল বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তাঁর লিখিত গ্রন্থে এমন কিছু দেখতে পাই না, যাতে তাঁর সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধের উপদেশ যেমন তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা বিকৃত হয়েছে, তেমনি শঙ্করাচার্যের উপদেশের উপর যে-সংকীর্ণতার দোষ আরোপিত হয়, সম্ভবত তাতে শঙ্করের কোন দোষ নেই। তাঁর শিষ্যদের বুঝবার অক্ষমতার দরুনই এই দোষ শঙ্করে আরোপিত হয়ে থাকে।[২৫]

রামানুজ

এরপর এলেন রামানুজাচার্য।...হৃদয়বত্তায় রামানুজ শঙ্করের চেয়ে বড়। পতিতের দুঃখে তাঁর হৃদয় কাঁদল। তিনি তাদের দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলেন। কালক্রমে যেসব নতুন নতুন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, তিনি সেগুলো গ্রহণ করে যথাসাধ্য শুদ্ধ করলেন এবং নতুন নতুন আচার-অনুষ্ঠান, নতুন নতুন উপাসনা-পদ্ধতি তৈরী করে ঐগুলো যাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তাদের উপদেশ করতে শুরু করলেন। আবার একই সঙ্গে তিনি উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। এই হল রামানুজের অবদান।...রামানুজের সময় থেকে ধর্মপ্রচারে একটা

বিশেষত্ব লক্ষিত হয়—সেই সময় থেকেই ধর্মের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।[২৪]

চৈতন্যদেব

চৈতন্যদেব গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ। ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। তখনকার এক অতি বিচারশীল পণ্ডিতবংশে তাঁর জন্ম হয়। তিনিও ন্যায়ের অধ্যাপক হয়ে তর্কে পণ্ডিতদের পরাস্ত করে দিগ্বিজয়ী হন। বাল্যকাল থেকে তিনি শিখেছিলেন, এ-ই হল জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। কোন এক মহাপুরুষের কৃপায় তাঁর গোটা জীবনটা বদলে গেল। বিচার-বিতর্ক, তর্ক ও ন্যায়ের অধ্যাপনা সব তিনি ছেড়ে দিলেন। হয়ে উঠলেন ক্রমশ পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভক্তির আচার্যদের অন্যতম—শ্রীচৈতন্য, প্রেমে পাগল চৈতন্য। তাঁর ভক্তির তরঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত হল, সকলের প্রাণে তা শান্তি নিয়ে এল।

চৈতন্যদেবের প্রেমের কোন সীমা ছিল না। পাপী-পুণ্যবান, হিন্দু-মুসলমান, পবিত্র-অপবিত্র, বেশ্যা, পতিত—সকলেই তাঁর ভালবাসার ভাগ পেত, সকলকেই তিনি কৃপা করতেন। যদিও তাঁর সম্প্রদায়ের এখন অত্যন্ত অবনতি হয়েছে—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবক্ষেত্রেই যেমনটি হয়ে থাকে—তথাপি এখনও পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায় দরিদ্র, নিপীড়িত, দুর্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, সমাজে পরিত্যক্ত সমস্ত মানুষেরই আশ্রয়স্থল।[২১]

শ্রীচৈতন্যদেব মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন; স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেড়া-নেড়ীর দল করলে। আর তিনি যে-প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম। তা কখনও সাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব গুরুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানোর দিকে ঝোঁক না দিয়ে তাঁর প্রেমটাকে সাধারণের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে সে উচ্চ প্রেমভাবটা নিতে পারলে না এবং সেটাকে নায়ক-নায়িকার দূষিত প্রেম করে তুললে।...কাম থাকতে প্রেম হয় না—এক বিন্দু থাকতেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ও-প্রেমের অধিকারী কেউ নয়। ঐ-প্রেম সাধারণের সম্পত্তি করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভেতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠবে।

ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিন্নিদের সঙ্গে যে-প্রেম, তার কথাই মনে উঠবে।[২৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ

শঙ্করের ছিল বিরাট মস্তিষ্ক, রামানুজ আর চৈতন্যের বিশাল হৃদয়। এখন এমন একজনের আবির্ভাবের সময় হয়েছিল, যাঁর মধ্যে একাধারে এরকম হৃদয় ও মস্তিষ্ক থাকবে; যিনি একাধারে শঙ্করের বিরাট মেধা এবং চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হবেন। যিনি দেখবেন—সব সম্প্রদায় একই মহৎ ভাবে, এক ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত; যিনি সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবেন; যাঁর হৃদয় ভারত বা ভারতের বাইরের দরিদ্র দুর্বল পতিত সকলের জন্য কাঁদবে; আবার একই সঙ্গে যাঁর বিশাল বুদ্ধি এমন সব মহান তত্ত্বের উদ্ভাবন করবে যেগুলো ভারত এবং ভারতের বাইরের সমস্ত পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে; আর এরকম বিস্ময়কর সমন্বয়ের ফলে এমন এক বিশ্বজনীন ধর্মের প্রকাশ সম্ভব হবে যার মধ্যে হৃদয় এবং মস্তিষ্কের পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকবে। এইরকম একজন ব্যক্তি সত্যিই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কয়েক বছর তাঁর চরণতলে বসে শিক্ষা লাভ করবার। এরকম একজন মানুষের আবির্ভাবের সময় হয়ে এসেছিল, প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল। তিনিও এসেছিলেন; এবং সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, তাঁর জীবন কেটেছিল এমন একটা শহরের কাছে, যে-শহর পাশ্চাত্যভাবের পেছনে উন্মত্ত হয়ে ছুটেছিল, ভারতের অন্য যে-কোন শহরের চেয়ে যা বেশী পরিমাণে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়েছিল। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর কিছুই ছিল না। মহামনীষা সম্পন্ন হয়েও তিনি নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে পারতেন না, (পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলা লিখতে এবং পড়তে পারতেন।) কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী স্নাতকরা পর্যন্ত তাঁকে দেখে একজন মহামনীষী বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি একজন অদ্ভুত মানুষ ছিলেন—এই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।[২৭]

এই মানুষটি কলকাতার উপকণ্ঠে এসে রইলেন। কলকাতা হল ভারতবর্ষের রাজধানী। আমাদের দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়-নগরী এই শহর—যেখান থেকে প্রতি বৎসর শত শত সংশয়বাদী ও জড়বাদী যুবক

বেরিয়ে আসছিল। তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের এইসব উপাধিধারী সংশয়বাদী এবং নিরীশ্বরবাদীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর কথা শুনতে আসত। আমি এই মানুষটির সম্বন্ধে শুনলাম এবং একদিন গেলাম তাঁর কথা শুনতে। তাঁকে দেখে অতি-সাধারণ মনে হল, কোন অসাধারণত্বই চোখে পড়ল না। একেবারে সহজ ভাষায় তিনি কথা বলছিলেন। আমি ভাবলামঃ 'এই লোকটি কি করে একজন বড় ধর্মাচার্য হতে পারেন?' আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সেই প্রশ্ন করলাম যা আমি সারা জীবন ধরে অন্যদের করে এসেছিঃ 'আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?' তিনি উত্তর করলেনঃ 'হ্যাঁ'। 'আপনি কি প্রমাণ করতে পারেন যে, ঈশ্বর আছেন?' 'হ্যাঁ'। 'কি প্রমাণ?' 'আমি তোমাকে যেমন আমার সামনে দেখছি, তাঁকেও ঠিক সেরকম দেখি, বরং আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বলভাবে।' এইকথা শুনে আমি মুগ্ধ হলাম। এই প্রথম আমি এমন একজনকে দেখলাম, যিনি সাহস করে বলতে পারেন, 'আমি ঈশ্বর দেখেছি, ধর্ম সত্য, ধর্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব—আমরা এই জগৎকে যেমন প্রত্যক্ষ করি, তারচেয়েও অনন্তগুণ স্পষ্টভাবে ঈশ্বরকে দেখা যেতে পারে।' আমি দিনের পর দিন সেই লোকটির কাছে যেতে শুরু করলাম।

..ধর্ম যে দেওয়া যেতে পারে, তা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম যে, একবার স্পর্শে একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।...আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল।[২৮]

আমার আচার্যদেবের কাছে থেকে আমি বুঝেছি যে, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে। তাঁর মুখ থেকে কখনও কারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয়নি, কোন সমালোচনা পর্যন্ত নয়। তাঁর দৃষ্টি জগতে কোন কিছুকে মন্দ বলে দেখবার শক্তি হারিয়েছিল—তাঁর মন কোন রকম কুচিন্তা করবার সামর্থ্য হারিয়েছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখতেন না। সেই মহা-পবিত্রতা, মহাত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র নিগূঢ় উপায়।[২৯]

...ত্যাগ ছাড়া আধ্যাত্মিকতা লাভের সম্ভাবনা কোথায়? সমস্ত ধর্ম-ভাবের পেছনেই রয়েছে ত্যাগ—তা যেখানেই হোক না কেন। আর এই ত্যাগের ভাব যতই কমে যায়, ততই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ধর্মের ভেতর ঢুকতে থাকে; আর ধর্মভাবও সেই অনুপাতে কমে যায়। এই মহাপুরুষ ত্যাগের সাকার বিগ্রহ ছিলেন।...

যাঁরা সন্ন্যাসী হন, তাঁদের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্য-মান-সম্ভ্রম ত্যাগ করতে হয়। আর আমার গুরুদেব এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে কাজে পরিণত করেছেন। এমন অনেকে ছিল, যাদের কাছ থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করলে তারা কৃতার্থ বোধ করত, যারা আনন্দের সঙ্গে তাঁকে হাজার হাজার টাকা দিতেও প্রস্তুত ছিল—কিন্তু এই মানুষটি যদি কখনও কারও কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত হতেন, তারা হচ্ছে এই লোকগুলি। সম্পূর্ণভাবে কাম-কাঞ্চনজয়ের এক জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন তিনি; এই দুই ভাব তাঁর ভিতর বিন্দুমাত্রও ছিল না; আর বর্তমান শতাব্দীর জন্য এরকম মানুষের একান্ত প্রয়োজন।[৩০]

আমরা পাশ্চাত্যে নারীপূজার কথা শুনে থাকি, কিন্তু সাধারণত এই পূজা নারীর সৌন্দর্য ও যৌবনের পূজা। ইনি কিন্তু নারীপূজা বলতে বুঝতেন—মা আনন্দময়ীর পূজা। সব নারীই সেই আনন্দময়ী মা ছাড়া আর কিছু নন। আমি নিজে দেখেছি, সমাজ যাদের স্পর্শ করে না—এরকম স্ত্রীলোকদের সামনে তিনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, শেষে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পদতলে পড়ে অর্ধবাহ্যদশায় বলছেন, 'মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছ, আর এক-রূপে তুমি এই জগৎ হয়েছ। আমি তোমাকে বারবার প্রণাম করি।' ভেবে দেখুন, সেই মানুষটির জীবন কিরকম ধন্য—যাঁর অন্তর থেকে সবরকম পশু-ভাব চলে গেছে, যিনি প্রতিটি নারীকে ভক্তিভাবে দর্শন করেন, যাঁর চোখে সব নারীর মুখ অন্যরূপ ধারণ করে সেই আনন্দময়ী জগন্মাতার মুখই কেবল প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।...যদি প্রকৃত ধর্মলাভ করতে হয় তবে এইরকম পবিত্রতাই আমাদের সর্বতোভাবে প্রয়োজন।[৩১]

তাঁর জীবনের আর একটি ভাব হচ্ছে অপরের জন্য তাঁর গভীর প্রেম। আমার গুরুদেবের জীবনের প্রথম ভাগ কেটেছে আধ্যাত্মিকতা সঞ্চয়ে, আর দ্বিতীয় ভাগ কেটেছে তা বিতরণে।...মানুষ ভিড় করে তাঁর কাছে আসত তাঁর কথা শুনতে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। এরকম যে দু-এক দিন হয়েছিল তা নয়—মাসের পর মাস এরকম হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এই কঠোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে গেল। কিন্তু তাঁর গভীর মানবপ্রেম তাঁকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দিল না; প্রত্যাখ্যান করল না কাউকেই—এমনকি তাঁর উপদেশ-প্রার্থী হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দীনতম

যে, তাকেও না। ক্রমে তাঁর গলায় মারাত্মক রোগ দেখা দিল। তবুও অনেক বুঝিয়েও তাঁর কথা বলা বন্ধ করা গেল না। যখনই তিনি শুনতেন, লোকে তাঁকে দেখতে এসেছে, তিনি তাদের তাঁর কাছে আসতে দেবার জন্য জোর করতেন এবং তারা এলে তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কেউ বোঝাতে এলে বলেছিলেনঃ 'দেহের কষ্ট আমি গ্রাহ্য করি না। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি। একজন লোককে সাহায্য করতে পারাও গৌরবের ব্যাপার।'[৩২]

...যদি আমি একটা কথাও উচ্চারণ করে থাকি যা সত্য, তাহলে সেটি তাঁর, তাঁরই শুধু। আর যদি এমন অনেক কিছু বলে থাকি, যা অসত্য, যা ঠিক নয় কিংবা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর নয়—তাহলে সেগুলো একান্তভাবেই আমার। সেগুলোর জন্য আমিই সম্পূর্ণভাবে দায়ী।[৩৩]

কোন জাতিকে এগিয়ে যেতে হলে তার উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। সেই আদর্শ অবশ্যই পরব্রহ্ম। কিন্তু যেহেতু তোমরা সকলেই বিমূর্ত আদর্শের (abstract ideal) দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারবে না, তোমাদের একটি ব্যক্তি-আদর্শের (personal ideal) একান্ত প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তোমরা সেই আদর্শ পেয়েছ। অন্য কেউ এযুগে আমাদের আদর্শ হতে পারেন না।...আমাদের আজ এমন মানুষের প্রয়োজন, বর্তমান যুগের মানুষের প্রতি যাঁর সহানুভূতি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমাদের এই প্রয়োজন মিটেছে। আজ প্রত্যেকের সামনেই তাঁকে তুলে ধর। সাধু বা অবতার যেভাবেই তাঁকে গ্রহণ কর না কেন—কিছু যায় আসে না।[৩৪]

ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন, কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্যে দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয়নি; সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে; অথচ প্রত্যেকের তাঁকে নিজের ভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে—কেউ আচার্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা, কেউ ঈশ্বর, কেউ আদর্শ পুরুষ, কেউ বা মহাপুরুষ—যার যা খুশি।[৩৫]

সংকীর্ণ সমাজে আধ্যাত্মিকতা প্রবল ও গভীর—যেমন সরু নদীর স্রোত বেশী। উদার সমাজে একদিকে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা থাকলেও অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে আধ্যাত্মিকতার গভীরতা ও প্রবলতা কম হতে দেখা যায়। কিন্তু

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ইতিহাসের এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একাধারে সমুদ্রের চেয়ে গভীর এবং আকাশের চেয়েও উদার ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হয়েছে।

আমাদের অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোকে বেদের ব্যাখ্যা করতে হবে। শঙ্করাচার্য এবং আর সব ভাষ্যকারেরাই একটা মহাভুল করেছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন গোটা বেদই এক ধরনের সত্যের কথাই শুধু বলছে। তাঁদের সকলের মধ্যেই তাই শ্রুতির অর্থ বিকৃত করবার দোষ এসে গেছে। বেদের আপাতবিরুদ্ধ যেসব মন্ত্রের অর্থ তাঁদের মতবাদের বিরুদ্ধে যায়, সেগুলির অর্থ তাঁরা টেনেটুনে বিকৃত করে নিজেদের মতের অনুকূলে এনেছেন। প্রাচীন-কালে গীতা-প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রুতির সেইসব আপাতবিরুদ্ধ উক্তিগুলির মধ্যে আংশিক সমন্বয় করেছিলেন। বর্তমানকালে সেই ভগবানই—আরও বহুগুণ বেশী শক্তি ধারণ করে—সেই বিরোধের নিঃশেষে নিষ্পত্তি ঘটানোর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণই সর্বপ্রথম জীবনে রূপায়িত করে শিক্ষা দিলেন যে, বেদ-বেদান্তের যেসব বক্তব্য অগভীর দৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ মনে হয়, সেগুলি বাস্তবিক তা নয়; আসলে সেগুলি বিভিন্ন স্তরের সাধকদের জন্য ধর্মজীবনের ক্রম-অনুসারে নির্দিষ্ট। কাজেই শ্রীরাম-কৃষ্ণের বাণীর আলোকে না দেখলে, কেউ কখনও বেদ-বেদান্তের তাৎপর্য ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না।...

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কামকাঞ্চনের মতো আর যে-জিনিসটি সযত্নে বর্জন করবার জন্য জোর দিতেন, সেটি হচ্ছে ভগবানের অসীম ভাবকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে সীমায়িত করা। কাজেই যে-কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের এই উদার অনন্ত আদর্শকে সীমিত করতে চাইবে, সে প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং শত্রু হবে।...

এইরকম নিখুঁত চরিত্র; সর্বোচ্চ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি ও যোগের এরকম অদ্ভুত সমন্বয়, মানবজাতির সামনে এর আগে আর কখনও আসেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে প্রমাণ হয় যে, একই ব্যক্তির মধ্যে সর্বোত্তম প্রসারতা, সর্বোচ্চ উদারতা এবং প্রগাঢ় প্রবলতার পাশাপাশি সহ-অবস্থান সম্ভব। এবং এও প্রমাণিত হয় যে, সমাজও এইভাবে গড়ে তোলা সম্ভব—কারণ সমাজ কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

সে-ই শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ শিষ্য এবং অনুগামী—যার চরিত্র তাঁরই মতো

নিখুঁত এবং সর্বদিক দিয়ে সুষম। এইরকম নিখুঁত চরিত্র গড়ে তোলাই এই যুগের আদর্শ এবং এই আদর্শে পৌঁছনোই প্রত্যেকের একমাত্র চেষ্টা হওয়া উচিত।[৩৬]

রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ-জগতে আর নাই।[৩৭]

বেদ-বেদান্ত পুরাণ-ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India. (তাঁর জীবন অনন্তশক্তিপূর্ণ এক সন্ধানী আলো, যা ভারতের সমগ্র ধর্মীয় চিন্তারাশির উপরে এসে পড়েছে। তিনি বেদ-বেদান্ত এবং তার প্রতিপাদ্য লক্ষ্যের জীবন্ত ভাষ্য। তিনি এক জীবনেই ভারতের জাতীয় ধর্মচেতনার সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করেছেন।)[৩৮]

...রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect (সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে পরিপূর্ণ)—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না, তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজন্য চটি। তাঁর নাম বরং ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবতী হোক। তিনি কি নামের দাস?[৩৯]

যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India—সত্যযুগের আবির্ভাব![৪০]

রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝতে পারিসনি।...What the whole Hindu race has thought in ages he *lived* in one life. His life is the living commentary to the Vedas of all the nations. (সমগ্র হিন্দুজাতি যুগ যুগ ধরে যে-চিন্তা করে আসছে, তিনি এক জীবনেই সেই সমস্ত ভাব উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন সব জাতির শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য।)[৪১]

ভারত দীর্ঘদিন যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্মের ওপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানদের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন। পতিত ভারতবর্ষ আবার জেগে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারতবর্ষ উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ চারদিকে প্রচার করতে হবে, যেন হিন্দু-সমাজের সর্বাংশে—প্রতি অণু-পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এই কাজ করবে? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা বহন করে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করবে? কে নাম, যশ, ঐশ্বর্যভোগ—এমনকি ইহলোক-পরলোকের সব আশা ত্যাগ করে অবনতির স্রোত রোধ করতে এগোবে?...প্রভু যাকে মনোনীত করবেন, সে-ই ধন্য—সে-ই মহাগৌরবের অধিকারী।[৪২]

রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বলো বা ঈশ্বর বলো বা অবতার বলো, আপনার আপনার ভাবে নাও। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী—অশান্তি দূর হয়ে যাবে।[৪৩]

সমাজকে, জগৎকে electrify করতে হবে। বসে বসে গল্পবাজির আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ?...মহা spiritual tidal wave আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' Life is ever expanding, contraction is death. যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে কৃপার পাত্র)। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে...।

এই test, যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ' তারা (তারা প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী)।[৪৪]

আমি নিজে যা-কিছু হয়েছি, ভবিষ্যতে পৃথিবী যা হবে, তার সবকিছুরই মূলে আছেন—আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ।[৪৫]

জ্বালাময়ী বাণী

আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এসো, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন্ কাজ আছে?[১]

...মনে রাখিও কাপুরুষ ও দুর্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ। নীতিপরায়ণ, সাহসী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার চেষ্টা কর।[২]

এসো, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালোবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো? তাহলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেয়ো না, সামনে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।[৩]

ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্বদা মনে রাখবে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।[৪]

তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম-বিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হতে পারো? এটাই করতে হবে এবং আমরাই তা করব। তোমরা সকলে এই কাজ করবার জন্যই এসেছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখো। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কাজের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরীব ও পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করতে হবে—এই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ![৫]

বড় হতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি জিনিসের প্রয়োজনঃ

(ক) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

(খ) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব।

(গ) যারা সৎ হতে বা সৎ কাজ করতে সচেষ্ট, তাদেরকে সহায়তা।[৬]

কোন ব্যক্তির বা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা কোরো না। যা পারো করে যাও, কারও উপর কোন আশা রেখো না।[৭]

বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থ ত্যাগ দ্বারাই হতে পারে। স্বার্থের প্রয়োজন নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়—তা তোমারও নয়, আমারও নয়, বা আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সংকল্প যাতে কাজে পরিণত হয়, তার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহান্ বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নামযশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পিছনে চেয়ো না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কাজ কর।[৮]

ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পৌঁচচ্ছো, থেমো না। জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। মহাতরঙ্গ উঠেছে। কিছুতেই তার বেগ রোধ করতে পারবে না।...উৎসাহ বৎস, উৎসাহ—প্রেম বৎস, প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় কোরো না, সবচেয়ে গুরুতর পাপ—ভয়![৯]

কাজের সামান্য আরম্ভ দেখে ভয় পেয়ো না, কাজ সামান্য থেকেই বড় হয়। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হতে যেয়ো না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবিয়েছে। এ-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থ হও এবং কাজ কর।[১০]

খুব খাটো। সম্পূর্ণ পবিত্র হও—উৎসাহাগ্নি আপনিই জ্বলে উঠবে।[১১]

হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' ডাকে ভয় পেয়ো না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেয়ো না—খাড়া হয়ে ওঠো, ওঠো, কাজ কর।[১২]

যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর; বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি।[১৩]

...বল্, আমি সব করতে পারি। 'নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়।'[১৪]

মহা হুঙ্কারের সহিত কার্য আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়?...ডর? কার ডর? কাদের ডর?[১৫]

ত্যাগ, ত্যাগ—এইটি খুব প্রচার করা চাই। ত্যাগী না হলে তেজ হবে না। কার্য আরম্ভ করে দাও।[১৬]

মাভৈঃ মাভৈঃ। সকল হইবে ধীরে ধীরে। তোমাদের নিকট এই চাই—হামবড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষা একেবারে জন্মের মতো বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্বংসহ হইতে হইবে; এইটি যদি পারো, দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসিবে।[১৭]

অন্যে যাই ভাবুক আর করুক, তুমি কখনও তোমার পবিত্রতা, নৈতিকতা আর ভগবৎপ্রেমের আদর্শকে নীচু কোরো না।...যে ভগবানকে ভালবাসে তার পক্ষে চালাকিতে ভীত হবার কিছু নেই। স্বর্গে ও মর্তে পবিত্রতাই সবচেয়ে মহৎ ও দিব্য শক্তি।[১৮]

যে-ধর্ম বা যে-ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে-ধর্মে বা সে-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। মতবাদ যত বড়ই হোক, যত সুবিন্যস্ত দার্শনিক তত্ত্বই তাতে থাকুক, যতক্ষণ তা মত বা বইয়েই আবদ্ধ ততক্ষণ তাকে আমি 'ধর্ম' নাম দিই না। চোখ আমাদের পিঠের দিকে নয়, সামনের দিকে—অতএব সামনে এগিয়ে যাও, আর যে-ধর্মকে তোমরা নিজের ধর্ম বলে গৌরব কর, তার উপদেশগুলো কাজে পরিণত কর।[১৯]

বৎস, কোন ব্যক্তি—কোন জাতিই অপরকে ঘৃণা করে জীবিত থাকতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কার করল ও অন্য জাতির সাথে সবরকম সংস্রব ত্যাগ করল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের শুরু হল। তোমরা ভারতেতর দেশবাসীদের প্রতি উক্ত ভাব পোষণ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থেকো। বেদান্তের কথা ফস্ ফস্ মুখে আওড়ানো খুব ভাল বটে, কিন্তু তার একটি ক্ষুদ্র উপদেশও কাজে পরিণত করা কি কঠিন![২০]

যে সন্ন্যাসীর অন্তরে অপরের কল্যাণ-সাধন-স্পৃহা বর্তমান নাই, সে সন্ন্যাসীই নয়—সে তো পশু মাত্র![২১]

যারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দিয়ে আয় করা

টাকায় শিক্ষিত হয়ে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবে থেকেও তাদের কথা একটিবার চিন্তা করবার অবসর পায় না—তাদের আমি 'বিশ্বাসঘাতক' বলি।

কোথায় ইতিহাসের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করেছে?—তাদের ক্ষমতার জীবনীশক্তি এদের নিষ্পেষণ হতেই উদ্ভূত![২২]

এই নির্যাতিত ও অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উন্নতির কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার ডিগ্রিধারী ব্যক্তি দিয়ে একটি জাতি গঠিত হয় না, অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীও একটি জাতি নয়। আমাদের সুযোগ-সুবিধা খুব বেশী নাই—এ-কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যেটুকু আছে, তা ত্রিশ কোটি নরনারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে—এমনকি বিলাসিতার পক্ষেও যথেষ্ট।[২৩]

প্রেম ও সহানুভূতিই একমাত্র পন্থা। ভালবাসাই একমাত্র উপাসনা।[২৪]

আমার দৃঢ় ধারণা—কোন ব্যক্তি বা জাতি অন্য জাতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখে বাঁচতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি-সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানেই কোন জাতি নিজেকে পৃথক রেখেছে, সেখানেই তার পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হয়েছে।[২৫]

আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; ভারতকে যদি আবার উঠতে হয় তবে তাকে নিজের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং পরিবর্তে অপরে যা কিছু দেয়, তাই নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সম্প্রসারণই জীবন--সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু।[২৬]

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি নিজে স্বাধীনতা পাবার যোগ্য? আসুন, আমরা বৃথা চিৎকারে শক্তিক্ষয় না করে ধীরভাবে মানবতার সাথে কাজে লেগে যাই। আর আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি যে, কেউ কিছু পাবার ঠিক ঠিক উপযুক্ত হলে জগতের কোন শক্তিই তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। আমাদের জাতীয়-জীবন অতীতে মহৎ ছিল, তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত।[২৭]

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বই জন নরপশুই মৃত, প্রেত-তুল্য, কারণ হে যুবকবৃন্দ, যার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত

ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হোক, মাথা ঘুরতে থাকুক, তোমাদের পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হোক।[২৮]

বৎস, ভয় পেয়ো না। উপরে তারকাখচিত অসীম আকাশের দিকে সভয়ে তাকিয়ে মনে কোরো না, ওটা তোমাকে পিষে ফেলবে। অপেক্ষা কর, দেখবে—অল্পক্ষণের মধ্যে দেখবে, সবই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধা-বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে।[২৯]

অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন—এ আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে ওঠাতে হবে, গরীবদের খাওয়াতে হবে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে, আর পৌরোহিত্যের পাপ দূর করতে হবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন।[৩০]

নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করো, আর চারিদিকে বিস্তার করতে থাকো। উঠে পড়ে কাজে লাগো। নেতৃত্ব করার সময় সেবকভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও; আর একজন গোপনে অপরের নিন্দা করছে, তা শুনো না। অনন্ত ধৈর্য ধরে থাকো, সিদ্ধি তোমার করতলে।[৩১]

হে বীরহৃদয় বালকগণ, কাজে এগিয়ে যাও। টাকা থাক বা না থাক, মানুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার তো প্রেম আছে? ভগবান তো তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেউ রোধ করতে পারবে না।[৩২]

হঠাৎ কিছু করে ফেলা উচিত নয়। পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়—এই তিনটি, সর্বোপরি প্রেম সিদ্ধিলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। তোমার সামনে তো অনন্ত সময় পড়ে আছে, অতএব তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যদি পবিত্র ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মতো শত শত যুবক চাই, যারা সমাজের উপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে এবং যেখানে যাবে সেখানেই নবজীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করবে।[৩৩]

খবরের কাগজের আহাম্মকি বা কোন প্রকার সমালোচনার দিকে মন দিও না। মন মুখ এক করে নিজের কর্তব্য করে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে![৩৪]

কায়মনোবাক্য 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো

ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।[৩৫]

কারও উপর হুকুম চালাবার চেষ্টা করো না—যে অপরের সেবা করতে পারে, সে-ই যথার্থ সর্দার হতে পারে। যতদিন না শরীর যাচ্ছে, অকপটভাবে কাজে লেগে থাকো। আমরা কাজ চাই—নামযশ টাকাকড়ি কিছু চাই না।[৩৬]

তোমরা যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। ভারতকে -সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। এ না করলে চলবে না, কাপুরুষতা চলবে না—বুঝলে? মৃত্যু পর্যন্ত অবিচলিতভাবে লেগে পড়ে থেকে আমি যেমন দেখাচ্ছি, করে যেতে হবে—তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত।[৩৭]

যদি শাসন করতে চাও, সকলের গোলাম হয়ে যাও। এই হল আসল রহস্য।[৩৮]

...মনে রেখো—মেয়ে-মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে-পুরুষের ভেদ নেই।... হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলে-খেলার কাজ নেই—ছেলেখেলার সময় নেই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাত হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের।[৩৯]

এসো, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতের জন্য প্রার্থনা করি; দিনরাত তাদের জন্য প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব -গরিবদের আমি ভালোবাসি।[৪০]

যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। ...যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যেসব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।[৪১]

প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করে মূল প্রবাহ থাকে। ধর্মই ভারতের মূল

স্রোত; তাকে শক্তিশালী করা হোক, তবেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্রোতগুলিও তার সঙ্গে সঙ্গে চলবে।[৪২]

সবসময় তোমাদের এটা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, প্রত্যেক জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের চেষ্টায় নিজের উদ্ধারসাধন করতে হবে। সুতরাং অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা কোরো না।[৪৩]

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে। তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো—এই সবসময় বিবেকানন্দের প্রার্থনা।[৪৪]

আমি এমন কোন পথ পাইনি, যা সকলকে খুশী করবে; সুতরাং আমি স্বরূপতঃ যা, তাই-ই আমাকে থাকতে হবে—আমায় নিজ অন্তরাত্মার কাছে খাঁটি থাকতে হবে। 'যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নামযশও নশ্বর, এমন কি পর্বতও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধুলোয় পরিণত হয়; বন্ধুত্ব ও প্রেম ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী।'[৪৫]

গোড়াতেই একেবারে বড় বড় পরিকল্পনা খাড়া কোরো না, ধীরে ধীরে আরম্ভ কর। যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছ, সেটা কত শক্ত, তা বুঝে অগ্রসর হও, ক্রমে ওপরে ওঠবার চেষ্টা কর।[৪৬]

ভিতর থেকে যেরূপ প্রেরণা আসে, সেভাবে কাজ করা উচিত, আর যদি সেই কাজটা ঠিক ঠিক এবং ভাল হয়, তবে হয়তো মরে যাবার শত শত শতাব্দী পরে সমাজকে নিশ্চয়ই তাঁর দিকে ঘুরে আসতেই হবে। দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে সর্বান্তঃকরণে আমাদের কাজে লেগে যেতে হবে। একটা ভাবের জন্য যতদিন পর্যন্ত না আমরা আর যা কিছু সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, ততদিন আমরা কোন কালে আলো দেখতে পাবো না।[৪৭]

জগতের ইতিহাসে কি কখন এরূপ দেখা গেছে যে, ধনীদের দিয়ে কোন বড় কাজ হয়েছে? হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়েই চিরকাল যা কিছু বড় কাজ হয়েছে—টাকা দিয়ে নয়।[৪৮]

এইটি জেনে রেখো যে, যখনই তুমি সাহস হারাও, তখনই তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট করছ তা নয়, কাজেরও ক্ষতি করছ। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্যই সফলতালাভের একমাত্র উপায়।[৪৯]

চাই পূর্ণ সরলতা, পবিত্রতা, বিরাট বুদ্ধি এবং সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি। এই-সকল গুণসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে, তবে দুনিয়া ওলটপালট হয়ে যায়।[৫০]

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।' মিথ্যার সামান্য প্রলেপ থাকলে সত্যপ্রচার সহজ হয় বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভ্রান্ত। কালে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, বিষ—এক ফোঁটা মিশে গেলেও সমস্ত খাবার দূষিত করে ফেলে। যে পবিত্র ও সাহসী, সে-ই জগতে সব কাজ করতে পারে।[৫১]

ধর্মেই ভারতের জীবনীশক্তি। যতদিন হিন্দুরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জ্ঞান না ভুলে যাচ্ছে, ততদিন জগতে কোন শক্তি তাদের ধ্বংস করতে পারবে না।[৫২]

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর; নিজ ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করো না, গুরুজনের অধীন হয়ে চলা ছাড়া কখনই শক্তির কেন্দ্রীকরণ হতে পারে না। আর এরূপ বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করলে কোন বড় কাজ হতে পারে না।...ঈর্ষা ও অহংভাব তাড়িয়ে দাও—সঙ্ঘবদ্ধভাবে অপরের জন্য কাজ করতে শেখো। আমাদের দেশে এটার বিশেষ অভাব।[৫৩]

অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়—এই তিনটি জিনিস থাকলে যে-কোন সৎ আন্দোলনে অবশ্যই সফল হতে পারা যায়; এই হল সিদ্ধি-লাভের রহস্য।[৫৪]

'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'। ভারতে একটা জিনিসের বড়ই অভাব—একতা বা সংহতিশক্তি, তা লাভ করবার প্রধান রহস্য হচ্ছে আজ্ঞানুবর্তিতা।[৫৫]

বীরের মতো এগিয়ে চল। একদিনে বা একবছরে সফলতার আশা কোরো না। সবসময় শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকো। দৃঢ় হও, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দাও। নেতার আদেশ মেনে চল; আর সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানব-জাতির কাছে চিরবিশ্বস্ত হও; তা হলেই তুমি জগৎ কাঁপিয়ে তুলবে। মনে রাখবে—ব্যক্তিগত 'চরিত্র' এবং 'জীবন'ই শক্তির উৎস, অন্য কিছু নয়।[৫৬]

চতুর্দিকে অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আসে, উদ্দেশ্য ততই নিকটবর্তী হয়, ততই জীবনের প্রকৃত অর্থ—জীবন যে স্বপ্ন, তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে; কেন যে মানুষ এটা বুঝতে পারে না, তাও বোঝা যায়—তারা যে কেবলই চেষ্টা করে এসেছে যা অর্থহীন তার মধ্যে থেকে অর্থ খুঁজে নিতে। ...'সবই ক্ষণিক, সবই

পরিবর্তনশীল'—এইটুকু নিশ্চয়ই জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ-দুঃখ ত্যাগ করে জগৎবৈচিত্র্যের সাক্ষিমাত্ররূপে অবস্থান করেন, কোন কিছুতে আসক্ত হন না।[৫৭]

কেবল সংখ্যাধিক্য দিয়েই কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না; অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিংবা বাক্‌চাতুরী—এদের কোনটারই বিশেষ কোন মূল্য নাই। পবিত্র, খাঁটি এবং প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ লোকেরাই জগতে সব কাজ করে থাকেন। যদি প্রত্যেক দেশে এমন দশ-বারোটা মাত্র সিংহবীর্যসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা নিজেদের সমুদয় মায়াবন্ধন ছিন্ন করেছেন, যাঁরা অসীমের স্পর্শ লাভ করেছেন, যাঁদের সমগ্র চিত্ত ব্রহ্মানুধ্যানে নিমগ্ন, অর্থ যশ ও ক্ষমতার স্পৃহামাত্রহীন—তবে এই কয়েকজন লোকই সমগ্র জগৎ তোলপাড় করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।[৫৮]

আমরা যেন নাম, যশ ও প্রভুত্ব-স্পৃহা বিসর্জন দিয়ে কাজে ব্রতী হই। আমরা যেন কাম, ক্রোধ ও লোভের বন্ধন থেকে মুক্ত হই। তা হলেই আমরা সত্য বস্তু লাভ করব।[৫৯]

বড় বড় ব্যাপার কি কখনও সহজে নিষ্পন্ন হয়? সময়, ধৈর্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে কাজ হয়। আমি তোমাদের এমন অনেক কথা বলতে পারতাম, যাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু তা আমি বলব না। আমি লোহার মতো দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই, যা কিছুতেই কাঁপে না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো।[৬০]

আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চাই না। আমি কোন রকম রাজনীতিতে (Politics) বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।[৬১]

সকলে উঠিয়া-পড়িয়া না লাগিলে কি কাজ হয়? 'উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ' (উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই লক্ষ্মী লাভ হয়) ইত্যাদি। পেছু দেখতে হবে না—forward (এগিয়ে চল)। অনন্ত বীর্য, অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত সাহস ও অনন্ত ধৈর্য চাই, তবে মহাকার্য সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।[৬২]

পবিত্রতা, অধ্যবসায় এবং উদ্যম—এই তিনটে গুণ আমি একসঙ্গে চাই।[৬৩]

...পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সব বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে।[৬৪]

সাহস অবলম্বন কর ও কাজ করে যাও। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাও—এই একমাত্র উপায়।[৬৫]

যিনি হুকুম তামিল করতে জানেন, তিনিই হুকুম করতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর। ...আমরা সকলেই হম্‌বড়া, তাতে কখনও কাজ হয় না। মহা উদ্যম, মহা সাহস, মহা বীর্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়।[৬৬]

দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি Lower Class-দের education (নিম্নশ্রেণীদের শিক্ষা) দিতে পারো, তা হলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে—বিদ্যা শেখাতে পারো? বড়মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবেরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ? মানুষ কই? দেশে কি মানুষ আছে?[৬৭]

কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে; যেখানটা ভাল না বোধ হয় ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরকে criticise (বিরুদ্ধভাবে সমালোচনা) করাই সকল সর্বনাশের মূল! দল ভাঙবার ঐটি মূলমন্ত্র। 'ও কি জানে?' 'সে কি জানে?' 'তুই আবার কি করবি?'—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলসূত্র।[৬৮]

চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর।[৬৯]

নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু কিছু করিতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়—এই দোষেই আমাদের জাতের সর্বনাশ হইয়াছে। হৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল দুঃখের কারণ। অতএব ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিবে।[৭০]

পেছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন নাই। আগে চল! আমাদের চাই অনন্ত শক্তি, অফুরন্ত উৎসাহ, সীমাহীন সাহস, অসীম ধৈর্য, তবেই আমরা বড় বড় কাজ করতে পারবো।[৭১]

যে সকলের দাস, সেই সকলের প্রভু। যার ভালবাসায় ছোট বড় আছে, সে

কখনও অগ্রণী হয় না। যার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চ নীচ নাই, তার প্রেম জগৎ জয় করে।[৭২]

জগতের ধর্মগুলো এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে।[৭৩]

পবিত্র হও ও সর্বোপরি অকপট হও; মুহূর্তের জন্যও ভগবানে বিশ্বাস হারিও না—তা হলেই আলো দেখতে পাবে। যা-কিছু সত্য, তাই চিরস্থায়ী; কিন্তু যা সত্য নয়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।[৭৪]

...আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশী লোহার মতো দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত দিয়ে তৈরী, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটা মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ![৭৫]

...সকলে নিজেদের আদর্শ ধরে থাকো, আর অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল কোরো না—সত্যের জয় হবেই হবে। সর্বোপরি, তুমি যেন অপরকে চালাতে বা তাদের শাসন করতে, অথবা ইয়াঙ্কিরা যেমন বলে অপরের উপর 'boss' (মাতব্বরি) করতে যেও না, সকলের দাস হও।[৭৬]

ঐ যে কানে কানে গুজোগুজি করা—তা মহাপাপ বলে জানবে; ঐটা ভায়া, একেবারে ত্যাগ দিও। মনে অনেক জিনিস আসে, তা ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়। গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়।[৭৭]

...পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো—নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়, আর যারা 'আমার মুক্তি, আমার মুক্তি' করে দিনরাত মাথা ভাবায় তাহারা 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে বেড়ায়।[৭৮]

পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ।[৭৯]

হে বীরহৃদয় বালকেরা, অধ্যবসায় কর। আমাদের কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। কখনও নিরাশ হয়ো না, কখনও বলো না, 'আর না, যথেষ্ট হয়েছে।'[৮০]

আমি চাই, আমার সব ছেলেরা, আমি যত বড় হতে পারতাম, তার চেয়ে শতগুণ বড় হোক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা 'দানা' হতেই হবে—আমি বলছি,—অবশ্যই হতে হবে। আজ্ঞাবহতা, উদ্দেশ্যের উপর অনুরাগ ও সবসময় তৈরী হয়ে থাকা—এই তিনটে যদি থাকে, কিছুতেই তোমাদের হটাতে পারবে না।[৮১]

টাকা-ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে? মানুষ চাই—যত পাবে ততই ভালো।[৮২]

জগতের সমস্ত ধনসম্পদের চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান।[৮৩]

হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হয় না। আজই হোক, কালই হোক, শত শত যুগ পরেই হোক, সত্যের জয় হবেই, প্রেমের জয় হবেই। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? ঈশ্বরের সন্ধানে কোথায় যাচ্ছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সবাই কি তোমার ঈশ্বর নয়? আগে তাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করে কূপ খনন করছ কেন? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস কর। নামযশের ফাঁকা চাকচিক্যে কি হবে? খবরের কাগজে কি বলে না বলে, আমি সেদিকে লক্ষ্য করি না। তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে তো? তবেই তুমি সর্বশক্তিমান। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম তো? তা যদি হও, তবে তোমার শক্তি কে রোধ করতে পারে? চরিত্রবলে মানুষ সর্বত্রই জয়ী হয়। ঈশ্বরই তাঁর সন্তান-দের সমুদ্রগর্ভে রক্ষা করে থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাইছে।—তোমরা বীর হও।[৮৪]

আমরণ কাজ করে যাও—আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি, আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে।[৮৫]

স্বামীজী সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী

লিও টলস্টয়

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর টলস্টয় একটি চিঠিতে অনেন্দ্র কুমার দত্তকে লেখেন (অনেন্দ্র কুমার দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' গ্রন্থটি টলস্টয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন): 'আপনার পাঠানো চিঠি ও বইটি পেয়েছি। এজন্য অনেক ধন্যবাদ। বইটি অসাধারণ, এটি পড়ে অনেক শিক্ষালাভ করেছি। মানুষের "আমি"-র প্রকৃত স্বরূপ কি—এই প্রশ্নের দার্শনিক দিকটির আলোচনা অপূর্ব। মানবজাতি জীবনের মহৎ এবং সত্য আদর্শ থেকে বারবার সরে এসেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও তাকে অতিক্রম করতে পারেনি।'

বিবেকানন্দের প্রথম এই যে বইটি টলস্টয় পড়লেন, পড়ামাত্রই সেই গ্রন্থটি টলস্টয়ের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে এবং এটি চিরদিন তাঁর প্রিয় ছিল।

বিবেকানন্দের রচনাবলী সংগ্রহ করতে টলস্টয় সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বন্ধু ডি. পি. ম্যাকোভিটস্কিকে (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে টলস্টয়ের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সর্বক্ষণের সঙ্গী) বলেন: 'ঈশ্বর, আত্মা, মানুষ, ধর্মীয় ঐক্য ইত্যাদি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী।'

টলস্টয় অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বিবেকানন্দের রচনাগুলি পাঠ করেছিলেন। ঐ সমস্ত রচনায় যেসব অংশগুলি তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে সেই অংশগুলি তিনি লিখে নিয়েছিলেন এবং কিছু কিছু লাইনের তলায় দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত বইগুলি, যতদূর জানা যায়, খুঁজে পাওয়া যায়নি। টলস্টয়ের নিজের দিনলিপিতে এবং ম্যাকোভিটস্কির প্রতি-দিনের নোটের মধ্যে এই বইগুলির উপরে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুন টলস্টয় ম্যাকোভিটস্কিকে বলেন: 'আজ সকাল ছটা থেকে আমি বিবেকানন্দের কথা ভাবছি। গতকাল সারাদিন বিবেকানন্দের

গ্রন্থ পড়েছি। সেখানে "অন্যায়-প্রতিরোধে হিংসা-আশ্রয়ের যৌক্তিকতা" সম্পর্কে একটা অধ্যায় আছে। এটি অত্যন্ত প্রতিভাদীপ্ত রচনা।'

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন ডি. পি. ম্যাকোভিটস্কি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেনঃ 'গতকাল টলস্টয় স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর তিনটি খণ্ডের মধ্যে একটি খণ্ড সঙ্গে নিয়ে "হলে" এসেছিলেন। ...তিনি বললেন, "অসাধারণ বই। বারবার পড়ার মতো অনেক ভাব বইটিতে রয়েছে।"'

টলস্টয়ের ডায়েরীতে লিখিত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুনের একটি অংশ থেকে উদ্ধৃতিঃ

'"তুমি"-র মধ্যে "আমি" যে সম্পূর্ণ লোপ পেতে পারে—বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন—এই প্রথম অনুভব করলাম সেটি সম্ভব; এই প্রথম অনুভব করলাম ত্যাগের যৌক্তিকতার দিকটি। সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত এই ত্যাগ, কোনও স্বার্থের সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়।..."আমি" ও "আমার" এই ভয়ানক বাসনা থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন, কিন্তু তবুও তা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমিত্ব ত্যাগ যে সম্ভব সেটি আমি এখন—জীবনের শেষ প্রান্তে এসে—উপলব্ধি করতে পারছি। [আমার পক্ষে] এটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়।'

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই টলস্টয় তাঁর দিনলিপিতে লিখলেনঃ '"ভগবান" বিষয়ে বিবেকানন্দের প্রবন্ধটি পড়লাম। অদ্ভুত, অপূর্ব! এটা অনুবাদ করা প্রয়োজন। আমি নিজে এই সম্পর্কে ভেবেছি। শোপেনহাওয়ারের ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে মতবাদ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের সমালোচনা সর্বাংশে সত্য। শুধু যেখানে তিনি (বিবেকানন্দ) জগতের বস্তুগত বিচার দিয়ে শুরু করেছেন সেইটুকু ঠিক নয়।'

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ আগস্ট তারিখে সমাপ্ত 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' নামক একটি প্রবন্ধে টলস্টয় বিবেকানন্দের মূল্যায়ন করেছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর অনেক রচনার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি মানবসমাজকে পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষদের ভাবগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাবও গ্রহণ করবার উপর জোর দেন।

উল্লিখিত প্রবন্ধে তিনি লেখেনঃ 'প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানলাভের অনিবার্যতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমানকালে মানবজাতির অগ্রণী চিন্তাবিদগণের প্রধান দায়িত্ব। তাঁদের কর্তব্য মানুষের কাছে তুলে ধরা

যে, বহু পূর্বে এই প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান মানবজাতি অর্জন করেছিল এবং তা ধর্মের উপদেশ ও ঋষিদের বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। মানুষকে দেখানো ঃ এটা শুধুমাত্র ভারতীয়, মিশরীয়, গ্রীক এবং রোমান মহান ব্যক্তিদের মাধ্যমেই নয়, পরবর্তীকালে কান্ট, শোপেনহাওয়ার, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষী-দের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছিল।'

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি টলস্টয় বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার তৃতীয় খণ্ডটি একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে উপহার পান। ম্যাকোভিটস্কি এ-বিষয়ে তাঁর ডায়েরীতে লেখেনঃ টলস্টয় এই গ্রন্থটি পড়েছেন এবং বিবেকা-নন্দের রচনাবলীর অন্য দুটি খণ্ডের মতো এটিও তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনার একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা টলস্টয়ের মনে ছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে সমাপ্ত 'শিক্ষা সম্পর্কে' প্রবন্ধে সক্রেটিস, রুশো, কান্ট প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের পাশাপাশি বিবেকানন্দের নাম তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে টলস্টয় 'পোসরেদনিক প্রকাশন সংস্থা'র (এই সংস্থা টলস্টয়ের রচনাবলী প্রকাশ করত) সম্পাদককে বলেনঃ 'ভারতীয় আধুনিক চিন্তাবিদদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর লেখা প্রকাশ করা উচিত।'

টলস্টয় বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পাঠের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে চলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন তিনি 'ভেখি' (বিংশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগের রাশিয়ার দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ক রচনার সুপরিচিত সংকলন) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেনঃ 'রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, বিবেকানন্দ এবং যীশুর বাণীর মতো সম্পদ যাদের আছে তাদের কাছে "ভেখি" পাঠের কোন সার্থকতা নেই।'

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয়ের জীবনাবসান হয়। জীবনের শেষ বছরটিতে যেন তিনি বিবেকানন্দ-রচনাবলী এবং ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি অ্যানি বেশান্ত-এর 'থিয়োজফি অ্যান্ড মডার্ন সাইকোলজি' গ্রন্থটি সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেনঃ 'এ'র (বেশান্তের) বিষয়বস্তু হল যা-কিছু দুর্বল, যা-কিছু ভুল—তা-ই। আর বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন সত্যের উপর।'

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ এবং বিপ্লবী জান মাসারিকের (Jan Massaryk) সঙ্গে টলস্টয়ের সাক্ষাৎ হয়। টলস্টয় মাসারিককে বলেছিলেনঃ বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।[২]

যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো। তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই।[৩]

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান।

একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে। সে-অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।

বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।[৪]

আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। গণ্ডিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষিগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই

তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন; ইঁহারা বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে; পৃথিবীতে যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন তিনিই আমাদের আপন —তিনি ভারতের ঋষি হউন বা প্রতীচ্যের মনীষী হউন—তাঁহাকে লইয়া আমরা মানবমাত্রেই ধন্য।[৫]

...রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী, ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।[৬]

চরকা কাটা একটা বাহ্যক্রিয়া—এটাকে একটা লৌকিক আচার করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু আচার প্রায়ই প্রবল হয়ে বিচারকে উপেক্ষা করে। কোনো একটা অভ্যস্ত দৈহিক কর্মকে যখনি উচ্চ সাধনার মূল্য দেওয়া হয় তখনি সে আন্তর সত্যের চেয়ে বাহ্য আচারকে বড়ো জায়গা দেয়। আমাদের সমাজে তার অনেক প্রমাণ আছে। আরো একটা নতুন আচার যোগ করে আমাদের মনোবৃত্তির জড়তা তাতে বাড়ানো হবে বলে আশঙ্কা করি।

একা একা বসে যাঁরা চরকা কাটেন তাঁরা মনে মনে ভাবতে পারেন যে চরকা কেটে সুতো উৎপাদন করে তাঁরা দেশের ধন বৃদ্ধি করচেন। কিন্তু একথা মনে রাখতে বেশী লোকে বেশী দিন পারবে না—ক্রমেই এটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়ে বুদ্ধিকে ম্লান করেই দেবে।

বস্তুত চরকা কাটো একথার মধ্যে কোনো মহৎ অনুশাসন নেই এইজন্যে একথায় পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েচে তখনি শক্তি দিয়েচে।

সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ-মনকে বিচিত্র ভাবে প্রাণবান করেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙ্গুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান করে দেয়, কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।[৭]

শ্রীঅরবিন্দ

একজন অশিক্ষিত হিন্দু যোগী, যিনি আত্মদীপ্ত ভাবোন্মাদ মিস্টিক—যাঁর মধ্যে বিদেশী শিক্ষার সামান্যতম স্পর্শ বা চিহ্ন ছিল না—কলকাতার সর্বোত্তম শিক্ষিত যুবকেরা যখন তাঁর চরণতলে প্রণত হল, তখন যুদ্ধজয় হয়ে গিয়েছে। বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁর গুরু বলেছিলেন, তিনি জগৎকে দুহাতে ধরে বদলে দেবার মতো শক্তিমান পুরুষ, সেই বিবেকানন্দের যাত্রা জগতের সামনে প্রথম প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিল, ভারত জেগেছে—শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়—জয় করবার জন্য সে জেগেছে।[৮]

যাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) পাদস্পর্শে পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগ সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে-শক্তির সামান্যমাত্র উন্মেষে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে; যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতার-গণের সমষ্টিস্বরূপ; তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই একথা আমরা বিশ্বাস করি না—আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতকে, ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবি করেন নাই।

লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না—তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধকভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, এটা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, 'তুই যে বীর রে'! তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে-শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাবে সাধনা করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবদ্‌বাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে 'তুই যে বীর রে'![৯]

যীশুখ্রীষ্ট সেন্ট পলকে উপযুক্ত আধার মনে করিয়া প্রথমে তাঁহাকেই গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, সমস্ত ইউরোপ তাঁহার পদতলে। ছবির মতো স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে, সেন্ট পল রোমে দাঁড়াইয়া যে ভাব প্রচার করিতেছেন, সেই ভাব সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তেমনি যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভারত তাঁহার নিকট আসিয়াছে, সমস্ত ভারত তাঁহার পদতলে মস্তক লুটাইতেছে, সমস্ত ভারত তাঁহাকে সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছে। ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাই বারিসিঞ্চনে বর্ধিত করিয়াছিলেন। তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে অতি যত্নে গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, ইঁহার দ্বারাই ভারতের এবং সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে। তিনিও ছবির মতো প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন যে, স্বামীজী তাঁহার আদেশ সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করিতেছেন। বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয়-জীবন গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা। তাই কাল যাহা তাঁহার আদর্শ ছিল, আজ সেই আদর্শ লইয়া ভারতবাসী জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছে।[১০]

৬ চৈত্র রবিবার (১৩১৬) আমরা বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। সে রামকৃষ্ণ নাই, সে বীর তেজস্বী বিবেকানন্দ নাই, কিন্তু তাঁহাদের শক্তি, তাঁহাদের ভাব সমগ্র ভারতকে অমরত্ব দিবার জন্য মহাশক্তি ধারণপূর্বক ছুটিয়াছে। সম্মুখে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকে অমৃতবারি-

সিঞ্চনে বরণ করিয়া লইতেছে, অতিথির বেশে স্বদেশ মূর্তি ধারণ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতেছে।[১১]

রামকৃষ্ণ কি ছিলেন? মানুষী আধারে প্রকট ভগবান। আর বিবেকানন্দ—মহাদেবের নয়ননিঃসৃত এক দীপ্ত কটাক্ষ। —কিন্তু তাঁর পিছনে ছিল সেই ভাগবত দৃষ্টি যা থেকে উদ্ভূত বিবেকানন্দ, মহাদেব স্বয়ং, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বিশ্বাতীত ওম্।

বিবেকানন্দের প্রভাব এখনো বিপুলভাবে কাজ করে চলেছে আমরা দেখতে পাই—ঠিক জানি না কী রূপে, বলতে পারি না কোথায়, এমন কিছুতে যা এখনো স্পষ্ট নয়; এমন কিছু যা সিংহপ্রতিম, বিরাট, সম্বোধিদীপ্ত; যা সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে এবং তা দেখে আমরা সোচ্ছ্বাসে বলে উঠি, ঐ দেখ, বিবেকানন্দ এখনো জেগে মাতৃমর্মে, মাতৃ-সন্তানদের মর্মলোকে।

মাদ্রাজী পণ্ডিতের প্রতি বিবেকানন্দের প্রসিদ্ধ উক্তিটিই ধরো। তাঁর কি একটা কথায় সংশয় প্রকাশ করে পণ্ডিত বলেছিলেন, 'কিন্তু শঙ্কর তো তা বলেন না।' তাতে বিবেকানন্দের জবাব, 'না, আমি বিবেকানন্দ, তা বলছি।' পণ্ডিত একেবারে হতবাক।

'আমি বিবেকানন্দ'—তাঁর এই কথা সাধারণের কাছে হিমালয়প্রমাণ অহমিকার মতো শোনাবে। কিন্তু বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় কিছু ভুয়ো বা ঝুটো ছিল না। আর এ তাঁর অহমিকা নয়, এ একটি অতি মহতের বোধ, যেজন্য তাঁর জীবন, যাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁর সংগ্রাম—তাকে কেউ খর্ব বা তুচ্ছ করবে, তা তাঁর সহ্য হত না।[১২]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুর আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইস্টিশনে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। —শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে। কেন—তাঁহার তো অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন—

তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে তুমি ততটুকু কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি-জয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইস্টিশনে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাতে যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্ষপার (Oxford) ও কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম। বড় বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বেদান্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঐ অধ্যাপকেরা যে-সকল চিঠি আমাকে লিখিয়াছেন তাহা আমি ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঝিতে পারা যাইবে বিলাতে বেদান্তের প্রভাব কিরূপ গভীর হইয়াছিল। আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এতবড় একটা কাজ হইয়া গেল—তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মতো। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি। তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে। বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্ত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।

আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলিকাতার হেদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? এস—একবার কলিকাতা শহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের বোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব, তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো। —বিবেকানন্দ কাতরস্বরে বলিল—ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না (তাঁহার তিরোভাবের ঠিক ছয় মাস পূর্বের কথা)—যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি—তাহার জন্য ব্যস্ত আছি—আমার অবসর নাই। সেই দিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময় ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা। আর্যজ্ঞান আর্যসভ্যতা বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে যাহা ইতর, যাহা অনার্য তাহাই

সূক্ষ্মকে, উদার বস্তুকে, আর্যতত্ত্বকে পরাভূত করিতেছে—আর তোমার সাড়া নাই, ব্যথা নাই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল। সেই সাড়া এত গভীর যে, উহাতে মার্কিন ও য়ুরোপের চৈতন্য হইয়াছিল। ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে! দেশের জন্য ব্যথা কখনও শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।[১৩]

স্বামীজী! আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি—বনভোজন করিয়াছি—গল্পগাছা করিয়াছি। তখন জানিতাম না যে, তোমার প্রাণে সিংহবল আছে, তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয় পর্বত-ভরা ব্যথা আছে। আজ আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি।...এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি—অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি—তোমার সিংহবলের কথা ভাবি—তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি—অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্যালোক দিব্যশক্তি আসিয়া প্রাণমনকে ভরপুর করিয়া ফেলে।[১৪]

বালগঙ্গাধর তিলক

স্বামী বিবেকানন্দের নাম জানেন না এমন কোন হিন্দু আছেন কিনা সন্দেহ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জড়-বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হয়েছে। এ অবস্থায় ভারতবর্ষের শত সহস্র যুগ-সঞ্চিত অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে অপূর্ব ব্যাখ্যার সাহায্যে উপস্থাপিত করে পাশ্চাত্যের মনীষিমণ্ডলীর কাছ থেকে প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা লাভ করা এবং সেই সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জননীস্বরূপা ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব সৃষ্টি করা অতিমানবিক শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। ইংরেজি শিক্ষার সাহায্যে জড়-বিজ্ঞানের বন্যা যেভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার গতিপথ পরিবর্তন করতে অসাধারণ মনীষার প্রয়োজন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি এই কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু এটা অবিসংবাদিত সত্য যে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম পাশ্চাত্যের জড়-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের পতাকাটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।...

ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার এই সুকঠিন দায়িত্ব স্বামী বিবেকানন্দই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী পিছিয়ে গেলে আমরা কেবল শঙ্করাচার্যকেই পাই যিনি আর একটি বিশাল ব্যক্তিত্ব। শঙ্করাচার্য আমাদের ধর্মের পবিত্রতার কথা কেবল মুখেই বলেননি; এই ধর্মই যে আমাদের শক্তি ও সম্পদ এবং জগতের সর্বত্র এই ধর্মের প্রচার করা যে আমাদের পবিত্র কর্তব্যের অন্তর্গত—একথা তিনি শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের সমান মাপের ব্যক্তি...।[১৫]

বিপিনচন্দ্র পাল

বিবেকানন্দ একা নন। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শুধু ভারতবর্ষের নয়, বর্তমান কালের বৃহত্তর পৃথিবীর আধুনিক মানুষের সম্বন্ধ-বিচারে এই দুইজন প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্মিলিত হয়ে আছেন। বর্তমান যুগের মানুষ শুধুমাত্র বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েই পরমহংসদেবকে বুঝতে পারে, তেমনি আবার বিবেকানন্দকেও তাঁর গুরুর জীবনালোকেই বুঝতে পারা যায়। তাঁর গুরু ছিলেন এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি। অতএব সে-যুগে 'যুক্তিবাদে'র বাঁধা বুলিতে বিভ্রান্ত মানুষের কাছে তিনি অবশ্যম্ভাবীভাবে এক রহস্যময় মানুষরূপে দেখা দিয়েছিলেন। বস্তুত এই যুক্তিবাদের অর্থ, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণস্বরূপ যে ভাবুকতা, তার অভাব ভিন্ন আর কিছু নয়। ভাব আর খেয়াল এক জিনিস নয়। ভাব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগম্য এক বোধশক্তি। রামকৃষ্ণের আবির্ভাব যে-যুগে, সে-যুগে ভাবুকতার দৈন্য দেখা দিয়েছিল। কাজেই সে-যুগের নিকট তিনি এক দুর্বোধ্য রহস্য।

পরমহংসদেবের জীবনবেদ ও বাণী এ-যুগের মানুষের বোঝবার উপযোগী ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রচারের ভার বিবেকানন্দের উপর ন্যস্ত হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন সম্প্রদায় বা নামের গণ্ডির মধ্যে ছিলেন না, অথবা অন্যভাবে এটাও বলা চলে যে, তিনি ভারতীয় ও অভারতীয় সব সম্প্রদায় ও নামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি 'সর্বজনীনতাবাদী', কিন্তু তাঁর

সর্বজনীনতা বস্তুনিরপেক্ষ সর্বজনীনতা নয়। বিশ্বজনীন ধর্মকে উপলব্ধি করতে তিনি বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্জন করেননি। সূর্য ও ছায়ার মতো তাঁর কাছে 'শাশ্বত' ও 'বিশিষ্ট' সর্বদা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরাজ করত। সেজন্য জীবন ও চিন্তার অনন্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে তিনি সর্বজনীন সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। গুরুর এই উপলব্ধিকে বিবেকানন্দ আধুনিক 'মানবতা'র বেশ পরিয়েছিলেন।...

সাধারণত দেখা যায় সত্যদ্রষ্টাগণ অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে থাকেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না; যীশুও ছিলেন না. মানুষের আধ্যাত্মিক নেতৃগণের মধ্যে কেউ ছিলেন না। জনসাধারণ তাঁদের বুঝতে পারে না; সবচেয়ে কম বুঝতে পারেন তাঁদের সমকালের পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা। তবুও দর্শন যাকে অন্ধকারে খুঁজে বেড়ায় তাঁরা তাই-ই প্রকাশিত করে যান। যীশুখ্রীষ্টের মতো রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও ব্যাখ্যা করার জন্য এবং সে-যুগের মানুষের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেবার জন্য, একজন ভাষ্যকারের প্রয়োজন ছিল। সন্ত পলের মধ্যে যীশু এইরকম একজন ভাষ্যকার পেয়েছিলেন; বিবেকানন্দের মধ্যে রামকৃষ্ণ তাঁকে লাভ করলেন। অতএব রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপলব্ধির আলোকেই বিবেকানন্দকে বুঝতে হবে।..

বিবেকানন্দের বাণী সাধারণের উপযোগী বৈদান্তিক চিন্তাধারা অবলম্বনে প্রচারিত হলেও আসলে তা আধুনিক কালের মানুষের কাছে তাঁর গুরুর বাণী। প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের বাণী আধুনিক 'মানবতা'র বাণী। স্বদেশবাসীদের কাছে তাঁর আবেদন ছিল, 'তোমরা মানুষ হও।'. .

সমস্ত ধর্মীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মানুষকে তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। বিবেকানন্দ যখন তাঁর দেশবাসীদের মানুষ হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন তিনি আসলে এইকথাই বুঝাতে চেয়েছিলেন। দেবতার পূজার সময় ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রটি ব্যবহার করেনঃ 'আমি ব্রহ্ম। এছাড়া আমি আর কেউ নই। আমি শোক-তাপের অতীত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।' পরমহংসদেবের এই বাণীই বিবেকানন্দ বর্তমান পৃথিবীকে দিয়ে গিয়েছেন।...[১৬]

ভারতে কেউ কেউ মনে করেন. ইংলন্ডে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি, তা তাঁর হিতৈষী ও ভক্তবৃন্দের অতিরঞ্জিত বর্ণনা ছাড়া আর

কিছু নয়। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম সর্বত্র তিনি এক সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে গিয়েছেন। ইংলন্ডের অনেক জায়গায় আমি এমন অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছি যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। একথা সত্য যে আমি তাঁর সম্প্রদায়ের লোক নই এবং তাঁর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আমার মতপার্থক্য আছে, তবুও আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, বিবেকানন্দের প্রভাবে এখানে অনেকের চোখ খুলে গিয়েছে এবং হৃদয় প্রসারিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষার গুণেই এখানকার অধিকাংশ লোক আজকাল বিশ্বাস করে যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রগুলোর মধ্যে বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলো নিহিত আছে। শুধু যে এই ভাবটি তিনি জাগিয়েছেন তা নয়, ইংলন্ড ও ভারতের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে তিনি সফল হয়েছেন।

মিঃ হাউইস্ (Mr. Haweis) -এর লেখা 'বিবেকানন্দ-বাদ' ও 'দি ডেড্ পাল্পিট' শীর্ষক প্রবন্ধ হতে আমি যে-উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম, তা হতে সকলে স্পষ্ট বুঝেছেন যে, বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারের ফলেই শত শত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। বাস্তবিক, এদেশে তাঁর কাজের গভীরতা ও ব্যাপকতা নিচের ঘটনাটি হতে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

কাল সন্ধ্যায় লন্ডনের দক্ষিণপ্রান্তে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলায় রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে কোন্ দিকে যাব ভাবছিলাম, এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা একটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে আসলেন—মনে হল আমাকে পথ দেখাবার অভিপ্রায়ে এসেছেন। তিনি আমাকে বললেন, 'মশায়, নিশ্চয়ই পথ খুঁজে পাচ্ছেন না? আমি সাহায্য করতে পারি কি?' তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাগজে দেখেছি আপনি লন্ডনে আসছেন। আপনাকে প্রথম দেখামাত্রই আমি আমার ছেলেকে বলছিলাম, "ঐ দেখ—স্বামী বিবেকানন্দ"!' তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরবার জন্য অতি দ্রুত চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, তাঁকে বলবার সময় পাইনি যে, আমি বিবেকানন্দ নই। বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে না জেনেই তাঁর প্রতি স্ত্রীলোকটির এমন শ্রদ্ধার ভাব দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। এই মধুর ঘটনাতে আমি খুবই তৃপ্তিলাভ করলাম এবং যার দৌলতে এই সম্মান পেলাম সেই গেরুয়া পাগড়ীকে ধন্যবাদ জানালাম।[১৭]

মহাত্মা গান্ধী

আজ (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে এখানে (বেলুড় মঠে) এসেছি। তাঁর রচনাবলী আমি অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে অনুশীলন করেছি এবং সেগুলি পাঠ করার পর আমার মাতৃভূমির প্রতি আমার ভালোবাসা সহস্রগুণ বেড়ে গিয়েছে। হে যুবকবৃন্দ! যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বাস করেছেন এবং শরীর ত্যাগ করেছেন সেই পুণ্যভূমির কিছু মাহাত্ম্য আত্মস্থ না করে তোমরা শূন্য-হাতে ফিরে যেয়ো না—তোমাদের কাছে এই আমার আবেদন।[১৮]

জওহরলাল নেহরু

স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন অতীত ভারতের ভাবধারায় অভিস্নাত এবং প্রাচীন ভারতের গৌরবে গৌরবান্বিত, অন্যদিকে তেমনি মানুষের জীবন-সমস্যার বিষয়ে আধুনিক মনোভাবাপন্ন। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের মধ্যে তিনি ছিলেন একপ্রকার মিলনসেতু।...

অনন্যসাধারণ পুরুষ। সম্ভ্রম-উদ্রেককারী ব্যক্তিত্ব। সর্বদা মানসিক সমতা রক্ষা করতে সক্ষম। মর্যাদাসম্পন্ন। নিজের এবং নিজের জীবনব্রত সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়। সক্রিয় জ্বলন্ত শক্তিতে তিনি ভরপুর। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা সবসময় তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল। হতাশ আদর্শ-ভ্রষ্ট হিন্দু-মানসে তিনি সঞ্চার করেছিলেন শক্তি। তাকে দান করেছিলেন আত্মবিশ্বাস এবং অতীত সম্পদের কিছুটা উত্তরাধিকার।[১৯]

বর্তমানকালের যুবসমাজের কতজন স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনা-বলী পড়ে থাকেন, আমার জানা নেই। তবে আমাদের সময়ের অনেকেই যে তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন—একথা আমি আপনাদের বলতে পারি. এবং আমি মনে করি তাঁর বাণী ও রচনা পাঠ করলে এখনকার লোকেদেরও প্রভূত কল্যাণ হবে; তা থেকে অনেক কিছুই তাঁরা শিখতে পারবেন। যে-আগুন স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত অন্তঃকরণ জুড়ে প্রজ্বলিত ছিল, যে-আগুন শেষ-পর্যন্ত তাঁর অকালে দেহরক্ষার কারণ হল, সেই আগুনের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি সম্ভব তাঁর বাণী ও রচনার অনুশীলনের মাধ্যমে—যেটি আমাদের সময়কার কেউ কেউ করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ের ঐ আগুনের জন্যই...তিনি যা বলতেন

তা কোন ফাঁকা বুলি ছিল না। তাঁর বাণীর মধ্যে তিনি তাঁর সর্বসত্তা ঢেলে দিতেন। এইজন্যই তিনি একজন মহান বাগ্মী হতে পেরেছিলেন। বাগ্মীসুলভ পটুতা বা বাক্যবিন্যাসের দ্বারা শুধু নয়, গভীর প্রত্যয় এবং আন্তরিকতার শক্তিতে। তাই তিনি ভারতের বহু মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং পরবর্তী দুই-তিন প্রজন্মের যুবসমাজ নিঃসন্দেহে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।...

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনাবলী পড়লে, সেগুলোর যে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটি আপনাদের চোখে পড়বে তা হচ্ছে—সেগুলো একটুও পুরনো নয়। আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে (জওহরলাল নেহরু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বক্তৃতাটি করেছিলেন) উচ্চারিত হলেও সেগুলো আজও নতুন, আজও প্রাসঙ্গিক। কারণ, তিনি তাঁর বক্তৃতা ও রচনায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার কতগুলো মূল বিষয় ও দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই তাঁর বাণী ও রচনা কখনও পুরনো হবার নয়। আজকে পড়লেও সেগুলো নতুন বলেই মনে হয়। বস্তুত, তিনি আমাদের এমন কিছু দিয়েছেন যার ফলে আমাদের অতীত সম্পদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একপ্রকার গর্বের মনোভাবেরই সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কিন্তু আমাদের ছেড়ে কথা বলেননি। আমাদের দুর্বলতা এবং ভুলত্রুটির কথাও বলেছেন। কোন কিছুই লুকোতে চাননি তিনি আর সেটা তাঁর উচিতও হত না। আমাদের ভুলত্রুটি অক্ষমতা দূর করতে হবে, তাই তিনি সেগুলো নিয়েও আলোচনা করেছেন। কখনও কখনও তিনি কঠোরভাবে আমাদের কশাঘাত করেছেন। আবার কখনও বা তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন সেইসব মহান আদর্শের প্রতি, অতীত ভারতবর্ষ যে-আদর্শগুলির প্রতিভূস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল; যে-আদর্শগুলি অবলম্বন করে ভারতবর্ষ তার অধঃপতনের দিনেও স্বীয় মহিমা কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছিল।

কাজেই স্বামীজী যা লিখেছেন বা বলেছেন, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পরেও সেগুলির গুরুত্ব বা আকর্ষণ নিশ্চয়ই অনুভূত হবে এবং সম্ভবত অনাগত বহুকাল ধরে সেগুলি আমাদের প্রভাবিত করে চলবে। সাধারণ অর্থে রাজনীতিবিদ বলতে যা বোঝায়, স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে তা ছিলেন না। তবুও তিনি ছিলেন ভারতের আধুনিক জাতীয় আন্দোলনের একজন স্রষ্টা।

আপনারা মনে করলে এর বদলে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁকে এইরকমই মনে করি। পরবর্তীকালে যাঁরা জাতীয় আন্দোলনে কমবেশী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকেই সেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। প্রত্যক্ষভাবেই হোক কিংবা পরোক্ষ-ভাবেই হোক, আজকের ভারতবর্ষকে তিনি প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছেন। প্রজ্ঞা, তেজ এবং শক্তির এই যে প্রবাহ স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে উৎসারিত হয়েছে, আমি মনে করি, আজকের তরুণ-তরুণীরা তার সদ্ব্যবহার করতে ভুলবে না।[২০]

সুভাষচন্দ্র বসু

(ছাত্রাবস্থায়) এমন একটা আদর্শের তখন আমার প্রয়োজন ছিল, যার উপরে ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারব—সবরকম প্রলোভন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। এমন একটি আদর্শ খুঁজে বের করা সহজ ছিল না। মানসিক অশান্তি আমাকে ভোগ করতে হত না, যদি আমি আর দশজনের মতো জীবনের দাবিকে সহজভাবেই মেনে নিতাম কিংবা দৃঢ়-ভাবে জীবনের সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছ করে যে-কোনো একটা আদর্শকে আঁকড়ে ধরতাম। কিন্তু কোনোটাই আমি পারিনি। জীবনের সাধারণ প্রলোভনে ধরা দিতে আমি রাজী ছিলাম না, কাজেই সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।...

হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই যেন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। আমাদের এক আত্মীয় (সুহৃৎচন্দ্র মিত্র) নতুন কটকে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বই ঘাঁটছি হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলোর উপর। কয়েক পাতা উলটেই বুঝতে পারলাম, এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ী নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। প্রধানশিক্ষক মশাই আমার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকবোধ জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—জীবনে এক

নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন—কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেননি যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম।...মানবজাতির সেবা এবং আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। আদর্শ হিসেবে মধ্যযুগের স্বার্থসর্বস্ব সন্ন্যাসী-জীবন কিংবা আধুনিক যুগের মিল ও বেন্থামের 'ইউটিলিটারিয়ানিজম্' কোনোটাই সার্থক নয়। মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশের সেবাও বুঝেছিলেন। তাঁর জীবনীকার ও প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা লিখে গেছেন, 'মাতৃভূমিই ছিল তাঁর আরাধ্যা দেবী। দেশের এমন কোনো আন্দোলন ছিল না যা তাঁর মনে সাড়া জাগায়নি।'...বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'বল ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' তিনি বলতেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, একে একে সকলেরই দিন গিয়েছে, এখন পালা এসেছে শূদ্রের—এতদিন পর্যন্ত যারা সমাজে শুধু অবহেলাই পেয়ে এসেছে। তিনি আরো বলতেন, উপনিষদের বাণী হল, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—চাই শক্তি, নইলে সবই বৃথা। আর চাই নচিকেতার মতো আত্মবিশ্বাস।...

বিবেকানন্দের আদর্শকে যে-সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম তখন আমার বয়স বছর পনেরও হবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। তাঁর আদর্শ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশালতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা তখন আমার ছিল না—কিন্তু কয়েকটা জিনিস একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম।... স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।...

যে পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছিলাম সেটা মোটামুটি উদারভাবাপন্ন হলেও অনেক ক্ষেত্রে সমাজ ও পরিবারের বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। আমার বয়স যখন চোদ্দ কি পনের সে-সময়কার একটি ঘটনার কথা

বলি। প্রতিবেশী আমার এক সহপাঠী (দেবেন দাস) একদিন আমাদের কয়েক-জনকে তার বাড়ীতে খেতে বলে। মায়ের কানে কথাটা যেতেই তিনি স্রেফ আমাদের যেতে বারণ করে বসলেন। হয়তো বন্ধুটি আভিজাত্যে আমাদের চাইতে ছোটো ছিল কিংবা আমাদের চেয়ে নীচু জাতের ছিল বলেই মা আপত্তি করেছিলেন, কিংবা হয়তো বাইরে খেলে অসুখ-বিসুখ হতে পারে এরকম আশঙ্কা করেছিলেন। আমরাও বাস্তবিকই বাইরে খুব কমই খেতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে মায়ের আপত্তি আমার কাছে অত্যন্ত অসঙ্গত বলে মনে হল। আমি মায়ের নিষেধ অমান্য করেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম—এবং এতে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দও যেন অনুভব করেছিলাম। পরে যখন ধর্মচর্চা ও যোগ-সাধনা উপলক্ষে অনেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ত, অনেক জায়গায় যেতে হত—তখন প্রায়ই বাবা-মার নিষেধ অমান্য করতে হয়েছে। কিন্তু তার জন্য মনে কিছুমাত্র দ্বিধাও জাগেনি, কারণ তখন বিবেকানন্দের আদর্শ আমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি—বিবেকানন্দ বলতেন আত্মোপলব্ধির জন্য সব বাধাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে।[২১]

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণাস্থল। তিনি চেয়েছিলেন, যুব সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার মনোভাব সঞ্চারিত করতে; আর চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধকে জাগিয়ে তুলতে। স্বামীজী কোন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেননি। কিন্তু যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন বা তাঁর লেখা পড়েছেন তাঁদের মধ্যেই একটা দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক মানসিকতা গড়ে উঠেছে। অন্তত বঙ্গভূমির ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক জনক হিসেবে সম্মানিত হবার যোগ্য। অত্যন্ত অল্প বয়সে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর দেহান্তের পর তাঁর প্রভাব আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছে।[২২]

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই আমি আত্মহারা হয়ে যাই। খুব কম লোকের পক্ষে, এমনকি তাঁর সংস্পর্শে থাকার সুবিধা যাঁদের হয়েছিল তাঁদের পক্ষেও তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা বা তাঁকে গভীরভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব বলেই মনে করি। সুগভীর, জটিল ও ঋদ্ধিসমন্বিত ব্যক্তিত্ব—তাঁর বক্তৃতা ও লেখা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অথচ তাঁর এই বক্তৃতা ও

লেখার দ্বারাই তিনি তাঁর আশ্চর্য প্রভাব দেশবাসীর উপর, বিশেষত বাঙালীর উপর বিস্তার করেছিলেন। এই রকমের বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালীর মনকে যেমন আকৃষ্ট করে, এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বেহিসেবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন স্বামীজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী; ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত স্বামীজী মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির নির্মম সমালোচক ছিলেন, অথচ সারল্য ছিল তাঁর শিশুর মতো। আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল।...

স্বামীজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে সংগ্রামী, সেইজন্য তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক। তিনি তাই দেশ-বাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'শক্তি শক্তি, শক্তির কথাই উপনিষদ্ বলেছেন',—স্বামীজী এইকথাই বারবার বলেছেন। চরিত্রগঠনের উপর তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয় কিছু বলা হবে না, এমনি ছিলেন তিনি মহৎ, এমনি ছিল তাঁর চরিত্র—যেমন মহান তেমনি গভীর। তাঁর বিষয় বলতে গেলে বলতে হবে যে, তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চতম স্তরের যোগ্য—সত্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ, জাতির ও মানব সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম। স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান বাংলার স্রষ্টা—একথা বললে বোধ হয় ভুল করা হবে না।[২৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব, একথা বলাই বাহুল্য।[২৪]

স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন। আমাদের সময়ের ছাত্রসমাজ স্বামীজীর রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা যেরূপ প্রভাবিত হইয়া-

ছিল, সেরূপ আর কাহারও দ্বারা হয় নাই—তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত একযোগে না দেখিলে স্বামীজীকে যথার্থভাবে বিচার করা যাইবে না। স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমানের মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভূমি হইলে চলিবে না—তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের একত্র বাস-ভূমি হইতে হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে বাণী—ধর্মসমন্বয়—তাহা ভারতবাসীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হইবে।...

স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি মহৎ। তাঁহার শিক্ষায় দেশবাসী অভূতপূর্ব আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ লাভ করিয়াছে।[২৫]

রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সর্বধর্ম-সমন্বয় ও সকল-মত সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তাবোধ নির্মিত হইতে পারিত না।...

রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আকাঙ্ক্ষা চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তখনও দেখা দেয় নাই—কারণ তখনও ভারতবাসী পরাধীনতার মোহনিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিতেছিল যে, ইংরাজের ভারতবিজয় একটা দৈব ঘটনা বা Divine dispensation। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ডরূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। 'Freedom, freedom is the song of the Soul.' —এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া, আচরণের ভিতর দিয়া, কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া এই সত্যই বাহির হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন, এবং অপরদিকে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের প্রচারে ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেন।[২৬]

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw Him' পুস্তকে বলেছেন, 'The queen of his adoration was his Motherland.'—অর্থাৎ তাঁর আরাধনার দেবী ছিল তাঁর মাতৃভূমি। পুরোহিত, উচ্চবর্ণ এবং বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখায়...আক্রমণ চালিয়েছিলেন...। সেসব কথা বলা একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকের পক্ষেও বিশেষ প্রশংসার বিষয়।

আপনারা যাকে আধ্যাত্মিক ভণ্ডামি বলতে পারেন স্বামীজীর মধ্যে তার বিন্দুমাত্র আভাসও ছিল না। তাঁর চোখে এসব অসহ্য বোধ হত। বকধার্মিক-দের উদ্দেশ করে তিনি বলতেনঃ 'Salvation will come through football and not through Gita.' নিজে বৈদান্তিক হয়েও তিনি ভগবান বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধ সম্বন্ধে এমন অনুরাগ ও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'স্বামীজী, আপনি কি বৌদ্ধ?' তৎক্ষণাৎ তাঁর মন ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেনঃ 'কি বৌদ্ধ? আমি বুদ্ধের সেবকের সেবক—তস্য সেবক।' বুদ্ধের সম্মুখে তিনি নিজেকে ধুলার মতো নত করে দিতেন। স্বামীজী প্রায়ই বলতেন—'শঙ্করাচার্যের মনীষা, বুদ্ধের হৃদয়বত্তাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।'

এইভাবে তিনি একদিন খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তখনই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ 'যীশুখ্রীষ্টের সময় আমি জীবিত থাকলে আমি আমার চোখের জলে নয়,—বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।' অবনমিতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল সমুদ্র সমান। তাঁর সেই বাণী কি আমাদের স্মরণ আছে?—'দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'[২৭]

স্বামী বিবেকানন্দই বাংলার ইতিহাসকে নতুন পথে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'মানুষ তৈরীই আমার জীবনব্রত'। মানুষ তৈরীর ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে তাঁর মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখেননি—তিনি সমগ্র সমাজকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাঁর অগ্নিময়ী বাণী এখনো বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হচ্ছে—'নতুন ভারত বেরুক হাট থেকে, বাজার থেকে, কল-কারখানা থেকে।'

কার্ল মার্কসের গ্রন্থ থেকে এই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়নি। ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতিতে এর উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ যে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রচনায় ও কর্মে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল।...

জাতিগঠনের প্রথম ভিত্তি—মানুষ তৈরী, তারপরেই সংগঠন। স্বামীজী ও অন্যান্যরা মানুষ তৈরী করতে চেষ্টা করেছেন, এবং দেশবন্ধু চেয়েছেন রাজনৈতিক সংগঠন।[২৮]

আমাদের হীন মনোবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে আর একটি বিষয়ে উল্লেখ না করিয়া পারি না। আজকাল জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজের মধ্যে একপ্রকার লঘুতা ও বিলাসপ্রিয়তা যেন প্রবেশ করিয়াছে—অথচ আজকাল দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কি সত্য? যদি তাহা হয় তবে তাহার কারণ কি? আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন ছাত্রমহলে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের' খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণ সমাজের মধ্যে ঐ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই! তার পরিবর্তে নাকি লঘুত্বপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ সাহিত্যের খুব প্রচার হইয়াছে। একথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্যসমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তার মনোবৃত্তি তদ্রূপ গড়িয়া ওঠে। চরিত্রগঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।[২৯]

বিনোবা ভাবে

স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র আমাদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন করেননি, আমাদের দোষত্রুটিগুলিও দেখিয়ে দিয়েছিলেন।...ভারত তখন তমোগুণে

(অজ্ঞতা এবং অজ্ঞানে) আচ্ছন্ন ছিল এবং দুর্বলতাকে ত্যাগ ও শান্তি বলে ভুল করেছিল। সেজন্য বিবেকানন্দ একথাও পর্যন্ত বলেছিলেন যে, অলসতা ও কর্মবিমুখতার চেয়ে অন্যায় আচরণও শ্রেয়। তিনি মানুষকে তাদের তামসিক অবস্থা সম্বন্ধে এবং তা থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন—যাতে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বেদান্তের শক্তিকে নিজের নিজের জীবনেই উপলব্ধি করতে পারে। যাদের কাছে দর্শন ও শাস্ত্র চর্চা বিলাস মাত্র কিংবা অবসর বিনোদনের উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয়, তাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ঐ-ধরনের শাস্ত্রচর্চার চেয়ে ফুটবল খেলা অনেক ভালো। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তার মাধ্যমে তিনি ভারতের আত্মিক শক্তির গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেনঃ 'একই আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন। যদি তুমি এটা বুঝতে পারো তাহলে তোমার কর্তব্য সবাইকে তোমার ভাই মনে করা এবং মানবজাতির সেবা করা।' সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল যে, তত্ত্বজ্ঞান (আত্মজ্ঞান) লাভ করবার যদিও সবার সমান অধিকার, তবুও উচ্চনীচের ভেদটা দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বজায় রাখাই উচিত। স্বামীজী আমাদের এই সত্যটি দেখিয়ে দিলেন যে, আমাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মে, আমাদের চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-তত্ত্বজ্ঞানের কোন ভূমিকা থাকে না, সেই তত্ত্বজ্ঞান নিষ্প্রয়োজন এবং অর্থ-হীন। তাই তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করে তাদের নৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে। ('দরিদ্রনারায়ণ' অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব মানুষকে ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা) 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি বিবেকানন্দের সৃষ্টি, এবং গান্ধীজী এটিকে জনপ্রিয়তা দান করেছেন।[৩০]

রোমাঁ রোলাঁ

তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) ছিলেন মূর্তিমান শক্তি; কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁর বাণী। বীঠোফেনের মতো তাঁর কাছেও সমস্ত সদ্‌গুণের মূলে ছিল কর্ম।...

তাঁর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর রাজকীয়তা; আজন্ম সম্রাট তিনি। কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায়, কোথাও এমন কেউ তাঁর পাশে আসেননি, তাঁর সেই রাজকীয়তার প্রতি যিনি সম্ভ্রম প্রদর্শন করেননি।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোতে কার্ডিন্যাল গিবন্স ধর্ম সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। এই উদ্বোধনী সভায় ত্রিশ বছরের এই সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক যখন আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন তাঁর উপস্থিতির পাশে সভার অন্যান্য সভ্যদের কথা মানুষ ভুলে গেল। বিবেকানন্দের দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য, মনোরম মাধুর্য ও প্রশান্ত মহিমা, সম্ভ্রম-জাগানো রূপ, কালো চোখের উজ্জ্বল জ্যোতি, এবং বক্তৃতাকালীন তাঁর সুগভীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অপূর্ব সংগীতময় মূর্ছনা বিপুল সংখ্যক মার্কিন অ্যাংলো-স্যাক্সন শ্রোতৃ-বৃন্দকে মুগ্ধ করে ফেলল—যারা তাঁর গায়ের রঙের জন্য তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে সভায় এসেছিল। ভারতবর্ষের এই সৈনিক দ্রষ্টার চিন্তাধারা আমেরিকার বুকে গভীরভাবে দাগ কেটে রাখল।

বিবেকানন্দকে দ্বিতীয় স্থানে কল্পনা করা অসম্ভব। যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি প্রথম স্থানে আসীন।...তাঁকে দেখামাত্রই প্রত্যেকে বুঝতে পারত ঃ ইনি একজন নেতা, একজন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ; এমন এক চিহ্নিত ব্যক্তি যাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট প্রকাশিত অপরকে পরিচালিত করার শক্তি। একবার হিমালয়ে এক পর্যটক তাঁকে না চিনলেও বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল—বলে উঠেছিল ঃ 'শিব!'...

তাঁর প্রিয় দেবতাই যেন তাঁর কপালে নিজের নামটি লিখে দিয়েছিলেন।...

চল্লিশ বছরেরও কম বয়সে এই মল্লবীর চিতাশয্যা গ্রহণ করেন।...

কিন্তু সে চিতার আগুন আজও নেভেনি। প্রাচীন কালের ফিনিক্স পাখীর মতোই তাঁর চিতাভস্ম থেকে নতুন করে ভারতের বিবেক—সেই ঐন্দ্রজালিক পাখী—জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে ভারতের ঐক্যে মানুষের বিশ্বাস। আর জেগেছে ভারতের মহান বাণীতে দেশবাসীর শ্রদ্ধা। এই মহান বাণীর ধ্যান এই প্রাচীন জাতি তার অন্তরাত্মায় সেই বৈদিক যুগ থেকেই করে আসছে। ভারতবাসীকে আজ অবশিষ্ট মানবজাতির কাছে এই বাণীর হিসাব দিতে হবে।

কলম্বোতে তাঁর (বিবেকানন্দের) বক্তৃতাগুলো মানুষকে অভিভূত করল। ...রামেশ্বরমে তিনি জনসাধারণের কাছে যে-বক্তৃতা দিলেন, তা খ্রীষ্টের বাণীর মতোই শুনাল।...

কিন্তু বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলো মাদ্রাজের জন্যই ছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক ধরনের অধীর আগ্রহের মধ্যে মাদ্রাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।...

জনসাধারণের প্রবল প্রত্যাশার প্রত্যুত্তরে তিনি 'ভারতের প্রতি তাঁর বাণী' ঘোষণা করলেন। যেন শঙ্খধ্বনি হল; যে-শঙ্খধ্বনি রামচন্দ্র, শিব ও কৃষ্ণের দেশকে আবার জেগে উঠতে আহ্বান করল, তার শৌর্যশীল মানস-সত্তাকে, তার অমর আত্মাকে সংগ্রামের জন্য এগিয়ে যেতে বলল। দক্ষ সেনাপতির মতো তিনি তাঁর 'যুদ্ধের পরিকল্পনা' ব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে সামগ্রিকভাবে জেগে উঠবার আহ্বান জানালেন: 'হে আমার ভারত! জাগো!'...

'আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য...অন্যান্য সব অর্থহীন দেবতা আমাদের মন থেকে বিদায় নিক। একমাত্র জাগ্রত দেবতা, আমাদের স্বজাতি; সর্বত্রই তাঁর হাত, সর্বত্র তাঁর পা, সর্বত্র তাঁর কান। তিনি সবকিছুকেই আচ্ছন্ন করে আছেন। অন্যান্য সব দেবতা নিদ্রিত। যে বিরাট ভগবান আমাদের চারদিকে রয়েছেন, তাঁর পুজো না করে আমরা কোন্ অর্থহীন দেবতার পিছনে ছুটবো?... আমাদের চারদিকে যাঁরা আছেন--সেই বিরাটের পুজোই আমাদের প্রথম পুজো হবে।...এইসব মানুষ ও প্রাণী--এরাই আমাদের ভগবান, এবং আমাদের সর্বপ্রথম উপাস্য আমাদের স্বদেশবাসী...।'

* * *

এই কথাগুলো কী প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করল, তা কল্পনা করুন!

ঝড় কেটে গেল। দেশর উপর দিয়ে বয়ে চলল জল ও আগুনের বন্যা। সেইসঙ্গে এল আত্মার শক্তির কাছে, মানুষের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা ভগবান এবং তাঁর অনন্ত সম্ভাবনার কাছে দুর্জয় এক আবেদন! আমার চোখে ভেসে উঠছে প্রাচ্যের এই ঋষির সেই ঊর্ধ্ববাহু-মূর্তি - ঠিক যেন ল্যাজারাসের সমাধির পাশে

দাঁড়িয়ে থাকা রেমব্রান্টের ভাস্কর্যের যীশুমূর্তি ঃ মৃতকে আদেশ করছেন তিনি উঠে দাঁড়াতে, নবজীবনের আস্বাদ গ্রহণ করতে, আর তাঁর শৌর্যময় ভঙ্গিমা থেকে সঞ্জীবনী শক্তির তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।...

কিন্তু মৃত কি জাগল? তাঁর বাণীর ধ্বনিতে রোমাঞ্চিত ভারত কি তার এই অগ্রদূতের প্রত্যাশায় সাড়া দিল? তার উদ্দাম উদ্দীপনা কি কাজে পরিণত হল? ঐ সময়ের জন্য মনে হল, প্রায় সম্পূর্ণ আগুনই বুঝি ধোঁয়ায় হারিয়ে গেছে। দুবছর বাদে বিবেকানন্দ অত্যন্ত তিক্তভাবে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর বাহিনী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তরুণদলের ফসল ভারতভূমি থেকে ওঠেনি। যে-জাতি স্বপ্নে সমাধিস্থ, কুসংস্কারে শৃঙ্খলিত, সামান্যতম বিরুদ্ধতার মুখেই ভেঙে পড়তে অভ্যস্ত এক মুহূর্তেই সেই জাতির অভ্যাসগুলো বদলে দেওয়া কি সম্ভব? কিন্তু বিবেকানন্দের কঠোর চাবুকের আঘাতে এই প্রথম সে তার গভীর নিদ্রার মধ্যেও পাশ ফিরে শুল...। সেদিন থেকে এই অতিকায় কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙার শুরু। বিবেকানন্দের মৃত্যুর তিন বছর পরে তাঁর বংশধরেরা যদি বাংলার বিদ্রোহ এবং তিলক ও গান্ধীর আন্দোলনের সূচনা দেখে থাকেন, ভারত যদি আজ জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ কাজের মধ্যে আপনার সুনির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে থাকে, তবে তার জন্য সে প্রথম প্রেরণা পেয়েছিল মাদ্রাজের সেই শক্তিময় আহ্বানেই ঃ 'ল্যাজারাস, উঠে এস।'

শক্তির এই বাণীর দ্বিবিধ অর্থ ছিল ঃ একটি জাতীয়, অন্যটি বিশ্বজনীন। অদ্বৈতবাদী এই মহা সন্ন্যাসীর কাছে বিশ্বজনীন অর্থটিই বেশী প্রাধান্য লাভ করলেও অন্য অর্থটিই ভারতের পেশিগুলিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তুলল।

* * *

তাঁর কথাগুলো ছিল সঙ্গীতের মতো; বীঠোফেনের মতো সেগুলোর বাক্যাংশের বিন্যাস, আর হ্যান্ডেলের কোরাসের মতো প্রাণ-মাতানো ছন্দ। তাঁর এইসব কথা ছড়িয়ে আছে ত্রিশ বছর আগে লেখা (এই কথাগুলি রোমাঁ রোলাঁ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন) বইগুলোর মধ্যে। কিন্তু তবুও যখনই আমি সেগুলো পড়ি, আমার সারা শরীর দিয়ে যেন চকিতে তড়িৎস্পর্শের মতো

শিহরণ বয়ে যায়। তাহলে কথাগুলো যে-সময় এই বীরের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, সেই মুহূর্তে সেগুলো কী শিহরণ, কী উন্মাদনারই না সৃষ্টি করেছিল!

* * *

নিষ্ফলা চিন্তার ভিত্তিহীন চোরাবালিতে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরে ডুবে ছিল। তার একজন সন্ন্যাসীই তা থেকে ভারতবর্ষকে টেনে তুললেন। তার ফলে অতীন্দ্রিয়বাদের ভাণ্ডারে এতদিন যে-শক্তি সুপ্ত ছিল, তা সমস্ত বাধার বাঁধ ভেঙে তরঙ্গের পর তরঙ্গে কর্মের রূপ ধরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই-ভাবে যে প্রচণ্ড শক্তি মুক্তিলাভ করেছে, তার সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের সচেতন থাকা উচিত।

জগৎ তার মুখোমুখি দেখছে এক জাগ্রত ভারতকে। বিশাল অন্তরীপ জুড়ে শায়িত ভারতবর্ষ যেন তার বিপুল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত করে তার বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্র করে আনছে। এই নবজাগরণে গত শতাব্দীর তিন পুরুষ ধরে নেতৃস্থানীয়েরা যে ভূমিকাই গ্রহণ করুন না কেন (তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে যাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, প্রকৃত অগ্রদূত যিনি, তিনি হলেন রামমোহন রায়) চূড়ান্ত তূর্যনিনাদ কিন্তু হয়েছিল কলম্বো এবং মাদ্রাজে—বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলিতে।

তাঁর যাদুমন্ত্র ছিল ঐক্যের। এই ঐক্য—ভারতের প্রত্যেক নরনারীর ঐক্য (সেইসঙ্গে বিশ্বের ঐক্যও); স্বপ্ন, কর্ম, যুক্তি, প্রেম—সমস্ত মানস-শক্তির ঐক্য; এই ঐক্য—ভারতের অসংখ্য জাতির ঐক্য—যাদের সহস্র ভাষা, শত-সহস্র দেবতা; কিন্তু তা সত্ত্বেও যে জাতিগুলির রয়েছে একটি সাধারণ ধর্মীয় কেন্দ্র যা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভারত পুনর্গঠনের মূল শক্তি।

এই ঐক্য—হিন্দুধর্মের সহস্র সম্প্রদায়ের ঐক্য। ধর্মীয় চিন্তার মহাসমুদ্রে অতীত ও বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যত নদী এসে মিশেছে, তাদের সকলের ঐক্য। কারণ—আর এখানেই নিহিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জাগরণের সঙ্গে রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের জাগরণের পার্থক্য—ভারত এখন পাশ্চাত্যের এই

উদ্ধত সভ্যতার প্রাধান্যকে অস্বীকার করছে। সে তার নিজস্ব চিন্তাগুলোকে এখন রক্ষা করতে চায়। দৃঢ় পদক্ষেপে সে তার যুগব্যাপী অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেই ঐতিহ্যের একটুও সে আর ত্যাগ করতে চায় না। সে তার ঐতিহ্যের অংশ দিয়ে জগৎকে উপকৃত হতে দেবে এবং বিনিময়ে গ্রহণ করবে তাকে, পাশ্চাত্য তার বুদ্ধির জয়যাত্রায় যা অর্জন করেছে। কোন অসম্পূর্ণ বা আংশিক সভ্যতার প্রাধান্যের যুগ চলে গিয়েছে। এশিয়া ও ইউরোপ, এই দুই অতিকায় পুরুষ, এই সর্বপ্রথম সমান মর্যাদার সঙ্গে পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তারা যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে তারা একসঙ্গে কাজ করবে এবং তাদের যৌথ পরিশ্রমের সুফল বিশ্ববাসী একসঙ্গে ভোগ করবে।

এই 'মহত্তর ভারত', এই নতুনতর ভারত---যার বিকাশের কথা রাজনীতিক ও পণ্ডিতরা...আমাদের কাছে এতদিন লুকিয়ে এসেছেন এবং যার আশ্চর্য-জনক প্রভাব এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—রামকৃষ্ণের সত্তায় তা পরিপূর্ণ হয়েছে। পরমহংস এবং যে-বীর পরমহংসের চিন্তাকে কর্মে রূপদান করেছিলেন—তাঁদের যুগল নক্ষত্র বর্তমানে ভারতকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করছে। তাঁদের উষ্ণ জ্যোতি ভারতের মাটির মধ্যে ময়ানের মতো কাজ করে তাকে উর্বর করছে। ভারতের বর্তমান নেতারা—মনীষীদের রাজা, কবিদের রাজা এবং মহাত্মা—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—এই 'রাজহংস' ও 'ঈগলে'র পক্ষপুটে, এই যুগল নক্ষত্রের আলোকে বিকশিত পুষ্পিত ও ফলবান হয়েছেন। অরবিন্দ এবং গান্ধী প্রকাশ্যেও একথা স্বীকার করেছেন।...

যাঁর গ্যেটের মতো প্রতিভা ভারতের সব নদীর মিলনস্থলে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একথা ধরে নেওয়া চলে যে, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের (এটা তাঁর মধ্যে তাঁর পিতা মহর্ষি-কর্তৃক সঞ্চারিত হয়েছিল) এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নব-বেদান্তবাদের দুটি ধারা মিলিত ও সমন্বিত হয়েছিল। উভয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে অথচ উভয় থেকেই মুক্ত থেকে তিনি তাঁর মানসলোকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সার্থক মিলন ঘটিয়েছিলেন। সমাজ ও জাতির দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব চিন্তাগুলোকে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম ঘোষণা করে-ছিলেন—আমার যদি ভুল না হয়—১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাকালে, অর্থাৎ বিবেকানন্দের দেহরক্ষার চার বছর পরে। বিবেকানন্দের

মতো একজন অগ্রদূতের প্রভাব যে তাঁর চিন্তাজগতের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা নিঃসন্দেহ।

* * *

গান্ধীর মেজাজটি রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের বিপরীতধর্মী। কিন্তু সম্প্রতি আমি আনন্দিত হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি তাঁর 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী সঙ্ঘে'র বন্ধুদের কাছে ধর্মীয় গ্রহীষ্ণুতার বিশ্বজনীন মূলনীতির দিকটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু তাঁরা ধর্মপ্রচারের পবিত্র উৎসাহটা বড্ড বেশী দেখাচ্ছিলেন। বিবেকানন্দ ঐ মূলনীতির কথাই প্রচার করেছিলেন। গান্ধীজী বলেছেন: '...হিন্দুধর্ম আমার কাছে যেমন প্রিয়, প্রতিটি ধর্মই আমার কাছে প্রায় তেমনই প্রিয়। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমার নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার অনুরূপ। অতএব, ধর্মান্তরিতকরণের চিন্তা অসম্ভব। এই মৈত্রীসঙ্ঘের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একজন হিন্দুকে আরও ভাল হিন্দু হতে, একজন মুসলমানকে আরও ভাল মুসলমান হতে, একজন খ্রীষ্টানকে আরও ভাল খ্রীষ্টান হতে সাহায্য করা।'...

মানবজাতির ক্রমবিকাশের এই স্তরে, অন্ধ এবং সচেতন এই দ্বিবিধ শক্তিই সমস্ত প্রকৃতিকে এই নীতির দিকে টানছে—'হয় সহযোগিতা নয় মৃত্যু'। এখন একান্তভাবে প্রয়োজন মানুষের চেতনাকে ঐ শিক্ষার সাহায্যে পরিপুষ্ট করে তোলা, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ অপরিহার্য নীতিটি একটি স্বতঃসিদ্ধ মন্ত্রে পরিণত হয় যে—প্রত্যেক ধর্মের বাঁচবার সমান অধিকার আছে; প্রত্যেক মানুষেরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য প্রতিবেশী যাকে শ্রদ্ধা করে, তাকে শ্রদ্ধা করা। আমার মতে, গান্ধীজী যখন অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে এই কথাগুলোই বলছিলেন, তখন তিনি নিজেকে রামকৃষ্ণেরই উত্তরাধিকারীরূপে প্রকাশ করেছিলেন।

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি এই শিক্ষাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ না করে পারেন। এই কথাগুলোর লেখক তাঁর সমস্ত জীবন ধরে এই উদার আদর্শটি উপলব্ধির জন্য অস্পষ্টভাবে চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করছে যে, তার ঐ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার মধ্যে বহু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। গান্ধীর এই মহান শিক্ষা তাকে ঐ লক্ষ্যের পথে

সাহায্য করেছে বলে সে কৃতজ্ঞ। বস্তুতপক্ষে, ঐ এক শিক্ষাই বিবেকানন্দও দিয়ে গেছেন; এবং আরও বেশী করে যিনি তা দিয়েছেন, তিনি রামকৃষ্ণ।[৩১]

উইল ডুরান্ট

বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত হিন্দু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের যে-কোন জনের মতবাদের চেয়ে অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন একটি মতবাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে প্রচার করেছেন:

'আমরা চাই সেই ধর্ম যা মানুষ তৈরী করে...দুর্বল-কারী অতীন্দ্রিয়বাদ-গুলো পরিত্যাগ কর, সাহসী হও...পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের জন্য...অন্যান্য সব অর্থহীন দেবতা আমাদের মন থেকে বিদায় নিক। একমাত্র দেবতা যিনি জাগ্রত সে আমাদের জাতি, সর্বত্র তাঁর হাত, সর্বত্র তাঁর পা, সর্বত্র তাঁর কান; তিনি সর্বব্যাপী...। আমাদের চারদিকে যাঁরা আছেন তাঁদের পূজা সর্বাগ্রে প্রয়োজন...। এঁরাই আমাদের ভগবান, এঁরা সকলে—মানুষ এবং ইতর জীব-জন্তুরা; এবং প্রথম আমাদের যে দেবতাদের পূজা করতে হবে তাঁরা হলেন আমাদের স্বদেশবাসী।'

গান্ধীজী প্রকৃতপক্ষে এই আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন।[৩২]

সি. রাজাগোপালাচারী

আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে যে-কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী! ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক,—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।[৩৩]

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি না থাকলে আমরা আমাদের ধর্ম হারাতাম এবং স্বাধীনতাও লাভ করতে পারতাম না। আমাদের সবকিছুর জন্য তাই আমরা বিবেকানন্দের কাছে ঋণী।

তাঁর বিশ্বাস, সাহস এবং প্রজ্ঞা আমাদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করুক, যাতে তাঁর কাছ থেকে যে-সম্পদ আমরা লাভ করেছি, তাকে সযত্নে রক্ষা করতে পারি।[৩৬]

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

আজ আমরা এক মহা সংকটের সম্মুখীন। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও এ এক সংকটময় অধ্যায়। অনেকের ধারণা আমরা সর্বনাশের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি। জীবনের মূল্যবোধ বিকৃত, নৈতিক মান অবনমিত, পলায়নী মনোবৃত্তি সর্বত্র। সর্বজনীন উন্মত্ততায় আমরা আক্রান্ত। —মানুষ এইসব সমস্যার কথা ভাবে আর হতাশা, নৈরাশ্য এবং উপায়হীনতায় অবসন্ন হয়ে পড়ে। আমাদের সামনে আজ এছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু মানুষের আত্মার প্রতি এই অবিশ্বাস বস্তুত মনুষ্যত্বের মর্যাদার প্রতি ঘৃণ্য বিশ্বাস-ঘাতকতা; মানব-প্রকৃতির অবমাননা। কারণ, বিশ্বজগতে যত বড় বড় পরি-বর্তন ঘটেছে, মানব-প্রকৃতিই তো সেগুলো সম্ভব করে তুলেছে। যদি বিবেকা-নন্দের কোন বাণী এখন আমাদের স্মরণ করতে হয় তা হল আমাদের আধ্যাত্মিক মহিমার প্রতি নির্ভরতার জন্য তাঁর সেই আহ্বান। ...মানুষের মধ্যে অফুরন্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ নিহিত আছে। মানুষের আত্মাই সর্বোচ্চ, মানুষ অদ্বিতীয়, অপূর্ব। জগতে কোন সমস্যা বা বিপদই অবশ্যম্ভাবী কিংবা অনিবার্য নয়। মানুষ আমরা চরম বিপদ এবং অক্ষমতার সম্মুখীন হলেও তাকে কাটিয়ে আসতে পারি। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, আমরা যেন আশা না হারাই। বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছেন, দুঃখের মধ্যে দিয়েছেন আশা, হতাশার মধ্যে সাহস।[৩৭]

ই. পি. চেলিশেভ

সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবেকানন্দ বেশ কিছুকাল থেকেই একটি জনপ্রিয় নাম। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমার মতো বহু মানুষ আছেন যাঁরা বিবেকানন্দকে ভালবাসেন, বিবেকানন্দের লেখা ভালবাসেন। কত সহজ অথচ কত বলিষ্ঠ তাঁর লেখা। আর মানুষের প্রতি কী গভীর দরদ! প্রায় নব্বই বছরের পুরনো

হলেও তাঁর লেখা আজও সমান তেজোদীপ্ত, সমানভাবে প্রেরণাপ্রদ। বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরও বেশী করে জানার আগ্রহ এবং কৌতূহল আমার দেশবাসীর মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে। আমরা মনে করি, বিবেকানন্দের চিন্তা, তাঁর আদর্শ, তাঁর রচনা শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র বিশ্বের সম্পদ।

আমাকে এ-দেশের এমন একজন যথার্থ মার্কসবাদীর নাম বলুন বিবেকানন্দ যাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়? আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত। আমার যেসব মার্কসবাদী বন্ধু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন না, তাঁরা হয় বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের বই তাঁরা পড়েননি, অথবা অজ্ঞতাবশত বিবেকানন্দকে তাঁরা নিছক একজন ধর্মীয় সংগঠক হিসেবে ধরে নিয়ে বসে আছেন।

বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি খুব ভালভাবে পড়েছি এবং তার উপর পড়েছি তাঁর কয়েকখানা প্রামাণিক জীবনী। তার ভিত্তিতে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, বিবেকানন্দকে যদি শুধুমাত্র একজন তথাকথিত ধর্মীয় প্রচারক হিসেবেই দেখা হয়, তাহলে তা হবে একটা বিরাট ভ্রান্তি। সাধারণ অর্থে একজন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা বলতে যা বোঝায়, বিবেকানন্দ কিন্তু তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ব্যাপক ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের পরিধি। তিনি ছিলেন শান্তি, সমন্বয় এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান 'প্রফেট'। তিনি ছিলেন মৌলিক ভাবনাসম্পন্ন একজন চিন্তানায়ক, স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন একজন উদার মানবপ্রেমী। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক দেশপ্রেমিক, এক বরেণ্য গণতন্ত্রপ্রেমী এবং এক মহান মানবতাবাদী। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিনাশ চাইতেন সামাজিক অন্যায়ের, অবসান চাইতেন সকল রকম শোষণের—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। সর্বপ্রকার বিশেষ অধিকার ও সুবিধাবাদের বিরোধী ছিলেন তিনি। সোভিয়েত দেশের মানুষের কাছে বিবেকানন্দ তাই এত জনপ্রিয়। তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সর্বহারাদের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রবাদী বলেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন শোষণমুক্ত, শ্রেণীহীন সচ্ছল এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার। অবশ্য এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ধর্মকে

ব্যবহার করেছিলেন হাতিয়ার হিসেবে।...

সে যাই হোক, এই নীতির সঙ্গে কম্যুনিস্টদের কোন বিরোধ থাকতে পারে না। লক্ষ্য যদি এক হয়, তাহলে মতের ভিন্নতা আপত্তির কারণ হতে পারে না। দেশ কাল অবস্থা ভেদে মতের পার্থক্য থাকতেই পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আর ভারতবর্ষ? তার মাটিতেই তো ধর্ম। তাই বিবেকানন্দের মতো বিচক্ষণ সমাজনায়ক যদি ধর্মকে ভিত্তি করে নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত মানুষদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, তাতে দোষ কোথায়, বিরোধের অবকাশ কোথায়?...

তথাকথিত যে-ধর্মকে মার্কস-লেনিন নিন্দা করেছেন, তাকে তো বিবেকানন্দও নিন্দা করেছেন। সেটা হল ধর্মের নামে, অর্থাৎ ধর্ম বলে যা চলে তা—প্রীস্টক্র্যাফ্‌ট—পুরোহিততন্ত্র। সেটা তো সত্যিই শোষণের হাতিয়ার—কি ভারতবর্ষে, কি অন্য দেশে। বিবেকানন্দ যাকে ধর্ম বলে প্রচার করেছেন তা হল মানবতাবাদ, মানুষের প্রতি দরদ, মানুষের প্রতি ভালবাসা। বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল গভীর মানবপ্রেম।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ—আধ্যাত্মিকতার দেশ। মার্কসবাদী হিসেবে আমি মনে করি, যে-কোন দেশের বাস্তব পরিস্থিতির চেহারা একজন কম্যুনিস্টের যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যদি ধর্মীয় ভাবাবেগ স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকে তা অনুধাবন করা উচিত। একজন প্রকৃত কম্যুনিস্টের বোঝা উচিত, তথাকথিত ধর্ম যেমন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি যথার্থ ধর্মীয় চেতনা মানুষকে কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে।

আসলে ধর্মের দুটো দিক আছে—একটা ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের ইতিবাচক দিকটিই বেছে নিয়েছিলেন। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-বিভেদ বাড়িয়ে তোলে। শুধু ধর্মের ব্যাপারেই নয়, বিবেকানন্দের চিন্তা ও পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও নেতিবাচক কিছু স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। তাই বিবেকানন্দকে এবং তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা প্রচলিত অর্থে নিছক ধর্মনেতা মাত্র বলে ভাবি না। বিশ্লেষণধর্মী কোন গবেষকের কাছেই তাঁদের সেভাবে বিবেচিত হওয়া

উচিত নয়। তাঁরা যেসব ধর্ম-উপদেশ প্রচার করেছেন সেগুলির সঙ্গে কোন পরিণত সমাজসংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য নেই, কোন যথার্থ মানবতা-বাদী চিন্তাবিদের মতের কোন অমিল নেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলছেনঃ 'খালি পেটে ধর্ম হয় না', 'যার হেথায় নেই, তার হোথায়ও নেই' আর তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেনঃ 'আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না যে-ধর্ম বিধবার অশ্রু মোছাতে পারে না, পারে না ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে' বলছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কি একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো', বলছেন, 'জীবন্ত দেবতা মানুষের রূপ ধরে তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার সেবাই তোমার ধর্ম।' কোন দেশের কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মগুরুর মুখে কোন কালে এরকম কথা কেউ শুনেছে? আমার মনে হয়, মার্কসীয় ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ এদিক দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শনের বড় কাছাকাছি।...

বিবেকানন্দ রাশিয়ায় না গিয়েও বুঝেছিলেন সেখানে বিপ্লবের পটভূমি তৈরী এবং সেখানকার নিপীড়িত ও শোষিত জনগণ স্বৈরাচারী জার শাসনের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সামাজিক কাঠামোর আসছে এক বিরাট পরিবর্তন আর সে পরিবর্তনের নেতৃত্ব আসবে প্রথম রাশিয়া থেকেই। বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সেকথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত জনগণ তাই বিবেকানন্দের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান। বিবেকানন্দ তাই তাদের বড় কাছের মানুষ।

বিবেকানন্দ কোন বুজরুকিকে প্রশ্রয় দিতেন না। বেদান্তের ধর্মীয় দার্শনিক ভাবনাকে আত্মীকরণ করে তাকে নতুন যুগের প্রয়োজন এবং অবস্থার সঙ্গে উপযোগী করে উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি। তাঁর বেদান্তের নাম দিয়েছিলেন তিনি 'প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত'। কম্যুনিস্টরা বেদান্তের অতীন্দ্রিয়-বাদকে বুঝতে পারেন না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই, বরং সাযুজ্যই আছে।...

বিবেকানন্দকে একদল ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদী বলে চিহ্নিত করেন, আর একদল বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে তাঁকে মার্কসবাদী আখ্যা দেন। আমার মতে, স্বামী বিবেকানন্দ এর কোনটাই নন। মার্কসের দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কিনা সেটা

বিতর্কের বিষয়। তবে পরিচয় থাকা অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজদার্শনিকদের ভাবনার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল তার প্রমাণ আছে। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজের মৌলিক চিন্তার ভিত্তিতে। শ্রমজীবী মানুষের জাগরণের ব্যাখ্যা তিনি তাঁর নিজের মতো করেই দিয়েছেন, সমাজের ব্যাখ্যাও তাঁর নিজস্ব। সামাজিক সমস্যা সমাধানের যেসব সূত্র তিনি দিয়েছেন সেগুলি আমাদের মতে ভাববাদী (idealistic)। সেসব বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, তিনি যেভাবে ভেবেছেন বা বিশ্লেষণ করেছেন সেভাবে কোন বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ভাবেননি বা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তাঁর ধর্মের মধ্যে ভাববাদী যে-অংশটুকু তার সমর্থকও আমরা নই ঠিকই, কিন্তু তাকে উপেক্ষা অথবা অস্বীকারও আমরা করি না। কারণ একথা আমি আগেই বলেছি, দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ধর্মের ভাববাদ যদি তাঁর দেশের মানুষকে কল্যাণের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে অস্বীকার করব কি করে? আসল কথা হল মানুষের প্রতি মানুষের মমতা, সমাজের কল্যাণ এবং অবহেলিতের উত্থান। সেখানেই মার্কস ও বিবেকানন্দ উভয়েই একই ভাবনার শরিক, সেখানেই তাঁদের মিলনসূত্র।..

বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ধারণার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় মতাদর্শের কোন মিলই নেই। সুতরাং প্রভাবের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। খ্রীষ্টীয় মতাদর্শ মানুষকে কর্মহীনতার দিকে নিয়ে যায়, মানুষকে ভগবানের করুণাপ্রার্থী ভিক্ষুকে পরিণত করে। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দের মানবতাবাদ মানুষকে কর্মের জোয়ারে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, লড়াই করতে প্রেরণা যোগায়। বিবেকানন্দ তাঁর মানবতাবাদের ধারণায় মানুষের মর্যাদাকেই উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন। সেই চিন্তার মধ্যে তাঁর ব্রহ্মচেতনাই সম্পৃক্ত ছিল। তিনি তাঁর ধর্মচেতনা অথবা মানবতাবাদের চিন্তা-ভাবনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে এবং সেই আদর্শকে তিনি দেশের সেবায় ব্যবহার করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনে যখন ভারতের জনগণের মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছিল তখন বিবেকানন্দের মানবতাবাদ তার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, নিজেদের মর্যাদা, দায়িত্ববোধ ও জাতীয় গৌরব সম্পর্কে সচেতন করেছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের ঐক্যের ব্যগ্র বাসনাই

বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রেণী-সমন্বয়ের ধারণা সৃষ্টি করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের সেই ঐক্যের ধারণা ভাববাদী হলেও তা ছিল তাঁর সামগ্রিক চিন্তা-দর্শের মূল কথা এবং তার যৌক্তিকতা এবং অপরিহার্যতায় ছিল তাঁর গভীর বলিষ্ঠ বিশ্বাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তাঁর এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করতেই হবে। শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সর্বাত্মক জাগরণ হয়েছিল তার প্রক্রিয়াকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ। সোভিয়েত দেশের মানুষের চোখে রামমোহন রায় অথবা মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে নতুন ভারত গড়ার স্থপতি হিসেবে বিবেকানন্দের অবদান বেশী বলে স্বীকৃত হয়েছে।...

...বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি পড়েছি—একবার নয়, বারবার, আর প্রত্যেকবার সেগুলির মধ্যে এমন নতুন কিছু পেয়েছি যা ভারতবর্ষকে গভীর-ভাবে বুঝতে আমাকে সাহায্য করেছে—সাহায্য করেছে ধারণায় আনতে তার দর্শন ও জীবনদর্শনের রূপ, তার জনগণের অতীত ও বর্তমানের আচার-আচরণ এবং তাদের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা।[৩৬]

সোভিয়েতের মানুষ মনে করেন যে, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বস্তুত অভিন্ন; বিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের গ্রাসাতঙ্কে বিপন্ন মানব-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁদের বাণী একান্তই অপরিহার্য। আমরা বিশ্বাস করি যে একমাত্র তাঁদের বাণীই বর্তমানের আতঙ্কপীড়িত বিশ্বে শান্তি, সমন্বয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সক্ষম। তাঁরা সাধারণ ধর্মনেতা মাত্রই নন—আরও অনেক বেশী গরীয়ান। শান্তি, সমন্বয় ও সৌভ্রাত্রের মহান প্রবর্তক পুরুষ তাঁরা। অতীতের ভারতে ও বৃহত্তর বিশ্বে তাঁদের বাণীর কালোপযোগিতা যেমন ছিল তেমনই সাম্প্রতিক ভারতের পরিস্থিতিতে এবং সমকালীন বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতেও ততোধিক তার প্রয়োজন। এই কারণেই বহু সোভিয়েত গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন।[৩৭]

বহু বছর পেরিয়ে যাবে, বহু প্রজন্ম অতিক্রান্ত হবে; বিবেকানন্দ ও তাঁর যুগ সুদূর অতীতে পরিণত হবে। কিন্তু সারা জীবন ধরে যিনি স্বদেশ-

বাসীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন; ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, দুঃখপীড়িত দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলবার জন্য, অবিচার ও নিষ্ঠুরতার গ্রাস থেকে তাদের মুক্ত করবার জন্য যিনি এত কিছু করেছেন—সেই মানুষটির স্মৃতি, বিবেকানন্দের স্মৃতি কখনই ম্লান হবে না। সমুদ্রতীরের পাথুরে ঢালু অংশ যেমন তরঙ্গের আঘাত এবং ঝড়ঝঞ্ঝা প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে তীরভূমিকে সতত রক্ষা করে, সর্বদা নির্ভীক এবং নিঃস্বার্থ থেকে তেমনি-ভাবে বিবেকানন্দ তাঁর দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন।[৩৮]

হুয়াং জিন চুয়ান

চীনদেশে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা একজন ধর্মীয় নেতামাত্র মনে করি না। আমরা তাঁকে আধুনিক ভারতবর্ষের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক হিসেবে দেখি। প্রমাণ আছে যে, ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। ভারতবর্ষের বহু বিপ্লবীর কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস।[৩৯]

বর্তমান চীনে বিবেকানন্দ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সমাজসেবী রূপে পরিচিত। তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এবং বীর্যদীপ্ত দেশপ্রেম কেবল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেই উদ্বুদ্ধ করেনি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ ক্যান্টন ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। মাদ্রাজের লোকদের লেখা একটি চিঠিতে তিনি সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। চীনদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর কিছুটা জ্ঞান ছিল। তিনি তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় প্রায়ই চীন সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিতেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। তিনি একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, চীনদেশের সংস্কৃতি অবশ্যই একদিন না একদিন 'ফিনিক্সের' মতো আবার জেগে উঠবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির মিলনের মহৎ লক্ষ্য সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বিবেকানন্দের এই চিন্তাধারা কিভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবনীকার রোমাঁ রোলাঁ তা বর্ণনা করেছেন। যখন বিবেকানন্দ প্রথমবার আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন আমেরিকাই এই ব্রত উদ্‌যাপন করবে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয়বারের বিদেশ যাত্রায় তিনি বুঝেছিলেন যে, 'ডলার'-সাম্রাজ্যবাদের

জোলুস তাঁর ধারণাকে প্রতারিত করেছে। তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র আমেরিকা নয়, চীন।

সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের পেষণে নিপীড়িত চীনদেশের জনসাধারণের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ছিল অসীম সহানুভূতি। তিনি তাদের সম্পর্কে বিরাট আশা পোষণ করেছেন। চীন পরিদর্শনের পর তিনি খুব মজার একটা মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ 'চীনা খোকা পুরোদস্তুর দার্শনিক। যে-বয়সে একজন ভারতীয় শিশু বড়জোর হামাগুড়ি দিতে শেখে, সে-বয়সে একটি চীনাশিশু কাজে যায়। প্রয়োজনের দর্শন সে খুব ভালোভাবেই শিখে নিয়েছে।' এ-থেকে বোঝা যায়, চীনের পুরনো সমাজের শিশুদের দুঃখকষ্টের প্রতি বিবেকানন্দের গভীর সহানুভূতি ছিল।

তাঁর কল্পিত সমাজতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভবিষ্যৎ সমাজ শ্রমজীবী মানুষদের দ্বারা শাসিত হবে এবং চীনেই এর সূত্রপাত হবে। 'বর্তমান ভারতে' তিনি মন্তব্য করেনঃ 'কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। ...মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে... তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে...শূদ্রধর্ম-কর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।...সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।'

উপরে আলোচিত বিষয় এবং তাঁর জীবন ও রচনা থেকেও আমরা দেখতে পাই, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-শাসিত চীনা জনগণের সম্বন্ধে বিবেকানন্দ অত্যন্ত আগ্রহী ও সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁদের সম্বন্ধে তিনি গভীর আশা পোষণ করতেন।...

ভারতে গণতন্ত্রবাদী দেশপ্রেমিকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি আমাদের গৌরবময় অতীত সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং চীনের মেহনতি জনগণকে ভালোবাসতেন।[১০]

অতীতে স্বামী বিবেকানন্দ চীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় দৃঢ় সমর্থন ও গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাদের উৎসাহিত করেছিলেন

সারা বিশ্বের জনগণের সঙ্গে একতাবদ্ধ হতে। চীনের জনগণ এরকম এক ব্যক্তিকে ভুলতে পারে না এবং সব সময় তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে।[৪১]

রমেশচন্দ্র মজুমদার

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চিকাগোতে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু-ধর্মের সপক্ষে বক্তৃতা করেছিলেন।...একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বিশ্ব-সংস্কৃতির আধুনিক মানচিত্রে সেদিন তিনি হিন্দুধর্মের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এর আগে পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সভ্য জাতি-গুলি হিন্দুধর্মকে অত্যন্ত হেয় করে দেখতো। তারা মনে করতো যে হিন্দু-ধর্ম কুসংস্কার, দুরাচার এবং নীতিহীন লোকাচারের সমষ্টি এবং বর্তমান প্রগতিশীল জগতে হিন্দুধর্ম কোনরকম গুরুত্ব পাবার দাবি রাখতে পারে না। বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার ফলে এই প্রথম তারা হিন্দুধর্মের উচ্চ তত্ত্বগুলিকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাল--শুধু তাই নয়, বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মকে তারা অত্যন্ত উঁচু আসন দিল। এর সুদূরপ্রসারী প্রত্যক্ষ প্রভাব হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর কিরকম হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।...এতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যখনই কোন তুলনামূলক বিচার হয়েছে তখনই শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সর্বদাই একটা আত্মরক্ষামূলক এবং ক্ষমাপ্রার্থী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতি নিম্নমানের, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই প্রবল দাবি ভারতীয়রা প্রায় সত্য বলেই মেনে নিয়েছিল। এখন আকস্মিকভাবেই পট-পরিবর্তন হয়ে গেল। পাশ্চাত্য প্রতিনিধিরা একযোগে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যগুলির উচ্চ প্রশংসা করতে লাগলেন। এটি এমন একটি ঘটনা—যা হিন্দু-দের শত্রু-মিত্র কেউই কল্পনাতেও আনতে পারেনি। এর ফলে হিন্দুদের মধ্যে তাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে জাতীয় গৌরববোধ ও দেশাত্মবোধের চেতনাও দ্রুত জেগে উঠল।...ক্রম-বর্ধমান হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এটি ছিল এক বিরাট অবদান।

ভারতে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করলেন যে, আধ্যাত্মিকতাই

হিন্দুসভ্যতার ভিত্তি। তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় তিনি দেখালেন, মানবজাতির কল্যাণের জন্য ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূল্য বা গুরুত্ব পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়—যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমৃদ্ধিকে খুব বড় করে প্রচার করা হয়, সেই সভ্যতার সমৃদ্ধি আমাদেরও চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তিনি অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে গেছেন পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে হতবুদ্ধি ভারতীয়দের দৃষ্টি তাদের নিজস্ব আদর্শের দিকে ফিরিয়ে নিতে। পাশ্চাত্যের সাথে তুলনামূলক মূল্যায়নে তিনি হিন্দু আদর্শ ও রীতিনীতির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেছিলেন, আর দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন সোনার বিনিময়ে রাঙ গ্রহণ না করেন।

তাই বলে বিবেকানন্দের কিন্তু পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে কোন গোঁড়ামি ছিল না। তাদের কৃতিত্বের সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি খোলা-খুলি স্বীকার করেছিলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি একেবারে ত্রুটিহীন বা নিখুঁত নয়। পাশ্চাত্যের কাছে তাকে অনেক কিছুই শিখতে হবে, কিন্তু তা কখনই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির বিনিময়ে নয়।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে একজন মহান সন্ন্যাসী ও নিষ্ঠাবান দেশ-প্রেমিকের সমন্বয় ঘটেছিল।...ভারতের জাতীয় চেতনার জাগরণে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আজও তাঁর অনেক প্রাণস্পর্শী আবেদন ভারতের জাতীয় চেতনাকে তার মর্মমূল পর্যন্ত আলোড়িত করে।...

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা সুপ্ত হয়ে ছিল শুধু, কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। বিবেকানন্দের মনে যে-চিন্তাটি সর্বক্ষণের জন্য প্রধান হয়ে উঠেছিল সেটি হলঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক সজীবতা ফিরিয়ে এনে ভারতবর্ষকে তার অকৃত্রিম অতীত গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

এই মহান সন্ন্যাসী যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে সংসার ত্যাগ করেছিলেন এবং গভীরভাবে নিজেকে আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কিন্তু অক্লান্তভাবে প্রচার করেছিলেন যে, ভারতের জন্য ধর্ম ও দর্শন ততটা প্রয়োজনীয় নয়; ধর্ম ও দর্শন তার যথেষ্ট আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন তার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য অন্ন, নিম্ন-শ্রেণীর মানুষের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার, দুর্বল জনগণের বুকে শক্তি ও উৎসাহ, পৃথিবীর মধ্যে একটি মহান জাতি বলে গৌরব ও আত্মমর্যাদা বোধের

চেতনা। সমগ্র ভারতবাসীর উদ্দেশে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, তারা যেন সর্বপ্রকারের ভয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, শক্তিতে ভর করে মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দৈবীসত্তা বর্তমান—বেদান্তের এই শাশ্বত সত্য তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই মহান সন্ন্যাসীর উপদেশ এবং আদর্শ জাতীয়-জীবনস্রোতে নববেগ যুক্ত করেছিল; নতুন উদ্যম এবং আশার সঞ্চার করেছিল এবং দেশসেবাকে ধর্মীয় সাধনার স্তরে উন্নীত করেছিল।[৪২]

এ. এল. ব্যাসম

পরবর্তীকালে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত হয়েছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মের একশ বছর পরেও বিশ্ব-ইতিহাসের মানদণ্ডে তাঁর গুরুত্বের পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁর দেহাবসানের পরে কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক কিংবা অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিক তাঁর যে মূল্যায়ন করেছিলেন তার চেয়ে তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ের পর থেকে কালপ্রবাহে অনেকগুলি বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেছে যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা হয় যে, আগামী শতাব্দীগুলিতে তিনি বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান রূপকার হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, বিশেষত এশিয়াতে। ভারতীয় ধর্মের সমগ্র ইতিহাসেও তিনি পরিগণিত হবেন একজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। শঙ্কর ও রামানুজের মতো মহান আচার্যদের তিনি সমকক্ষ। এবং কবীর, চৈতন্য, দক্ষিণ ভারতের আলোয়াড়-নায়নমার প্রমুখ সাধু-সন্ত—যাঁদের প্রভাব কেবলমাত্র আঞ্চলিক,—তাঁদের থেকে বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

আমি এও বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কারণ, প্রখ্যাত ডঃ সি. ই. এম. জোড এক-সময় যাকে বলেছিলেন 'প্রাচ্যের পালটা আক্রমণ' বিবেকানন্দই প্রকৃতপক্ষে তার সূচনা করেন। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব থেকেই ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম প্রচার করে এসেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় ধর্মগুরু যিনি ভারতের বাইরে মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন।[৪৩]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছেন এমন একজন মানুষ হিসেবে যাঁর হৃদয় মানবজাতির দুঃখকষ্টে গভীরভাবে আলোড়িত, বিশেষ করে ভারতের মানুষের জন্য। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর তিরস্কার-পূর্ণ কোন কোন বক্তৃতা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের সামনে মানুষের মহৎ-সত্তার স্বরূপ তিনি প্রকাশ করেছিলেন —বিশেষ করে সেইসব মানুষের—যারা ভারতীয় সমাজে ঘৃণিত ও অবহেলিত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেদান্ত-নিহিত ভারতের মহত্তম ও প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ ভাব-ধারার মূল্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলেছিলেন। তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বেদান্ত-দর্শনের মধ্যে যা রেখে গেছেন তার একটি চিরন্তন মূল্য আছে এবং তা শুধু ভারতের জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য—এর ফলে আমাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছিল; সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন ধরনের উদ্দীপনার যার মূলে ছিল এই বোধ যে, আমরা সেই জনসমষ্টির অন্তর্গত যারা চিরকাল মানবজাতির সেবায় এক পবিত্র জীবনব্রত পালন করে এসেছে। হিন্দুজাতি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল, বিবেকানন্দই সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করেছেন। সে-সময় আমাদের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক অযৌক্তিক ও নির্মম সমালোচনা হত—বিশেষ করে সেগুলি করতেন প্রাচীনপন্থী খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা। বিবেকানন্দ এগুলির মূলোচ্ছেদ করে-ছিলেন। এসব কারণেই তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের অত্যন্ত আপনজন। এইজন্যই তাঁকে আমরা একজন মহান আচার্য বলে মনে করি। তাঁকে আমরা দেখি এক নতুন ধরনের অবতার হিসেবে যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমাদের সুন্দর শক্তিশালী মানুষের মতো জীবনযাপনের পথ দেখাতে।

বিবেকানন্দ প্রথমেই আমাদের জীবন থেকে বহু ভ্রান্ত সংস্কার দূর করে দিলেন। অনিত্য বস্তু—সামাজিক লোকাচার ও অনুরূপ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট না করে শাশ্বত সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ভারতে যাকে আমরা 'জাতিভেদ প্রথা' বলি তিনি তার আপোষহীন শত্রু ছিলেন। একজন সন্ন্যাসী ও সাধারণ হিন্দু হিসেবে অস্পৃশ্যতা বস্তুটিকে সর্বদাই ঘৃণা করেছেন। ভারতীয় ইংরেজিতে প্রায়ই 'ডোন্ট-টাচিজম' (don't-touchism) বলে যে

শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেটি তাঁরই সৃষ্টি। জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা এবং করুণায় তাঁর হৃদয় প্লাবিত হয়েছিল। বেদান্তবিশ্বাসী ছিলেন বলে তিনি তাদের সেবা করতে চেয়েছিলেন ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসেবে—কারণ, বেদান্তমতে সব প্রাণীই ঈশ্বর। ভারতীয় ভাষায় তিনি একটি নতুন শব্দের সৃষ্টি করেছেন—'দরিদ্র-নারায়ণ' অর্থাৎ 'দরিদ্র এবং অনুন্নতদের মধ্যস্থিত ভগবান।' সমগ্র ভারতবাসী এটি গ্রহণ করেছে এবং একদিক দিয়ে এই শব্দটি সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের দায়িত্ববোধ জাগিয়েছে। এই দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেকটি মানুষ দরিদ্র, অনুন্নত, পীড়িত ও হতাশাগ্রস্তদের ঈশ্বরের মূর্তিমান বিগ্রহ (নর-নারায়ণ) বা ঈশ্বরের অংশ বলে দেখবে। তাদের সেবাই সবার কাছে ঈশ্বরের সেবা হয়ে উঠবে। গুজরাটের বৈষ্ণব কবিদের ব্যবহৃত 'হরিজন' (অর্থাৎ 'ঈশ্বরের মানুষ') এই প্রাচীন শব্দটি মহাত্মা গান্ধী আবার প্রবর্তন করলেন। এটি একটি সুন্দর শব্দ। কিন্তু 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটির সাথে একটি কর্তব্য-বোধের নির্দেশ জড়িয়ে আছে, যা বলেঃ যদি কেউ ভগবানের সেবা করতে চায় তাহলে তাকে দরিদ্রের সেবা করতে হবে।...

সমাজে যারা অবিচারের বলি, বিবেকানন্দ তাদের সকলকেই ভালবাসতেন। তাদের মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।... ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা ও আধ্যাত্মিক শূন্যতার সেই দিনে, যখন সবকিছুই নৈরাশ্যজনক মনে হয়েছিল এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল তখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আহ্বান নিয়ে বিবেকানন্দ নামক একটি শক্তির আবির্ভাব কি করে সম্ভব হল, তা নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এরকম একজন মানুষ ঠিক তখনই এসেছিলেন যখন আমাদের সামনে কোন পথ ছিল না, আমরা যেন সব আশাই হারিয়ে ফেলে-ছিলাম। এ-থেকে বোঝা যায়, করুণাময় ভগবান মানুষকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। এই ঘটনা গীতার বহু-উদ্ধৃত সেই বাণীই সমর্থন করে—যখন ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের উত্থান হয় ভগবান তখন অবতার-রূপে অবতীর্ণ হন—মানুষকে মুক্তির সঠিক পথ দেখাতে পথ-প্রদর্শক হয়ে আসেন। এই অর্থে বিবেকানন্দ একজন অবতার, দৈব-অনুপ্রাণিত ও ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথ-প্রদর্শক—শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয়, বর্তমান যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্য।[৪৭]

মনীষীদের পরিচয়

লিও টলস্টয় (১৮২৮ - ১৯১০)

বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক। রাশিয়ার তুলা প্রদেশের ইয়াসনাইয়া পোলাইয়ানার এক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীবংশে জন্ম। তাঁর মহত্তম উপন্যাস 'ওয়ার অ্যান্ড পীস'। শতাধিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসটি অধিকাংশ সমালোচকের মতে, আজ পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ১৮৫৪-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সৈনিকরূপে যে-অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তাই এই উপন্যাসের ভিত্তি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা : 'আন্না কারেনিনা', 'দি ডেথ অব ইভান ইলিচ', 'মাস্টার অ্যান্ড ম্যান', 'রেজারেকশান' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)

বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী, শিক্ষাবিদ ও নোবেল পুরস্কারে ভূষিত বিশ্বখ্যাত কবি। কবি-প্রতিভার উন্মেষ শৈশব থেকেই। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের জন্য ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার পেয়েছেন। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, পত্র-সাহিত্য, গীতিনাট্য প্রভৃতি সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি অনায়াসে বিচরণ করেছেন। তাঁর রচনাবলী সংখ্যায় ও আয়তনে বিপুল। এছাড়া তিনি ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পী। তিনিই একমাত্র কবি যাঁর রচিত দুটি গান ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়েছে। ব্রিটিশরাজ তাঁকে নাইট উপাধি দিয়েছিল—জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সেই উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আর এক কীর্তি বোলপুরের শান্তিনিকেতন।

শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২ - ১৯৫০)

বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, যোগী ও দার্শনিক। সাত বছর বয়সে ইংলন্ডে যান এবং সেখানে পড়াশুনা শুরু করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আই.সি.এস পরীক্ষায় পাস করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে এসে বরোদা কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পুণার বিপ্লবী ঠাকুরসাহেবের সঙ্গে পরিচয়ের পর বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী হিসেবে ধৃত হন। মামলা থেকে মুক্ত হবার পর রাজনীতিচর্চার চেয়ে ভারতের সনাতন

ধর্মের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন এবং পণ্ডিচেরিতে গিয়ে নিবিড়ভাবে যোগ-সাধনায় রত হন। তাঁকে কেন্দ্র করে পণ্ডিচেরিতে গড়ে উঠেছে এক বিরাট আশ্রম। শ্রীঅরবিন্দ বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। সেগুলি অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায় লেখা। 'দি লাইফ ডিভাইন' তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১ - ১৯০৭)

প্রখ্যাত সাংবাদিক, শিক্ষক ও দেশপ্রেমিক। পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে এফ.এ. পড়ার সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে প্রোটেস্টান্ট ও পরে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি করাচি থেকে মাসিক 'সোফিয়া' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত চলে। তিনিই প্রথম এই পত্রিকার একটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি' বলে অভিহিত করেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহযোগিতায় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে তিনি বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথকে সহায়তা করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলেতে যান এবং অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে হিন্দুদর্শন ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বিলেত থেকে ফিরে দৈনিক 'সন্ধ্যা' বার করেন (১৯০৪)। এটাই তাঁর প্রধান কীর্তি। তিনি সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' সম্পাদনা শুরু করেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা: 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি', 'ব্রহ্মামৃত', 'সমাজতত্ত্ব', 'আমার ভারত উদ্ধার', 'পালাপার্বণ'। দেহত্যাগের দু-মাস আগে তিনি আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৪৬ - ১৯২০)

জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের রত্নগিরি। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম মহান নায়ক ও সুবিখ্যাত রাজনীতিক। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ, আইনজ্ঞ, মারাঠী গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা। তাঁর স্বদেশপ্রেম ও বাগ্মিতা বহু দেশপ্রেমিককে অনুপ্রাণিত করেছিল। বেদ-বেদান্ত ও বৈদিক সংহিতার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় তিনি সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন। ধর্মীয় ভাব-ভাবনায় এবং স্বদেশপ্রেমে তিনি বহুল পরিমাণে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ দ্বারা প্রভাবিত। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একযোগে 'মারাঠী' ও 'কেশরী' নামে দু-খানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই দুই পত্রিকায় তাঁর বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও সময়ানুসারী সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ : 'গীতারহস্য' ও 'দি আর্কটিক হোম ইন দ্য বেদজ'।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮ - ১৯৩২)

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তাঁর জাতীয়তাবোধের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ধর্মবোধ এবং আধ্যাত্মিকতা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তিনি পুরোধা। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বন্দেমাতরম্' নামে দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রতিভা সর্বতোমুখী। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিটি শাখায় ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ।

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯ - ১৯৪৮)

গুজরাটের পোরবন্দর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলেত যান ব্যারিস্টারি পড়তে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসে বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন ভারতীয় বণিকের বৈষয়িক প্রয়োজনে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে যান এবং সেটাই তাঁর কর্মক্ষেত্র হয়। কুড়ি বছর (১৮৯৩-১৯১৪) সেখানে থেকে অত্যাচারিত ভারতীয় ও স্থানীয় অ-শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে কাজ করেন। শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট' পরিচালনা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস নীতির প্রয়োগ করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য 'লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন' আরম্ভ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড় আন্দোলন' শুরু করেন। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে তাঁরই নেতৃত্বে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি দিল্লীতে প্রার্থনাসভায় যাবার সময় এক আততায়ীর গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। গান্ধীজীর জীবন, দর্শন ও ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর উল্লেখ-যোগ্য অবদানের জন্য তিনি 'জাতির জনক'-রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁর আত্মজীবনী: 'দি স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেন্টস্ উইথ ট্রুথ'।